বহুরঙ্গী মধুপুরী

রাহুল সাংকৃত্যায়ন

চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড
১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট • কলকাতা ৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ
মে, ১৯৫৪ ॥ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬১

প্রকাশক
শিবব্রত গঙ্গোপাধ্যায়
চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড
১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

মুদ্রাকর
এন. গোস্বামী
নিউ নারায়ণী প্রেস
১/২ রামকান্ত মিস্ত্রী লেন, কলকাতা ৭০০ ০১২

প্রচ্ছদ : সুনন্দ সান্যাল

সূচীপত্র

বুড়ো লালা

'আমি আমার চোখের সামনে লাভডালের পত্তন হতে দেখলাম।' বুড়ো লালা তাঁর সাদা ভুরুজোড়ার নিচে গর্তে লুকানো চোখ দুটো আমার দিকে তুলে বললেন। সব দেশে সব জায়গাতেই বিদেশী ভাষার সঙ্গে যারা অপরিচিত, তাদের মতো বুড়ো লালাও ইংরেজী নাম ভেঙে-চুরে উচ্চারণ করে থাকেন। রোজ ব্যবহার করতে করতে কোনো শব্দের অর্থ মানুষের উপলব্ধির বাইরে চলে যায়, তবু অর্থবহ করে তুলতে মানুষ তাকে ভেঙে-চুরে উচ্চারণ করার চেষ্টা করে। বুড়ো লালাও তেমনি 'লভ ডেল্‌-'কে ভেঙে-চুরে লাভডাল করে নিয়েছেন। অবশ্য এই পরিবর্তন তাঁর নিজের নয়, হয়ত পূর্বপুরুষের কোনো একজন অথবা কয়েকজনের এ-কাজ, যেমন তারা মধুপুরী এবং এমনি আরও কত শত নামের সংস্কার করেছে। শুধু মধুপুরী কেন, হিমালয়ের সমস্ত শৈলাবাসের ক্ষেত্রেই এ ধরনের হস্তক্ষেপ দেখা যায়, যেমন মুসৌরীর হ্যাপী ভ্যালী জনসাধারণের কণ্ঠে এসে হাপাবালা হয়ে গেছে। লাভ-ডালের প্রত্যেকটি বাড়ি দেখে মনে হবে সেটা সত্যযুগে তৈরি, যদিও অনেকেই জানে মধুপুরীর সবচেয়ে পুরনো বাড়িটি আজ থেকে একশো তিরিশ বছর (১৮২০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি) আগে তৈরি। লালা যেখানটায় বসে কথা বলছেন সেটা ওঁর পাড়ার মধ্যেই পড়ে। ওপরের দিকে মার্টী হোটেল। হোটেলটি সম্পর্কে তিনি বেশ ওয়াকিবহাল। কেননা, আজ থেকে সত্তর বছর আগে, দশ-বারো বছর বয়েসে যখন তিনি এই মধুপুরীতে এসেছিলেন, তখন মার্টিন হোটেল ভালো করে তৈরিই হয়নি। লালা বলছিলেন, 'ঐ হোটেল তৈরি করেছিলেন মার্টী সাহেব। ওর বাপ ছিল পাশের রিয়াসতের (দেশীয় রাজ্যের) জঙ্গলের ঠিকেদার।' লালা তার বক্তব্যকে আরও জোরালো করার জন্যে বললেন, 'মার্টী সাহেবের বাপ ছিল পাক্কা ইংরেজ, আধা-গোরা নয়।' বুড়ো লালা চোখের সামনে যা তৈরি হতে, ধ্বংস হতে দেখেছেন, তাই তাঁর ইতিহাস-চেতনা। বছরের পর বছর গড়িয়েছে, আর সেই সঙ্গে তাঁর স্মৃতিও অগোছালো হয়ে উঠেছে। তিনি জানেন না, পাশের রিয়াসতের যে ঠিকেদারটির কথা তিনি বলছেন, সে শুধু জঙ্গলের ঠিকেদারই ছিল না, গঙ্গা-যমুনার পার্বত্য স্রোতকে কাঠ বওয়ার কাজে প্রথম ব্যবহার করেছিল সেই লোকটাই, সেই লোকটাই হিমালয়ের এই অঞ্চলে সর্বপ্রথম আলু-চাষের কথা প্রচার করেছিল, আর প্রায় শতাব্দী কাল আগে দেবদারু কাঠের তৈরি তার বিশাল বাংলোটা

তো এখনও গঙ্গোত্রীর পথের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। কেবল মজবুত কাঠের জন্যেই সেটা বহাল-তবিয়তে আছে এখনও। যদি মার্টিন হোটেলের মতো ওটার ঠাঁই হতো মধুপুরীর কোনো এক প্রান্তে, তাহলে আজ থেকে বছর দশেক আগে থাকতেই সেটা খাঁ-খাঁ করত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালে, বিশেষ করে ইংরেজদের চলে যাওয়ার পরে যে-বছরগুলি কাটল, এই সময়টাতে মধুপুরীর ওপর যেন সাড়ে-সাতী শনিদৃষ্টি পড়েছে, সেই শনিদৃষ্টি থেকে ঐ বাড়িটা কি রেহাই পেত?

মাইলের পর মাইল বিস্তৃত মধুপুরীর এ-অঞ্চলের এক সজীব ইতিহাস বুড়ো লালা। তাঁর আগে এখানে এসেছিলেন তাঁর কাকা, সম্ভবত যখন মধুপুরী গড়ে তোলার কাজ চলছে জোর-কদমে, সেই সময়। হাজার হাজার কুলি-মজুরকে হাত লাগাতে হয়েছিল সে কাজে। তাদের রসদ-সামগ্রী যোগান দেওয়ার জন্যে দোকানপাটের দরকার ছিল। মধুপুরীর বেশির ভাগ বাড়িই তৈরি করাচ্ছিল ইংরেজরা, সে-সব বাড়ি তৈরি করাতে ঠিকেদারের দরকার ছিল। তখন ভারতের অন্যান্য লোকেরা খবরের কাগজের ধার ধারত না ঠিকই, কিন্তু এখানকার শাসক ইংরেজরা তো প্রায় একশো বছর আগে থাকতেই নিজেদের ভাষায় খবরের কাগজ পড়ে আসছে, তাতে মধুপুরীর মতো হিমালয়ের সৌন্দর্যমণ্ডিত জায়গাগুলির, বিশেষ করে সেগুলোর ইউরোপের মতো আবহাওয়ার প্রশংসা ছাপা হয়েছে অনেকবার, সেজন্যে যে-বেগে মানুষ গ্রীষ্মকালটা কাটাবার জন্যে হিমালয়ের দিকে ছুটে আসছিল, সে রকম বেগে বাড়ি তৈরি হচ্ছিল না। লালা এখনকার চার টাকা সের ঘি-এর জন্যে হা-হুতাশ করতে করতে বলছেন, 'জিজ্ঞেস করছেন কি মশাই, টাকায় আড়াই সের করে ঘি বিক্রি হতো, সে-দামে আজকাল তো গমও পাওয়া যায় না। মজুরি কম ছিল, মুনাফাও কম ছিল, কিন্তু তাতেই সুখ-শান্তি ছিল।' পশ্চিম হিমালয়ের শৈলাবাস-গুলিতে অধিকাংশ দোকানদারই হরিয়ানার। হরিয়ানা মাড়োয়ার সংলগ্ন, অনেক ব্যাপারে সেটা মাড়োয়ারী ব্যাপারীদের মতোই দেশ। মাড়োয়ারী ব্যাপারীরা নোংরা ময়লা ধুতি পরে লোটা-কম্বল নিয়ে আসাম কেন, বর্মা মুলুক পর্যন্ত পাড়ি জমিয়েছে, আর আস্তে আস্তে তিন-চার পুরুষ ধরে তাদের কোটিপতি হওয়া নয়, বলতে গেলে বছরে কোটি কোটি টাকা মুনাফা করে ধনী শেঠ বনে যায়। হরিয়ানার বেনেরা অতো ওড়া-উড়ি করতে পারে না, অতো সাফল্যও অর্জন করতে পারে না। তাদের কেউ যদি বড়লোক হয়েও থাকে, লোকে তাকে হরিয়ানী মনে করে না, মনে করে মাড়োয়ারী। বুড়ো লালার আত্মীয়-স্বজন শুধু এই শৈলাবাসগুলোতেই নয়, এমন-কি সড়কের ওপর সুখী, সমৃদ্ধ গ্রামগুলোতেও নিজেদের দোকান খুলে কারবার চালাচ্ছে, তাদের অধিকাংশই কৌরব-পাণ্ডবদের যুদ্ধক্ষেত্র—গীতায় যাকে ধর্মক্ষেত্র বলা হয়েছে—তারই আশপাশের জায়গার বাসিন্দা। মধুপুরীতে শহরের মধ্যে যার দোকান আছে, সে তো এখন শুধু দোকানদারিই করছে, কিন্তু আশপাশের গাঁয়ের ভেতর দিয়ে যেসব রাস্তা গেছে, সেই সব রাস্তার মোড়ে মোড়ে যাদের

দোকান, তারা দোকানদারি করে, দোকানের জিনিসপত্র গাঁয়ের লোককে বাকিতে দেয়, অনেকে চড়া সুদে টাকাও বসায়। বিনা কাগজপত্রে হাজার হাজার টাকা ধার দেওয়াটা তাদের সাহসই বলা যায়। কয়েক বছর আগেও ইমানদার বলে পাহাড়ের লোকের শুধু সুনামই ছিল না, সেটা তাদের অপবাদও ছিল। এক সাহেব একজন পাহাড়ী লোকের ইমানদারীর প্রশংসা করতে গিয়ে একটি ঘটনার কথা বলেছিল। একবার একটা আধুলি পড়ে গিয়েছিল শতরঞ্চিতে। চাকর ঝাড়ু দিতে এসে আধুলিটা দেখে। সে ছোঁবে কি করে, ছুঁলেই তো পাপ হবে। সে আধুলি-ভর শতরঞ্চি কেটে সেটা ওখানেই রেখে দেয়, তারপর সারা ঘরে ঝাড়ু দিতে থাকে। আধুলির চেয়ে বেশি লোকসান হলো শতরঞ্চির, কারণ শতরঞ্চিটা নতুন, সারা ঘরজুড়ে পেতে দেওয়ার মতো বড় শতরঞ্চি। পাহাড়ী লোকজনের এই ইমানদারীতে বুড়ো লালারও আস্থা আছে। কিন্তু আজকালকার ব্যাপার-স্যাপার দেখে তিনিও হতাশ হয়ে পড়েছেন। বলছিলেন, 'পণ্ডিতজী, ভাবছেন কি, এখন এই পাহাড়ীরাও ধূর্ত হয়ে গেছে। টিন-টিন ডালডা বয়ে নিয়ে আসবে, আর ঘি বলে সাড়ে চার টাকা সের দরে বিক্রি করে যাবে।'

বুড়ো লালার ভাষা এখন আর পুরোপুরি হরিয়ানী নয়, খিচুড়ি পাকিয়ে গেছে, যদিও তাঁর লেখাপড়ার জ্ঞান ভালোই, নিজের খাতাপত্র নিজেই সারেন।

তাঁর দৃষ্টিশক্তি এখনও মন্দ নয়, অবশ্য স্মৃতিশক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছে, মাঝে মাঝেই তিনি তাঁর কথার খেই হারিয়ে ফেলেন, কিন্তু খেই ধরিয়ে দিলে আবার সব মনে পড়ে যায়। মধুপুরীর এই মহল্লায় এখনও প্রায় রোজই নেকড়ে ঘুরে বেড়ায়। কুকুরের ওপর খুব ঝোঁক ওদের। বলা যায়, কুকুর ওদের কাছে রসগোল্লা, যেমন মিষ্টি তেমনি লোভনীয়। গত তিন বছরে ওরা আটটা কুকুর নিয়ে গেছে, তাই, বুড়ো লালার কথা অনুযায়ী, আজ থেকে ষাট-সত্তর বছর আগে এই জঙ্গলে নেকড়ের পাল ঘুরে বেড়াত বললে খুব একটা অতিশয়োক্তি হয় না। কিন্তু মধুপুরীর অন্যান্য বুড়োদের মতো বুড়ো লালাও বলেন, 'ভগবানের আশীর্বাদ, নেকড়েরা জানোয়ারের ওপর হর-হামেশা হাত চালায় বটে, কিন্তু ওরা মানুষের ওপর আজ পর্যন্ত কখনও হামলা করেনি।' এটা ঠিক যে বুড়ো লালার ইতিহাস-চেতনা সেলাই কেটে যাওয়া বইয়ের পাতার মতো এলোমেলো হয়ে গেছে, তাকে এখন গোছগাছ করা বড় মুশকিল, এ-ও ঠিক যে তাতে নানা জানা-অজানা নুন-মরিচের গুঁড়ো লেগে গেছে, তবু একথা বলতেই হবে, এঁদের মতো লোকেরা চলে গেলে সেই সঙ্গে মধুপুরীর ইতিহাসের বহু পৃষ্ঠা চিরদিনের মতো লুপ্ত হয়ে যাবে। বুড়ো লালার মানসপটে এখনও জ্বলজ্বল করছে আজ থেকে ষাট-সত্তর বছর আগেকার সেই সব স্মৃতি, যাতে আঁকা আছে সবুজ গাছ-গাছালিতে ঢাকা পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়ানো ইংরেজ আর ইংরেজ রমণীদের ছবি। তিনি তাদের খুঁটিনাটি বর্ণনা দিতে পারেন, একজন প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে তুলি দিয়ে কাগজের ওপর তা ফুটিয়ে

তুলতেও পারেন, কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, এসব লোক হাতে তুলি ধরতেই জানেন না। নতুন ছবি আঁকার কথা কে আর ভাববে, যেখানে মধুপুরীর ষাট-সত্তর বছর আগেকার তৈরি প্রত্যেকটি বাড়িতে সে-সময়ের কত ছবিই না আমরা প্রতি বছর পোকা-মাকড়ে কাটতে আর বর্ষায় পচে-সড়ে যেতে দেখেছি।

লালার কথা অনুযায়ী সে-সময়ে মধুপুরী দেবতাদের স্বর্গপুরী ছিল, জায়গাটার সঙ্গে অন্নবস্ত্র ও জীবিকার সম্পর্কও ছিল। ওরা গরিব কালা আদমি বলে ইংরেজদের কাছে গালাগালি খেতে হতো ওদের, তবু ওদের মতো লোকেরাই অল্প বয়েসে লেখাপড়া শিখে নিত, ফলে গোরাদের কাছে ধমক খাওয়ার প্রবৃত্তি হতো না ওদের —আগে থেকেই লেজ নেড়ে ওরা সাহেবকে কায়দা করে ফেলত। লালার কথায় জানা যায়, ভারতের রাজা-মহারাজা কিংবা ওপরতলার মানুষের মান-ইজ্জতকেও তিন পয়সার জিনিস বলে মনে করত ইংরেজরা। কিন্তু তাতে নিম্নশ্রেণী পাহাড়ী বা দেশোয়ালী লোকের গোঁসা হতো না, বরং তারা এক ধরনের আত্মতৃপ্তি বোধ করত। কারণ ওঁরা তো নিজের দেশের পোড়া-কপালে লোকদের সামনে গুমর দেখিয়ে বেড়াতেন আর কথায় কথায় গালাগালি দিতেন। তাই 'ছোটলোকগুলো' যখন দেখত, ওদের মাথার ওপরেও লোক আছে, যারা ওঁদের দু-চারটে গালাগালি শুনিয়ে দিতে পারে, ধমক দিতে পারে, আর তা শুনে ওঁদের মুখ দিয়ে টুঁ শব্দটিও বেরোয় না, তখন তাতে ওরা বেশ খুশিই হতো।

লালা বললেন, 'আমরা তো মধুপুরীর ইংরেজদের পাড়াতেই ঘোরাফেরা করতাম, কোনো সাহেবকে আসতে দেখলেই, হয়ত সে চেনা-জানাই নয়, তবু একটা সালাম ঠুকে দু-চার পা দূরে সরে দাঁড়াতাম, সব সময় সাবধানে থাকতাম, যাতে অযথা গালাগালি খেতে না হয় কিংবা চোখ-রাঙানি দেখতে না হয়, কিন্তু ভারতের বড় বড় মানুষেরা ভয়ের চোটে এ-পাড়ায় উঁকিও মারতেন না। ওঁরা বাজারের ওদিকে থাকতেন তো ওদিকেই থাকতেন। তখন ইংরেজদের পরাক্রম-সূর্যের মধ্যাহ্নকাল।' লালা বলে যেতে থাকেন, 'এ-পাড়ায় একটা বড় বাড়ি খালি ছিল। সাফ-সুতরোর কথা কি বলব, রাস্তার ওপর কোথাও এক টুকরো কাগজ পড়ে থাকত না। একটা শুকনো পাতা খসে পড়েছে কি, সাফ করার জন্যে ঝাড়ুদার তো এক পায়ে খাড়া, তক্ষুণি ছুটে গিয়ে সাফ করে ফেলত। এমন একটা পাড়ায় যদি বাড়ি পাওয়া যায়, তাহলে নব্য শিক্ষা-সংস্কৃতিতে সদ্যদীক্ষিত কোনো রাজা বা নবাবের তা পছন্দ হবে না কেন? এমনি এক রাজা একটা খালি বাড়ি ভাড়ার বন্দোবস্ত করতে লালাকে পাঠালেন। বাড়ির দালালও সাহেব, তবে পুরো নয়, আধা। যদিও ইংরেজরা আধা গোরাদের নীচ বলে মনে করত, ওঠা-বসা খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে তাদের সঙ্গে অচ্ছুতের মতো ব্যবহার করত, তবু এ-দেশীদের তুলনায় আধা গোরাদের স্থান ছিল অনেক উঁচুতে। ওপরওয়ালাদের কাছে তাদের রোজ রোজ যে লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ভোগ করতে হতো, এ-দেশীদের ওপর তার শোধ তুলত তারা।

বেনে-ঠিকেদারদের সঙ্গে রাত-দিনের কারবার, ওদের কাছ থেকে উপঢৌকন উপচারও জুটত, তাই ইংরেজদের কাছে ওদের কদর ছিল। লালা যখন রাজার জন্যে, বাড়ি ভাড়ার বন্দোবস্ত করতে গেলেন আধা গোরা সাহেবের কাছে, তখন তিনি যুবক। সাহেব বলল, 'পাঁচ হাজার কেন, বছরে বিশ হাজার টাকা দিলেও এ বাড়ি 'কালা আদমি'-কে দিতে পারব না। ওরা বড় নোংরা। আমার বাড়ির দফা-রফা করে ছাড়বে ওরা। তখন আবার এ-বাড়ি নতুন করে সাফ-সুতরো করতে আর সাজাতে-গোছাতে অনেক টাকা বেরিয়ে যাবে আমার। তাছাড়া কালা আদমি যদি একবার এ বাড়িতে বাস করতে শুরু করে, তাহলে কোনো সাহেবই আর এখানে বাড়ি-ভাড়া নিতে চাইবে না।'

রাজা সাহেবের সঙ্গে লালার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, তিনি রাজা সাহেবের বাড়িতে মালপত্রের যোগান দেন, তাতে ভালো রকম মুনাফা লোটেন। তিনি রাজাকে চটালেন না, বরং সেই সব অপমানজনক কথাবার্তা রাজা সাহেবের কানেই তুললেন না। আবার বলতেও পারলেন না যে বাড়ি খালি নেই, কারণ রাজা সাহেব আগেই খবরের কাগজে তার বিজ্ঞাপন দেখেছেন। লালা শুধু জানালেন, 'বাড়িতে হয়ত কারোর আসার কথা আছে।' তারপর অনুযোগের সুরে বললেন যে, সাহেব বড় দুর্ব্যবহার করে, লোকজনের ওপর খামোখা চোটপাট করে, মদ খেয়ে লোক-জনের মান ইজ্জত নষ্ট করে বেড়ায়, রাজা সাহেব ও রকম একটা বাড়ি নিতে চাইছেন কেন!

রাজা সাহেব আধুনিকতার যতই পরাকাষ্ঠা দেখান না কেন, আত্মসম্মানবোধ তো একেবারে নষ্ট করে ফেলেননি। লালার সামনে তিনি খানিকটা তড়পালেন ঠিকই, কিন্তু শেষে লালার সিদ্ধান্তটাই জুতসই বলে মনে হলো তাঁর।

তখন এমন এক দিনকাল যে ভারতীয়দের এ-মহল্লায় কুকুর-বিড়ালের মতো থাকতে হতো। আর আজ, মার্টিন সাহেবের নামে তৈরি এই বিশাল হোটেলে মাত্র ক'জন ইউরোপীয়ান গরমে আই-ঢাই করছে। মার্টিন হোটেল এখন যদি শুধু ইংরেজদের ভরসাতেই থাকে, তাহলে তার চারটে কামরারই লোক পাওয়া যাবে না। ভারত থেকে ইংরেজরা চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দিল্লী হলো এক স্বাধীন দেশের রাজধানী, সেখানে দেশ-বিদেশের রাষ্ট্রদূতেরা এসে বাস করছেন। তাঁরা শুনেছেন, দিল্লীর তাপমাত্রা যখন ১১৬°, তখন মোটরে মাত্র চার ঘণ্টার পথ পাড়ি দিলে মধুপুরী, সেখানে স্নিগ্ধ-শীতল-সুরভিত জলবায়ু। তাঁরা তাঁদের পরিবারবর্গ সঙ্গে নিয়ে এখানে গ্রীষ্মকাল কাটাতে আসেন। অধিকাংশ বাংলোই এখন ভারতীয়দের। দেশ ভাগাভাগির সময় ইংরেজদের মধ্যে পালানোর হিড়িক পড়ে গিয়েছিল। জলের দরে নিজেদের ঘরবাড়ি বিক্রি করে চলে যাচ্ছিল তারা। তখন এদেশের শেঠ-মহাজনদের হাতে যুদ্ধের বাজারে কামানো যথেষ্ট টাকা। তাঁরা সেই সব ঘরবাড়ি কিনে নিলেন। ইংরেজরা যে দামে বাড়ি বিক্রি

করেছিল, আজ ছ'বছর পরে তার চেয়েও কম দামে তা বিক্রি করতে অনেকেই এক-পায়ে খাড়া। কিন্তু কেনার লোক নেই। অবশ্য তফাৎ একটু আছে, ইংরেজদের হাত থেকে কেনার সময় সেগুলো দামী-দামী আসবাবপত্রে ঠাসা ছিল, সাজানো-গোছানো ছিল, আর এখন তা যে-অবস্থায় বিক্রি হচ্ছে, সেটা ছ'বছর ধরে দেখা-শোনা না করার ফলে প্রায় সমস্ত আসবাবপত্র হয় চুরি হয়ে গেছে, নয় তো বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বুড়ো লালা এখন মধুপুরীতে তাঁর ভারতীয় ভাই-বন্ধুদের বিরাজ করতে দেখেও খুব খুশি নন। আজকাল ভারতীয়দের আগেকার মতো সে-রকম অপমান হতে হয় না, গালাগালি শুনতেও হয় না বরং যেটা চোখে পড়ে সেটা হলো, একজন খাঁটি ইউরোপীয়ান পুরুষ বা মহিলাও এখন আশা করতে পারে না যে জানাশোনা না থাকলেও একজন ভারতীয় তার সামনে মাথা হেঁট করে সালাম জানাবে—এমন কি জানাশোনা থাকলেও মাথা নোয়াবে না, বরং উভয়েই যে সমান, সেটা দেখাবার জন্যে হাত মেলাবে।

আগেই বলেছি, বুড়ো লালার যখন দশ-বারো বছর বয়েস, তখনই তিনি প্রথম মধুপুরী আসেন। হয়ত হরিয়ানার ছোট্ট শহরে তাঁর পৈতৃক বাড়িটার কথা এখনও মনে আছে, কিন্তু তাঁর ছেলেরা কেউ সে-বাড়ি দেখেনি। আর এখন তো লালার চতুর্থ পুরুষের সূত্রপাত হতে চলেছে। বুড়ো লালার ঔরসজাত সন্তান হওয়ার ফলে তাদের এটুকু লাভ যে বাড়িতে আধাখেঁচ্ড়া হরিয়ানী ভাষা এখনও চালু আছে, অবশ্য আর একটা কারণ, বিয়েটা তাদের স্বজাতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ, তাই হরিয়ানার সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখে চলতে হয়—কিন্তু এখন তো তাঁর প্রবাসী জাতি-গোষ্ঠীদের ভেতর এখানেই বিয়ে হওয়ার রেওয়াজ আকছার দেখা যাচ্ছে। মধুপুরীতে আসার দশ-বারো বছর পরে বুড়ো লালা যৌবনে পা দেন, কিন্তু বাড়ি-ঘরের তখনও একটা হিল্লে হয়নি বলে খুব শীগগির বিয়ে করতে পারেননি। তিরিশ বছর বয়েসের পর তিনি বিয়ে করেন, আরও দশ বছর পরে প্রথম সন্তানের মুখ দেখার সৌভাগ্য হয় তাঁর। শিক্ষা-দীক্ষার সঙ্গে সম্পর্ক না থাকলেও লালার কাকা মার্টিন হোটেলের ঠিকেদার ছিলেন। খাদ্যদ্রব্য যোগান দেওয়ার কাজ পেয়েছিলেন তিনি। যে হোটেলে শত শত ইংরেজ পরিবারের থাকার ব্যবস্থা আছে, সেখানে ঠিকেদার হওয়াটা ভাগ্যের কথা। লালা তাঁর হোটেলের প্রশংসা করে বললেন, 'পঞ্চম জর্জের মহারানী এসে উঠেছিলেন আমাদের হোটেলেই। মহারানী যে ঘরখানায় থাকতেন, আজও সেটা ভাড়া দেওয়া হয় না। সে-ঘরে তাঁর ফটো টাঙানো আছে।' ইংলণ্ডের রানী ভারত-সম্রাজ্ঞী এই মার্টিন হোটেলে কিছুক্ষণের জন্যে বিশ্রাম নিয়েছিলেন, এটা লালার কাছে যেন এই সেদিনের কথা।

সে-সময় হোটেলের চারদিকে গোরাদের পাহারা মোতায়েন করা হয়, বড় বড় মিলিটারী অফিসার কনস্টেবলের মতো জোড় পায়ে খাড়া থাকে। মহল্লার আরও অনেক বাংলো ইংরেজ পুরুষ-মহিলায় ভরে যায়। মহারানী পর্দানশীন ছিলেন না, তবু তাঁর দর্শন পাওয়াটা দুর্লভ ছিল। লালা বললেন, 'গোরাদের ভিড়েই ভিড়াক্কার, কালা আদমি কি করে সেখানে গিয়ে মহারানীকে দর্শন করবে বলো!' কিন্তু মার্টিন হোটেলে কাকার ঠিকেদারীটা বুড়ো লালা পেয়েছিলেন। তাঁকে সেখানে রোজ খাবার-দাবার যোগান দিতে হতো। ঠিকেদারীতে উন্নতি করতে হলে বেয়ারা-খানসামাদের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক রাখতে হয়। যদিও মহারানী ও তাঁর নিজের লোকজনের বেয়ারা-খানসামার কাজ খোদ ইংরেজরাই করছিল, তবু একজন খানসামার দৌলতে মহারানীকে দর্শন করার সৌভাগ্য হয়েছিল লালার।

বুড়ো লালাকে বাজারের জিনিস সবই হোটেলে যোগান দিতে হতো। শুধু চাল দুধ আনাজ-পাতিই নয়, এমন কি খাদ্যাখাদ্য মাংসও তাঁর ঠিকেদারীর মধ্যে ছিল। মদ এবং আর সব বিলাতী শখের জিনিস হোটেল সোজাসুজি ইংরেজ স্টোর্স থেকে আনিয়ে নিত। সে সময় মধুপুরীতে বড় বড় ইউরোপীয়ান ফার্মের দোকান ছিল। ইংরেজরা নিজেদের দরকারী জিনিস সেখান থেকেই কিনে আনত। বুড়ো লালা মাংসের স্বাদ কখনও চেখে দেখেননি। তিনি এমন একটি পরিবারের মানুষ, যে পরিবার বংশানুক্রমে নিরামিষাশী, ফলে তাঁর মনে মাংসের প্রতি একটা স্বাভাবিক ঘেন্না ছিল, তবু রান্নার সময় মাংসের মশলার গন্ধ তাঁর খারাপ লাগত না। তাঁর বাড়িতেও গরম মশলা ব্যবহার হয়, পেঁয়াজের বদলে হিং-এর ফোঁড়ন দেওয়া হয়। পূর্বপুরুষদের মতোই লালা আর তাঁর স্ত্রী হিংকে নির্দোষ বস্তু বলেই মনে করতেন। তারপর তিনি একদিন শুনলেন, হিং এক প্রকার গাছের আঠা, কিন্তু যে-দেশ থেকে ও-বস্তুটা আসে, সেখানে সবাই মাংসাশী, তা-ও আবার যে সে মাংস নয়, অখাদ্য মাংস। আজকাল যেমন অধিক মুনাফা লুটবার জন্যে ঘি-এ ডালডা ভেজাল দেওয়া হয়, তেমনি সেখানে হিং-এও ভেজাল দেওয়া হয়, আর ভেজাল দেওয়ার বস্তুটা হলো অভক্ষ্য প্রাণীর টাটকা রক্ত। সেখান থেকে হিং-ও পাঠানো হয় দু'সের চার সের করে টাটকা চামড়ায় ভরে সেলাই করে। লালা যখন হিং-এর মাহাত্ম্য শুনছেন, বুড়ী শেঠানীও তখন পাশে বসে। তাঁর তো তখনই বমি হওয়ার উপক্রম। কিন্তু যে-হিংকে নির্দোষ বস্তু ভেবে বংশানুক্রমে ব্যবহার করে আসছেন তাঁরা, সেটা হঠাৎ ছেড়ে দেওয়ার কথা ভাবা যায় না। তাই এখনও লালার বাড়িতে রসুন-পেঁয়াজ ঢোকে না, অথচ হিং-এর চল আছে আগের মতোই।

লালার কাছে মাংস আজন্ম নিষিদ্ধ, তাঁর পরবর্তী বংশধররা অবশ্য এক পা আগে বাড়িয়েছে, কিন্তু মদের ব্যাপারে লালা তাঁর পূর্বপুরুষদের পথে অবিচল থাকতে পারেননি। তাঁর গুরু, তিনিও লালার স্বজাতি, বুঝিয়েছিলেন, 'এটা তো

আঙুরের রস, এতে মাছ মাংসের কোনো ব্যাপারই নেই। যে আঙুরের আরক খাই আমরা, সেই আঙুর থেকেই এই মদ তৈরি।' এতটা ব্যাখ্যা করার পর তিনি আবার মদের বিভিন্ন গুণ বর্ণনা করেছিলেন। যৌবনকে আরও চনমনে করে তোলার জন্যে একদিন লালা মুখে মদের পেয়ালাটা ছুঁইয়েছিলেন। আর একবার ও-জিনিস মুখে ছোঁয়ালে আর কি ছাড়া যায়! তা-ও আবার যদি মুফতে পাওয়া যায়। মার্টিন হোটেলে মদের স্রোত বয়ে যেত, এক নম্বরের ভালো মদ—হুইস্কি, শ্যাম্পেন, ব্রাণ্ডি। লালার কাছ থেকে বেয়ারা খান-সামারাও কিছু পেত, আবার তাদের কাছ থেকে লালাও পেতেন। হোটেলের ছোট ম্যানেজার ছিল অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান, তার সঙ্গে লালার খুব মাথামাথি ছিল, সেজন্যে যৌবনেই লালা মদ্যপানে ওস্তাদ হয়ে উঠেছিলেন। এখন এই বার্ধক্যে আর সে ইংরেজ রাজত্ব নেই। মার্টিন হোটেল অবশ্য এখনও আছে, কিন্তু তার ভারতীয় মালিকদের হাত খরচার ব্যাপারে সে-রকম দরাজ নয়। বুড়ো লালার হাতে এখন আর ঠিকেদারীও নেই। তাই যৌবনে তিনি যে দীক্ষা নিয়েছিলেন, এখন তা পুরো-পুরি পালন করতে পারেন না। ভারতে ইংরেজ আমলের শেষ দিন পর্যন্ত যে-যুগ, সে-যুগের স্মৃতি লালার মনে আজও ভাস্বর হয়ে আছে, সে-যুগকে হয়ত সত্যযুগ বলা যায় না, কিন্তু তাকে স্বর্ণযুগ ছাড়া আর কিই-বা বলা যায়—সত্যি সত্যি সে সময় স্বর্ণবৃষ্টি হতো।

লালা মদে দীক্ষা নিয়েছিলেন একান্ত গোপনে, আজও সেই রকমই গোপন রেখেছেন ব্যাপারটা, কিন্তু তিনি যে মদ খান, তাঁর কথাবার্তায় কিংবা মুখের গন্ধে বাড়ির লোকে যে টের পাবেন না সেটা কি সম্ভব! এই বদ অভ্যাসটাকে তিনি নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তার গন্ধটা পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে। এক ছেলে তো মদের নেশায় পাগল। বাপ তাকে পৃথক করে দিয়েছেন, তবু সে পান-ভোজনে এতো উড়িয়েছে, এতো ধার-দেনা করেছে যে, আজ ক'বছর থেকে সে মধুপুরী থেকেই উধাও। কেউ কেউ বলে, সে আর বেঁচে নেই, আবার কেউ কেউ দিব্যি গালে, সে না-কি এখনও অমুক শহরে রয়েছে। কেউ কেউ তার বউটাকে দেখে দুঃখ প্রকাশও করে। একজন মহিলা হাসতে হাসতে বলেছিল, 'অমন স্বামীর স্ত্রী তো চিরসধবা হয়। হয়ত ক'বছর আগেই মারা গেছে স্বামী, অথচ তার স্ত্রীর আজীবন বিধবা হওয়ার ভয় নেই।' কিন্তু চিরসধবা হলেই একটি মেয়ে খুশি হবে কি করে, যদি তাকে ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া স্বামীর চার চারটে সন্তানের ভরণ-পোষণের দায়-দায়িত্ব বহন করতে হয়!

ছেলেরা নিজের বশে নয় দেখে অনেকদিন আগেই বুড়ো লালা তাদের পৃথক করে দিয়েছেন। খরচ যেমন বেড়েছিল, তেমনি আমদানীও ছিল, কিন্তু তা ভাগ-বাঁটোয়ারা করে দিলে নিজের কাজ চলত না। মদে উচ্ছন্নে যাওয়ার ভয় ছিল না

তাঁর, বিশেষ করে যতদিন তিনি মার্টিন হোটেলের ঠিকেদার ছিলেন। তাঁর বিশ্বাস গত ছ'বছর বাদ দিলে, ভগবান দয়া করেই যেন মার্টিন হোটেলকে তাঁর হাত ছাড়া হতে দেননি। এখন তাঁর বয়স সত্তরের ওপর, প্রতি মুহূর্তে পথ চেয়ে আছেন। লোকে বলে, চিত্রগুপ্ত শমন পাঠাতে ভুলে গেছেন! মদ ছাড়া তাঁর আর একটি ব্যয়বহুল স্বভাব ছিল, সেটা হচ্ছে জুয়া। যৌবনেই শিখেছিলেন সেটা। ব্রিজ-এর জুয়া শিক্ষিতরাই খেলে। ইংরেজরাও খেলত, মধুপুরীতে ভারতীয় স্ত্রী-পুরুষেরাও খেলে। ওটা গরিব কিংবা অশিক্ষিতদের জুয়া নয়। কেউ কেউ তো ব্রিজ খেলাটাকে পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছে, আর তারই কল্যাণে তারা সুখ-শান্তিতে জীবন কাটাচ্ছে। বুড়ো লালা দিশি জুয়ার একজন ভালো খেলোয়াড় ছিলেন। যদিও বলা যায় না যে বাজি জেতাটা তাঁর একচেটিয়া ছিল, তবু তাঁর পাকা বাড়ি ও অল্প-বিস্তর অন্যান্য সম্পত্তি দেখিয়ে লোকে বলে, এ সব ঐ জুয়াখেলারই অবদান।

তিন

বুড়ো লালা দুটি শতাব্দীর এক বিরাট অংশই শুধু দেখেননি দু'দুটি মহাযুদ্ধ হতে দেখেছেন চোখের সামনে। প্রথম মহাযুদ্ধ যখন ঘটে, তখন তিনি বয়সে তরুণ, অর্থাৎ যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল না। তখনও দুর্ভিক্ষ হয়েছিল, সে-সময়ে অবশ্য কিছু কামিয়েও নিয়েছিলেন, কিন্তু নিজের অভিজ্ঞতাকে পুরোপুরি খাটিয়ে মুনাফা লুটবার সুযোগ পেয়েছিলেন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়। সে-সময় ব্যবসায়ীরা দু'হাতে মুনাফা লুটছিল ঠিক দান-জেতার মতো। বুড়ো লালা জুয়াশিল্পের সঙ্গে সঙ্গে কালোবাজারী শিল্পেও হাত পাকিয়ে নিয়েছিলেন রীতিমতো, ফলে যুদ্ধের বছর ক'টিতে প্রচুর লাভ করেছিলেন তিনি। ঠিকেদারীর পাশাপাশি তিনি একটা ছোট্ট দোকানও খুলেছিলেন, সেটা খুব জাঁকিয়ে উঠল। মধুপুরীর অন্যান্য শেঠরা দশ-বিশ লাখ করে হাতিয়ে নিলেন, লালা অবশ্য অতদূর পৌঁছতে পারেননি, কারণ অত লম্বা দৌড় ছিল না তাঁর, তবে রোজগারপাতি নেহাৎ মন্দ হয়নি। দু'একটা ব্যাপারে তাঁর স্বভাবটা খরুচে হলেও তিনি পয়সার দাম বুঝতেন; আর যথাসম্ভব কম খরচ করে যত বেশি ফায়দা লোটা যায়, তার পক্ষপাতী ছিলেন। যুদ্ধের বাজারে বেশ কিছু টাকা-পয়সা হলে বাড়ি করতে চাইলেন, কিন্তু তার জন্যে কোনো ইঞ্জিনিয়ারের সাহায্য নেওয়া দরকার বোধ করেননি। বাড়ি তৈরির অনুমতি পাওয়ার জন্যে যদি মিউনিসিপ্যালিটিতে নকশা জমা না দিলেও চলত, তাহলে তিনি নকশা-টকশার ধার ধারতেন না, সরাসরি একেবারে মাটির ওপর ধীরে ধীরে দাঁড় করিয়ে দিতেন বাড়িটাকে। লালা একজন মামুলি ড্রাফট্‌স্‌ম্যানকে দিয়ে নকশা তৈরি করে মিউনিসিপ্যালিটিতে জমা দিলেন, সে-নকশাও বলতে গেলে লালারই মস্তিষ্ক-

প্রস্তুত। দিয়াশলাইয়ের খোলের মতো বাড়ি তৈরি করার ইচ্ছে ছিল তাঁর, সেই রকম একটা দোতলা বাড়ি তৈরি করে ফেললেন তিনি, তাতে ছোট ছোট অনেক-গুলো কুঠরি। ইংরেজ রাজত্বে সাহেবদের মহল্লাটা যতই সরগরম হয়ে থাকুক না কেন এখন মার্টিন হোটেল বাদে বাকি বাংলোগুলোতে বছরে একদিনও সাঁঝবাতি জ্বলে না, জলের কল খোলা হয় না। বুড়ো লালা বাড়ি তৈরি করেছিলেন বড় সাধ করে, এক ইঞ্চি জায়গাও নষ্ট করেননি, যত বেশি কুঠরি তৈরি করা সম্ভব তৈরি করেছিলেন যাতে অনেক বেশি ভাড়াটে বসানো যায়। বাড়ি তৈরির কাজ তিনি নিজে দেখাশোনা করেছিলেন, তার ফলে সিমেন্ট, লোহা, কাঠ প্রভৃতি জিনিসপত্র চোরাবাজার থেকে নয়, প্রচুর টাকা-পয়সা খরচ করে আসল দামে কিনে ব্যবহার করতে হয়েছিল। তিনি কারোর নকল করতে যাননি, বরং বেশ মজবুত বাড়ি তৈরি করেছিলেন। ভাড়াটেরা যদি বলে, এতে গোসলখানার ব্যবস্থা নেই, পেচ্ছাব-পায়খানার বন্দোবস্ত নেই, তাহলে বুড়ো লালা মনে মনে বলেন, না নেওয়ার ইচ্ছে থাকলে খদ্দেরে এমন কথাই বলে। লালার দিয়াশলাই-মহল বছরের পর বছর ধরে খালি পড়ে আছে। যাদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় আছে, লালা তাদের বলেন, 'ভাড়াটে থাকলে বলবে।' ভাড়ার কথা জিজ্ঞেস করলে বলেন, 'সরকারী হিসেবে তো পনেরোশো হয়, আমি না হয় হাজার টাকাতেই দিয়ে দেবো।' চারদিক দেখেশুনেও তাঁর খেয়াল থাকে না, এই মহল্লায় পঁয়ত্রিশ শো টাকা ভাড়ার বাড়ি এ বছর পাঁচ শো টাকায় দেওয়া হয়েছে। বাড়ির দালালরা বলে, কম-সে-কম বাড়ির মেরামতিটা তো হবে। বুড়ো লালার বাড়িটা এমন মজবুত যে, এখনও বেশ কয়েক বছর মেরামতীর দরকার হবে না। লালা নিজেও বাড়িটা ব্যবহার করতে পারছেন না, কারণ বাড়ি ব্যবহার করতে গেলেই মিউনিসি-প্যালিটিকে ট্যাক্স গুনতে হবে। যে-বাড়িকে তিনি তাঁর বৃদ্ধ বয়েসের সম্বল ভেবেছিলেন, শেষ পর্যন্ত তা বেকার পড়ে আছে, নিজের জন্যেও ওটাকে ব্যবহার করতে পারছেন না।

লালা বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন, কিন্তু তাঁর মনটা তেমনি আছে। এই বয়েসেও তিনি স্ত্রীর কাছে ভয়ে জড়সড় হয়ে থাকেন না, ছেলেদের হিম্মত নেই যে তাঁর সামনে 'আজ্ঞে' ছাড়া অন্য কোনো কথা বলে। এখনও তিনি তাঁর পুরনো জীবনটাকে ত্যাগ করতে রাজি নন। অবশ্য এমনিতে বলেন, 'অনেকদিন তো কাটালাম, আর কি!' সংসারের খরচ কমানোর জন্যে কয়েকটি ছেলেকে পৃথক করে দিয়েছেন, কিন্তু তাতে কি হবে! ধার-দেনা বেড়ে চলেছে। কড়া সুদ আর মহাজনী কারবার চালানোর জন্যে বেনে নামটারই শুধু বদনাম। মওকা পেলে অন্যরাও তাঁর কাছ থেকে লাভ ওঠাতে কসুর করে না। মধুপুরীর কয়েকটি বাড়ি ও বাংলোর মালিক এক খানদানী সামন্ত —রাজা সাহেব, শতকরা সাড়ে ছ'টাকা মাসিক সুদে টাকা ধার দেন, আর পরে যাতে বেআইনী না হয়, সেজন্যে প্রথমেই পাঁচ বছরের

সুদ আসলের সঙ্গে জুড়ে লেখাপড়া করিয়ে নেন। অন্যান্য রাজা-জমিদারেরা যেখানে জমিদারীচলে যাওয়ার ভয়ে বুক চাপড়াচ্ছেন, সেখানে রাজা সাহেব অনেক আগে থাকতেই নিজের উপায়ের পথ খুঁজে নিয়েছেন। গত দশ বছরে কত ভালো ভালো বাড়ি আর বাংলো তাঁর দখলে এসেছে। যদি বাড়ির দাম জলের মতো না হয়ে যেত, তাহলে আজ তাঁর সম্পত্তির দাম পঁচিশ লাখ টাকার হতো। স্থাবর সম্পত্তি থাকলে প্রত্যেকের জন্যেই রাজা সাহেবের দরজা খোলা। তাঁর সঙ্গে বুড়ো লালার পুরনো পরিচয়। আগে ধার-কর্জ দেওয়া-থোয়াতে রাজা সাহেবকে সাহায্য করতেন, আর দরকার পড়লে বিশেষ সুবিধেয় নিজেও টাকা-পয়সা নিতেন। রাজা সাহেব বুড়ো লালাকে দিয়াশলাই-মহল এবং আরও কিছু স্থাবর সম্পত্তির ওপর কয়েক হাজার টাকা ঋণ দিয়ে রেখেছেন, ঋণের নাগপাশ থেকে সে-সব আর উদ্ধার করার অবকাশ নেই। বুড়ো লালা সত্যি সত্যিই কয়েকদিনের অতিথি, কিন্তু তিনি কি পরবর্তী বংশধরদের ঠিকেদারী নিয়েছেন? আর বলতে গেলে, তিনিও তো দশ-বারো বছর বয়েসে খালি হাতে মধুপুরীতে এসেছিলেন!

বার্ধক্য-বিলাপ

মন্দ-মন্দ-শীতল-সুরভিত হাওয়াকে আমাদের দেশে খুব ভালো বলে গণ্য করা হয়। কিন্তু তার মানে এই নয় যে সারা বিশ্ব তাকে ভালো বলে মেনে নেবে। যেখানে যে বস্তু দুর্লভ, সেখানে তার কদর বেশি। ইউরোপ ও এশিয়ার ৩০° অক্ষাংশের উত্তরের ঠাণ্ডা দেশগুলিতে অন্তত শীতল বায়ু কেউ পছন্দ করে না, তা মন্দই হোক আর সুরভিতই হোক। আমাদের দেশেও মধুপুরীর মতো কতো শহর ও জায়গা রয়েছে, সেখানকার লোকজন সমভূমির লোকজনের মতো মন্দ-মন্দ-শীতল-সুরভিত হাওয়া অতটা পছন্দ করে না। সাধারণত চার-পাঁচ হাজার ফুট উঁচুতে একেবারে অসহ্য শীত পড়ে না। ভারতে শ্রীনগরের মতো কিছু জায়গা আছে, যেখানে তুষারপাত হয়। তুষারপাতের অর্থ, সেখানকার শীত সমভূমির অনভ্যস্ত লোকের কাছে ভীতি ও ঘৃণার জিনিস। তা মধুপুরীতেও—নভেম্বর, ডিসেম্বর, জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী—বছরে এই চার মাসই ও রকম, খুব ঠাণ্ডা পড়ে, দু'একবার তুষারপাতও হয়, কিন্তু বাকি আট মাস মধুপুরীর মন্দ-মন্দ-শীতল-সুরভিত হাওয়া সত্যিই মধুর বলে মনে হয়। বলা যেতে পারে, মধুপুরী বছরে আট মাস ভ্রমণবিলাসীদের তৃপ্তি দেওয়ার জন্যে তৈরি থাকে। কিন্তু সব মাসেরই সবাই ভক্ত নয়। বোম্বাই-এর শেঠ সবার আগে অর্থাৎ এপ্রিলেই এখানে এসে হাজির হন। মে মাসের অর্ধেক থেকে জুন পর্যন্ত উত্তর ভারতের গুণগ্রাহীরা মধুপুরীর দিকে দৌড় দেন। সেটাই অবশ্য মধুপুরীর সবচেয়ে বড় সীজন। বোম্বাই বা গুজরাটের শেঠরা খুব কম আসেন, তবে তাঁরা বউনি করেন বলে সেটা মন্দের ভালো, নইলে তাঁদের সংখ্যা ও স্থায়িত্বের স্বল্পতা মধুপুরীর স্থায়ী বাসিন্দাদের খুব একটা সন্তুষ্ট করতে পারে না। যদি বর্ষা কোনো বার টানা-হেঁচড়া করে জুনের শেষে শুরু হয়, তাহলে সীজন সেবারে দেড় মাসে দাঁড়ায়। সেজন্যে মধুপুরীর যেসব লোক জীবিকার জন্য পর্যটকদের ওপর নির্ভর করে, তারা ঈশ্বরের কাছে দু'হাত তুলে প্রার্থনা জানায়, যেন বর্ষা দেরিতে আসে। যদি বর্ষা অসময়ে, অর্থাৎ জুনের মাঝামাঝি সময় হয়ে যায়, তাহলে সর্বত্র ঠাকুর-দেবতাকে গালাগালি শুনতে হয়।

দেড় মাসের সীজনই হলো বড় সীজন, কিন্তু তার মানে এই নয় যে তার পরই মধুপুরী ফাঁকা হয়ে যায়। পাঞ্জাবের পর্যটকেরা তো জুলাই মাসেই আসেন। সন্দেহ নেই যে গ্রীষ্মকালে উত্তর প্রদেশে তাপমাত্রা যত উঁচুতে দেখা যায়, ভারতীয়

পাঞ্জাবে অতোটা নয়। বারাণসী, বাঁদা, আজমগড় ও লক্ষ্ণৌ-এর লোকেরা যখন ১১৫°-১১৬° উচ্চতায় লু-এ ঝলসাতে থাকে, তখন অমৃতসর কেন, রাজপুতানার জয়পুর-যোধপুর ১১০°-র নিচেই থাকে। কত দিন তো পাকিস্তানের উষ্ণতম জায়গা বেলুচিস্তানের সীবী, লাসবেলা প্রভৃতির সঙ্গে বাঁদা, বারাণসী রীতিমতো পাল্লা দিতে শুরু করে, যদিও শেষ পর্যন্ত হারতে হয় তাদের। পাঞ্জাবে পাঁচ-সাত ডিগ্রী উষ্ণতা কম থাকে বলেই পাঞ্জাবী পর্যটকেরা ভরপুর সীজনে মধুপুরীতে আসেন না। বর্ষায় যদিও তাপমাত্রা অতটা উঁচু থাকে না, তবু তাঁদের অভিযোগ—গুমট, ঘাম, আর তার ফলস্বরূপ ঘামাচিতে—সরষে-ভর ফুসকুড়িতে সারা শরীর ঢেকে যাওয়া। একে আপনারা বড়লোকী চাল বলতে পারেন। লু যখন বরদাস্ত হচ্ছে, তখন গুমটকে অত ভয় কেন? যাইহোক, জুলাই-আগস্টে মধুপুরীতে পাঞ্জাবী পর্যটক বেশি দেখা যায়, তার মানে এই নয় যে সে-সময় সীজন আবার সরগরম হয়ে ওঠে। সেটা যে হয় না তা আপনি সহজেই বুঝতে পারবেন, কারণ সীজনের হাজার টাকার বাড়ি আপনি তখন দু'শো টাকাতেই পেতে পারেন। তবে হ্যাঁ, একথা ঠিক, ওঁদের আসার ফলে মধুপুরীর নির্জনতা খানিকটা দূর হয়। সেপ্টেম্বরে যেই ওঁরা বাড়ির দিকে পা বাড়ালেন অমনি শুরু হয়ে যায় বাংলা-বিহারের পালা। সেখানকার লোকেরা, এমনকি কলকাতার শেঠ ও বাবুরাও দুর্গাপূজা কাটাতে মধুপুরী আসেন, দিল্লী ও তার আশপাশের কিছু লোকও আসেন। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য-প্রেমিকদের জন্য সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি থেকে অক্টোবরের মাঝামাঝি পর্যন্ত এই সীজনটাই বিশেষভাবে আকর্ষণীয়। সদ্য বর্ষা কেটে যাওয়ায় রাস্তাঘাটে ধুলোবালি থাকে না, সেজন্যে বাতাস নির্মল থাকে, আকাশও ধূসর হয়ে থাকে না। গ্রীষ্মকালে যেখানে সমভূমির ধূলিঝড়ের ঝাপটায় এবং উৎক্ষিপ্ত সূক্ষ্ম ধূলিকণায় আকাশ বিবর্ণ হয়ে থাকে, হিমালয়ের রজতশুভ্র শৃঙ্গগুলির অধিকাংশই দৃষ্টিগোচর হয় না, সেখানে শরৎকালে প্রায় প্রতিদিনই সেগুলি উজ্জ্বল দেখায়। অন্য সময় সামনের তৃণগুল্মহীন বহু পাহাড় যা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর বলে মনে হয়, তখন সেগুলিও নিজেদের সবুজ মখমলের পোশাকে ঢেকে ফেলে। সংক্ষেপে, মধুপুরীর ছোট-বড় এই চারটে সীজন, সব সীজনেই সমান না হলেও ম্যালরোড ও অন্যান্য জায়গায় নরনারীদের আনন্দ-উচ্ছ্বাস কম-বেশি চোখে পড়ে। নভেম্বর শুরু হলে মধুপুরীতে শুধু এখানকার স্থায়ী বাসিন্দারাই পড়ে থাকে।

দুই

মধুপুরীতে বাস আর গাড়ির আলাদা আলাদা স্ট্যাণ্ড। গাড়ি পুরীর কাছাকাছি চলে যায়। যাঁরা বেশি পয়সা খরচ করতে পারেন, তাঁরা গাড়ি অথবা ট্যাক্সিতেই এই

বাইশ মাইল পথ পাড়ি দেন। যদি তাঁরা আরও কিছু বেশি খরচ করতে রাজি থাকেন, তাহলে গাড়ি তাঁকে তাঁর বাসা-বাড়ির কাছে পৌঁছে দেবে, লটবহর নিয়ে তিনি একেবারে বাড়িতেই হাজির হতে পারবেন। বর্ষার সীজন শুরু হয়ে গেছে। গাড়ির স্ট্যাণ্ডে কুলিরা বোঁচকা-বুঁচকি নিয়ে ঝগড়া-ঝাঁটি করছে। ঠিক এই সময় এক ভদ্রমহিলা তাঁর দুই ছেলেকে নিয়ে নামলেন। পঞ্চাশ গজ দূর থেকে তাঁকে পঁচিশের কাছাকাছি বয়স্কা মনে হয়। তিনি চার-পাঁচজন কুলির মাথায় মালপত্র চাপিয়ে দিয়ে সঙ্গে চাকর পাঠিয়ে দিলেন, যদিও তার দরকার ছিল না, কারণ ঘোর কলিযুগ শুরু হয়ে গেলেও মধুপুরীতে আজ পর্যন্ত কখনও শোনা যায়নি, মালিক সঙ্গে না থাকায় মালপত্র নিয়ে কুলি চম্পট দিয়েছে। হ্যাঁ, শুধু ঠিকানা দিয়ে দিন, কুলি সেখানে ঠিক পৌঁছে যাবে। অবশ্য একথা ঠিক যে, ইংরেজদের পাড়াগুলোতে বাড়ি ও রাস্তার প্রায় সবই ইংরেজি নাম, আমাদের অশিক্ষিত কুলি ও অন্যান্য লোকজন সেগুলোকে ভেঙে-চুরে নিজেদের বুঝবার সুবিধের জন্য এক একটা নাম রেখে দিয়েছে। তাই কখনও কখনও বাড়ি খুঁজতে গিয়ে গোলমাল হতে পারে, কিন্তু কেউ-না কেউ লেখা-পড়া জানা লোক হাতের কাছে পাওয়া যাবেই, সে-ই বলে দেবে, 'স্প্রিং-ডেল' ওইটে, যাকে তোমরা গুদামওয়ালী কোঠী বলো। ভদ্রমহিলা বেশ ফরশা। খুব লম্বাও নয়, বেঁটেও নয়। শরীরটা রোগা নয়, মেদবহুলও নয়, তবে সামান্য একটু মোটা বলা যেতে পারে। তাঁর শরীরে গোলাপী রেশমী শাড়ি ভারি চমৎকার মানাচ্ছে। বর্ষাকালে দামী শাড়ি পরা বুদ্ধি-সুদ্ধির পরিচয় নয়, তবে তাঁকে তো আর পায়ে হেঁটে যেতে হবে না, তাছাড়া আজ বৃষ্টিও হচ্ছে না।

মালপত্র পাঠিয়ে দিয়ে তিনি একটা রিকশায় উঠলেন, সঙ্গে তাঁর বারো-তেরো বছরের দুই চিরঞ্জীবও উঠে বসল। রিকশাওয়ালা লোকজনকে সাবধান করতে করতে এগিয়ে চলল। পাহাড়ের গায়ে ঘুরতে ঘুরতে, পাক দিতে দিতে উঠে যাওয়া পিচ-ঢালা মসৃণ পথে দৌড়তে লাগল সে। রিকশাওয়ালা সওয়ারীকে দ্রুত তার গন্তব্যস্থানে পৌঁছে দিতে চায়, তার আসল উদ্দেশ্য, তাড়াতাড়ি ফিরে গিয়ে সে অন্য যাত্রী ধরতে পারবে, যদিও এখন যাত্রীদের প্রয়োজনের তুলনায় রিকশার সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে গেছে, নিতান্তই ভাগ্যের ওপর নির্ভর করতে হয় তাদের। ভদ্রমহিলার বেশভূষা আর কৃত্রিম সাজগোজের বহর দেখে বোঝা যায়, তিনি বড় শৌখিন। অথচ আশ্চর্য মধুপুরীর রূপের হাট বলতে ম্যল রোড আর তার আশ-পাশের এলাকা, সে-সব বাদ দিয়ে ভদ্রমহিলা দেড় মাইল দূরে রিকশা দৌড় করাচ্ছেন, সেখানে তো আধুনিক বিলাসিতার বহু জিনিস ও সুযোগ থেকেই বঞ্চিত হবেন তিনি। কিন্তু দূরে থাকার একটি সুবিধেও আছে, বর্ষার সীজন জুলাই থেকে অক্টোবর এই চার মাস আপনি সিকি ভাড়ায় বাড়ি পেতে পারেন। ভদ্র-মহিলা সেটা জানেন। আর জানেন বলেই অত দূরে প্রমোদ-ভবন ভাড়া

নিয়েছেন। হয়ত বেশ কয়েক বছর ধরেই তিনি এসে ওখানেই ওঠেন। প্রমোদ ভবন নাম শুনে ভাববেন না, মধুপুরীতে ইদানীং সব বাড়ির নাম ভারতীয় হয়ে গেছে। এ রকম নামে মাত্র দু'একটা বাড়িই পাওয়া যাবে। ইংরেজের কাছ থেকে যিনি বাংলোটা কিনেছিলেন, হয়ত তাঁর পরিবারে কোনো বয়স্ক গুরুজন কিংবা অত্যুৎসাহী যুবকের নাম ছিল প্রমোদ প্রসাদ, ইংরেজি নাম বদলে তিনি বাড়ির নাম রেখে দিয়েছেন প্রমোদ-ভবন। মিউনিসিপ্যালিটিতে এসব নামের সমাদর খুব কম, আশপাশের লোকের কাছেও এসব নাম খুব পরিচিত নয়। ইংরেজ আমলেও তো রিকশাওয়ালা ও কুলি-কামিনদের ভাষায় 'বাঁদরী-কুঠি' ছিল, এখনও আছে।

প্রমোদবালা প্রমোদ-ভবনের গেটে ঢুকলেন। বিরাট দোতলা বাড়ি, যুদ্ধের বাজারে তিন হাজারের কমে ভাড়া পাওয়া যেত না, তাও সে-সময় বাড়ির মালিক ছিলেন জনৈক ইংরেজ, ভাড়া তিনি অবশ্যই বাড়িয়েছিলেন, তবে ভারতীয় মালিকদের মতো নয়। দুই ছেলে আর তাদের মা-র থাকবার পক্ষে বাড়িটা বেশ বড়সড়ই বলা যায়। নিচের তলারও সব ঘর ব্যবহার করতে পারেন না তিনি। কিন্তু সে-ভাবনা মালিকের হওয়া উচিত, ভাড়াটের মাথাব্যথা কিসের? ভদ্রমহিলা বাড়িতে এসে পৌছানোর আগেই কুলিরা পৌছে গেছে, তারা চাকরের সঙ্গে মজুরি নিয়ে ঝগড়া করছে। চাকরটা দেড়-দেড় মণ বোঝা দেড় মাইল বয়ে আনার জন্যে কুলিদের মজুরি দিতে চাইছে আট আনা, ওরা চাইছে দেড় টাকা। কিছুক্ষণ দর কষাকষির পর ওরা সরকারী রেটের দোহাই পেড়ে এক টাকা চাইল। কিন্তু চাকরটার কি করার আছে? মেম সাহেবের হুকুম, এক পয়সা বেশি দেওয়ার ক্ষমতা নেই তার। মেম সাহেব এসেই কুলিদের ধমকাতে লাগলেন, 'আমি নতুন লোক না-কি? নতুন লোক পেলে তো তোমরা আরও লুটে-পুটে নাও।'

কুলিরা অনুনয়-বিনয় করছে, কৃপা প্রার্থনার সুরে মজুরি চাইছে। কিছুক্ষণ পর মেম সাহেব আট আনা থেকে দশ আনায় পৌছলেন। চাকর মালপত্র ঠিকঠাক করতে লেগেছে, মেম সাহেবেরও খুব একটা তাড়া নেই, তাই অনেকক্ষণ তিনি দশ আনাতেই অটল হয়ে রইলেন। যখন মালপত্র ঠিক ঠিক জায়গা-মতো রাখা হলো, তখন তিনি বারো আনা দিতে বলে বাড়ির ভেতর পা বাড়ালেন। মিউনিসিপ্যালিটির আইন মোতাবেক যদিও কুলিদের এক টাকা পাওনা হয়, কিন্তু মেম সাহেবের মতো লোকদের কাছ থেকে এক টাকা আদায় করিয়ে দেওয়া মিউনিসিপ্যালিটির সাধ্য নেই। এ রকম ভ্রমণবিলাসী রিকশাওয়ালাদের অপরিচিত নয়। মেম সাহেব যে ন্যায্য মজুরি থেকে মাত্র চার আনা কমিয়েছেন, এটা তাদের ভাগ্যই বলতে হবে।

মেম সাহেব এবং সাহেব-পুত্র দুটি স্টেশনেই চা-টা খেয়ে এসেছেন, দুপুর পর্যন্ত অপেক্ষা করার জন্য এখন কয়েকটা চকোলেটই যথেষ্ট। মেম সাহেব এসে পড়তেই

বাড়ির দারোয়ান খোঁশ-খবর জানালো যে সে তিনজন চাকরের ব্যবস্থা করে ফেলেছে। একটু পরে তিনজন চাকরকেই তাঁর সামনে হাজির করানো হলো। মধুপুরীতে খাওয়া-দাওয়া এবং মাসে চল্লিশ টাকা মাইনেতেও একজন ভালো বামুন-ঠাকুর পাওয়া সম্ভব নয়, সেখানে শুকনো পঁচিশ টাকায় ভালো চাকর কোথায় পাওয়া যাবে ? ভালো চাকরের অতো দরকারও ছিল না প্রমোদবালার। রান্না-বান্নার জন্যে ওদের সঙ্গে আসা চেতু তো রয়েছেই, অন্যান্যদের মধ্যে একজন মালীর কাজ করবে, দ্বিতীয় ব্যক্তি থালা-বাসন ধোবে, আর তৃতীয় জন মেম সাহেবের হুকুম তামিল করার জন্যে সব সময় তৈরি থাকবে। দানে-পাওয়া বাছুরের দাঁত দেখা হয় না, তাই চাকর নিয়ে অতো মাথা ঘামানোর প্রয়োজন বোধ করলেন না তিনি। বাড়ি-সংলগ্ন বাগানে ফুল দেখে প্রমোদবালা খুব খুশি হলেন। হাজারী ডালিয়া ফুটেছে খুব, লাল চিত্র-বিচিত্র ঐ ফুলটি মহিলার খুব পছন্দ। বাগানে ঐ ফুল প্রায় ডজন খানেক হাওয়ায় দুলছে। রঙ-বেরঙের গ্ল্যাডিওলাও ফুটেছে। মালী জানালো, যে-পরিবারটি এই প্রমোদ-ভবনে সীজন কাটিয়ে গেছে, তাদের খুব ফুলের শখ ছিল। যদিও তারা পুরোপুরি ফুলের বাহার দেখে যেতে পারেনি, তবু ওগুলোর দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখত তারা।

প্রমোদবালা আশপাশের বাড়ির ভাড়াটেদের সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিলেন। জানা গেলো, সেগুলো এখনও খালি পড়ে আছে। বর্ষাকালে ভর্তি হবে এমন আশাও করা যায় না, কারণ এই সীজনে ভ্রমণবিলাসীরা ম্যল্ রোডের আশপাশের সস্তা বাড়ি ছেড়ে নিশ্চয়ই এতদূর আসতে চাইবে না। তিনটে বাড়ির পরে চির-পরিচিতা এক অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান বুড়ি থাকেন, এখনও রয়েছেন। যদিও তিনি মান্ধাতা আমলের লোক, কিন্তু বড় মিশুক, মাঝে মাঝে প্রমোদ-ভবনের নতুন ভাড়াটের সঙ্গে তাঁর বেশ অন্তরঙ্গতা গড়ে ওঠে। বাড়িওয়ালার বারোমাসের দারোয়ান সপরিবারে থাকত। স্ত্রী আর দু'বছরের একটি ছেলে নিয়ে তার সংসার। অনেকক্ষণ তাদের কাছেপিঠে দেখতে না পেয়ে দারোয়ানকে জিজ্ঞেস করলেন ভদ্রমহিলা। দারোয়ান কাঁদো-কাঁদো মুখে অগোছালোভাবে জবাব দিলো, 'ওর কথা আর শুধাবেন না মেমসাব, শালী হারামজাদী পালিয়ে গেছে। পাশের কুঠির খানসামা আমার কাছে যাওয়া-আসা করত। আমি কি জানতাম যে আস্তিনের ভেতরে সাপ লুকিয়ে আছে। আমরা একসঙ্গে সিগ্রেট খেতাম, হাসি-মজাক করতাম। যেই সীজন খতম হয়ে এলো, অমনি একদিন সে আমার বউটাকে আর সেই সঙ্গে দেড় বছরের বাচ্চাটাকে নিয়ে কেটে পড়ল।'

এতে দারোয়ানের ওপর ভদ্রমহিলার যে খুব সহানুভূতি হলো, তা নয়। তিনি আধুনিক আদব-কায়দায় শিক্ষিত সুসংস্কৃত মহিলা। মেয়েরা পুরুষের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়, এ-কথায় বিশ্বাস করেন তিনি। সেজন্যে শুকনো-চিমসে মুখের দারোয়ানকে ছেড়ে যদি তার ডবকা চেহারার বউটা পালিয়ে যায়, তাহলে তাতে

সে এমন কি দোষ করেছে ? এটাই তাঁর ধারণা। তবু বাইরে দারোয়ানের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করতেও হলো তাঁকে। বহুদিন থেকে দারোয়ানটি এ বাড়িতে রয়েছে, সব সময় তাঁর ফাই-ফরমাশও খাটে। মজুরির ব্যাপারে ভদ্র-মহিলা লোকটিকে কখনও কোনো কথা বলার সুযোগ দেন না।

তিন

প্রমোদ-ভবনের মেমসাহেব যদিও ফুর্তি ওড়ানোর জায়গা থেকে দূরে নিরিবিলিতে বাস করেন, তার মানে এই নয় যে তিনি ও রকম জীবন পছন্দ করেন না। সূর্যোদয়ের আগেই তিনি প্রমোদ-ভবন থেকে উধাও হয়ে যান, মাঝ-রাত্তিরের আগে ফেরেন না। এ-সময়টাতে তাঁকে কখনও দেখা যাবে না বাড়িতে। তাঁর স্বামী একজন উচ্চপদস্থ সরকারী অফিসার। এমন একটি বিভাগ তাঁর হাতে যে ঘরে সোনা-চাঁদির স্রোত বয়ে যায়, তাই মেমসাহেবের টাকা পয়সার কম না হওয়ারই কথা। কিন্তু পতিদেবতাটিকে কদাচিৎ মধুপুরীতে দেখা যায়। সুযোগ পেলেই তিনি অন্য কোনো প্রমোদ-নগরীতে চলে যান, আর মেমসাহেবকে তাঁর চার মাসের প্রবাস-জীবন এখানে একাই কাটাতে হয়। অবশ্য তাতে লোকসানের কিছু নেই, কেননা এজন্য তাঁর স্বাচ্ছন্দ্যের কোনো ব্যাঘাত ঘটে না। তিনি একা এখানে এসে থাকেন, স্বামী কখনও সঙ্গে আসেন না, তাই দেখে পাড়া-পড়শীর মধ্যে কানাকানি শুরু হয় —স্বামী হয়ত তালাক দিয়ে দিয়েছে। আধুনিক ভদ্র-সমাজে তালাক-প্রথা ইতিমধ্যেই বেশ স্বীকৃত, অতএব সেটা এমন কিছু আশ্চর্য নয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে লোকের ধারণা ভুল। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মাসের পর মাস বাক্যালাপ না থাকতে পারে, চার-চার মাস তাঁরা পরস্পরের কাছ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে থাকতে পারেন, তবু তাঁরা তালাকের কোনো প্রয়োজন বোধ করেন না, কিংবা বলতে হবে, তাঁদের তালাক পুরোপুরি মানসিক।

দেড় মাইল দূর এমন কিছু দূর নয়, দেড় গজের মধ্যে যখন সব সময় রিকশা পাওয়া যায়। আর এটা এমন সীজনও নয় যে রিকশাওয়ালারা পুরো ভাড়া আশা করবে, তাই কম ভাড়াতেই তাদের যেতে-আসতে আপত্তি থাকে না। প্রমোদবালা রিকশায় উঠে রাত্রি-বিহারের কথা মনে মনে ভেবে নেয়। ম্যলরোডে ড্যান্সের ভালো ব্যবস্থা আছে। তিনি কখনো এক হোটেলে, আবার কখনো এক হোটেল থেকে আর এক হোটেলে চলে যান। ব্রিজ খেলায় তাঁর খুব শখ, বলা বাহুল্য, খেলায় তাঁকে হারতেই হয়। প্রমোদ-ভবনে তাঁকে খানিকটা রাশভারি দেখায়, কিন্তু হোটেলের পরিবেশে ঝলমল করে ওঠেন তিনি, মুখে হাসি উথলে ওঠে। তাঁর কালো ঢেউ-খেলানো চুল, চোখের ওপর ভুরুতে কালো পেন্সিলের টান। কৃত্রিম প্রসাধনে দীর্ঘ চক্ষুপল্লব, মৃগনয়না হওয়ার বাসনায় কাজলের রেখায় চোখ

দুটি দীর্ঘায়ত। গুণগ্রাহীরা যখন তাঁকে চারদিকে ঘিরে থাকে, তখন তাঁকে আনন্দে বিভোর হয়ে যেতে দেখা যায়। তাঁর অভ্যস্ত পায়ের বলড্যান্সের নৈপুণ্য সবাইকে ছাড়িয়ে যায়। অন্যান্য মেয়েরা তাঁকে ঈর্ষা করে, কারণ ভালো নাচ-জানা যুবক তাঁর সঙ্গেই নাচতে পছন্দ করে বেশি।

কয়েক বছর আগে মধুপুরীতেও গান্ধীজীর হাওয়া লেগেছিল, সরকার মধুপুরীকে 'শুষ্ক অঞ্চল' ঘোষণা করেছিলেন। সে-সময় সত্যি সত্যিই মধুপুরীর মজাটাই পানসে হয়ে গিয়েছিল। সুরা ব্যতীত জীবনে কি কোনো রসকষ থাকে? অন্তত এটুকু মঙ্গল বলতে হবে যে তখনও দোকানে আস্ত বোতল কিনতে পাওয়া যেত, আর তা বাড়ি নিয়ে গিয়ে ঘরে বসে গলাধঃকরণ করা যেত। কিন্তু সেটা কি মদ খাওয়ার কোনো তরিবত হলো? প্রমোদভবনের মহিলা তো সেটাকে নিছক জংলীপনা বলতেন। গত বছর যখন সরকার মধুপুরীকে সেই কড়াকড়ির নাগপাশ থেকে রেহাই দিলেন, তখন সবচেয়ে বেশি আনন্দ হয়েছিল তাঁরই। এখন আর বাড়ি থেকে মদ খেয়ে আসতে হয় না। হোটেলের ঐ হলঘরেই মদে চুমুক দেওয়া, ব্রিজ খেলা, চোখ-ঠারা, নাচা, সবই চলে—এই তাঁর চার মাসের রোজকার কাজকর্ম। ছেলে দুটি মধুপুরীর ইউরোপীয় স্কুলে পড়ে, তাই তারা দিনের বেশির ভাগ সময়টাই মায়ের কাছে থাকে না। তাহলে আর বাকি থাকে চাকর-বাকর, মেমসাহেব আর প্রমোদ-ভবনের ঘরদোর। ভদ্রমহিলার বাড়িতে প্রায়ই কোনো না কোনো অতিথি এসে থাকে, তাদের কেউ কেউ পুরো সপ্তাহ কাটিয়ে যায় প্রমোদ ভবনে, তাই তাঁর আপনজন কেউ নেই, একথা বলা যায় না।

অন্যান্য অনেক মেয়ের মতোই প্রমোদবালারও ব্যয়বহুল জীবন পছন্দ, সেজন্য স্বামীর কাছ থেকে টাকাকড়ি পান, তাতে কুলোয় না, ফলে ধার-কর্জ ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না। ধারের টাকা উড়ে যায়, কিন্তু উড়িয়ে যদি শেষ না করা যেত, তাহলে প্রমোদবালা খুশি হতেন। নতুন রাখা চাকরদের সঙ্গে তাঁর প্রতি মাসে ঝগড়া হয়। চাকর-বাকরদেরও এক-আধটু খটকা লেগেছিল, তাই তারা মাসে মাসে মাইনে নিয়ে নিতে চায়। কিন্তু তিনি পাঁচ-সাত টাকা করে দিয়ে বাকিটা হাতে রাখতে চান। কিন্তু শুকনো মাইনেতে কাজ করছে তারা, খাওয়া পরার জিনিস কেনা-কাটা করতে মাসে মাসে মাইনেটা তাদের দরকার। ভদ্রমহিলা যখন দেখেন, তাদের কিছুতেই দমিয়ে রাখা যাচ্ছে না, তখন তাদের ঘাড়ে চুরির দায় চাপিয়ে দেন, পাশে পুলিশ ফাঁড়িতে রিপোর্ট করেন। পুলিশের লোকের কাছে তিনি বেশ পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন, তাই তাঁরা জানতেন যে এটা মাইনে না দেওয়ার ফিকির। কখনো-সখনো তাঁরা বুঝিয়ে-সুজিয়ে কিছু কিছু আদায় করিয়েও দেন, নইলে ভদ্রমহিলা সাফ অস্বীকার করে দিলে ঘরের খেয়ে আদালতে মামলা মোকদ্দমা করে টাকা-পয়সা উসুল করা কি চাট্টিখানি ব্যাপার? ধার-দেনার টাকা আর গরিবের মজুরির টাকা মেরে দেওয়াটা প্রমোদবালার কাছে এক মামুলী ব্যাপার।

কিন্তু কেউ যখন তাঁর দামী বেশভূষা গয়নাগাঁটি দেখে, তাঁর কথাবার্তা আর ওপর মহলের লোকজনের সঙ্গে দহরম-মহরমের কথা জানতে পারে, তখন কি সে বিশ্বাস করতে পারে যে এই ভদ্রমহিলাই গরিবের পয়সা মেরে দেওয়ার ফিকিরে থাকেন? কয়েক বছর ধরে এখানে এসেই থাকেন বলে পুলিশ আর পাড়া-পড়শীরা তাঁর এই স্বভাব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল, কিন্তু কেউ তাঁর পথে বাধা সৃষ্টি করতে প্রস্তুত নয়। যার বাধা দেওয়ার ক্ষমতা আছে, সে স্বয়ং প্রমোদবালার মদিরা পাত্র, চা কিংবা ভোজনে সামিল হয়ে তাঁর একান্ত বাধিত হয়ে পড়ে।

চার

সচরাচর ন'টার আগে প্রমোদবালার ঘুম ভাঙে না। এমনিতে চাকরকে বলে রাখা হয়েছে, ছ'টা বাজলেই যেন খাটের পাশে বেড-টি দেয়। প্রায়শই চা ঠাণ্ডা হয়ে যায়, ফেলে দিতে হয় সেটা। তবুও আদেশটি নিয়মিত পালন করতে হয়। বিছানা থেকে উঠে মুখ-হাত ধুয়ে প্রমোদবালা দীর্ঘ আয়নার সামনে বসে সাজ-সজ্জা শুরু করেন, কিন্তু এখন সেটা মামুলী সাজ-সজ্জা। আসল সাজগোজ তো শুরু হয় বিকেল চারটের চা খাওয়ার পর, তাতে কম-সে-কম দু'ঘণ্টা লাগে। তখন তিনি নিজেকে বলড্যান্স ও ব্রিজের দলে যোগ দেওয়ার উপযোগী করে তৈরি করেন। ডালিম-দানার মতো তাঁর দাঁত, কিন্তু মুক্তোর মতো সাদা ঝকঝকে, খুব কম লোকেরই জানা আছে যে দু'পাটি দাঁতের সবগুলোই নকল। তাঁর সব দাঁত আপনা থেকেই উঠে যায়নি, কিন্তু সেগুলোর গড়ন-গঠন ভালো ছিল না, তাই দাঁত নষ্ট হওয়ার অনেক আগেই তিনি সেগুলো তুলে ফেলে মুক্তোর মতো সাদা ঝকঝকে দাঁত বাঁধিয়ে নিয়েছেন। তাঁর ভুরু জোড়া কালো, কিন্তু খুব মোটা, আর তার সঙ্গে ছোট ছোট রোম রয়েছে। তিনি রোমগুলোকে তুলে ফেলে দিয়ে কালো পেন্সিলে লম্বা রেখা টেনে দেন। ঠোঁটের ওপরেও হালকা কালো রোমের রেখা ছিল, ওগুলোকে ঢাকবার জন্যে মহিলাকে খুব পরিশ্রম করতে হয়—গুঁফো মেয়ে কে আর পছন্দ করে! তাঁর সবচেয়ে বড় সমস্যা, মুখের ওপর বাড়তি রোমগুলোকে কমানো। জুলফি না থাকলে কালো রেখা টেনে জুলফি বানিয়ে নেওয়া সহজ, রাতের আলোয় দেখে বোঝা যায় না আসল কি নকল। কিন্তু মুখের বাড়তি রোমগুলোকে কমানো বড় মুশকিল। তিনি কতবার রুজ-পাউডার লাগান, মোছেন, এদিক-ওদিক মুখ ঘুরিয়ে আয়নায় দেখেন, আঙুলে ধরা যায় না এমন সব রোম, যদি কোনোরকমে ঢেকে দেওয়া যেত কিংবা অন্য কোনো কারুকলায় রূপ দেওয়া যেত, তাহলে তাঁর রূপখানি ঝলমল করে উঠত। রোমগুলোকে যদিও বা এক-আধটু কায়দা করা যায়, তো চিবুকের নিচে ঝুলে-পড়া মাংসটাকে কোনো মতেই দূর করা সম্ভব নয়। গলার চামড়াতেও ভাঁজ পড়েছে। সত্যিই, এখন আর সাজগোজ তো নয়, যেন

মুগুর নিয়ে এক প্রচণ্ড দুশমনের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে লড়াই। তিনি চুলের ভালোমানুষীর প্রশংসা না করে পারেন না, কারণ নতুন আবিষ্কৃত কলপ শুধু একবার লাগিয়ে দেওয়া, ব্যস, পাঁচ মিনিটের মধ্যেই শুকিয়ে যাবে, আর সঙ্গে সঙ্গে গাঢ় নীল রঙের কোঁকড়ানো চুল হয়ে যাবে। মহিলা কৃতজ্ঞতায় গদগদ হয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন—আঃ, চুলের মতো যদি অন্যগুলোও একটু ভদ্রগোছের হতো! বারবার চেষ্টা করেও যখন মুখের রোমগুলোকে ঢাকতে পারেন না, তখন হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে, 'হায় রে বার্ধক্য!' প্রকারান্তরে দুশমন বার্ধক্যের হাতে হেরে যাওয়ার স্বীকৃতিই সেটা। 'হায়' শব্দটি যৌবনের ক্ষেত্রেই উপযুক্ত, তাই তাঁর বলা উচিত ছিল, 'হায় রে যৌবন!' কিন্তু জিভের ডগায় প্রিয় থেকে অপ্রিয়, বন্ধু থেকে শত্রুর নামই আগে আসে। ওদিকে আবার চারটে থেকেই প্রমোদবালা আয়নার সামনে বসে বার্ধক্যের সঙ্গে লড়াই করতে থাকেন। তখন তাঁর সারা জীবনের কথা মনে পড়ে যায়। স্বামীদেবতাটি ইংলণ্ড থেকে লেখাপড়া শিখে এসেছিলেন। বয়সে তরুণ, বংশগত বেকুবির ফলে যথাসময়ের অনেক আগেই তাঁর মুখখানা দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল হয়ে উঠেছিল। তখনও তিনি বেঁটে, আর প্রয়োজনের তুলনায় একটু বেশি মোটা ছিলেন। বিলাত থেকে পাশ করে আসা সরকারী কর্মচারীকে প্রমোদবালার ব্যারিস্টার বাবার মনে ধরবে না কেন? তখন ব্যারিস্টার-দুহিতা আঠারো বছরের যুবতী। যৌবনে গর্দভীও অপ্সরী হয়ে ওঠে, তাছাড়া মেয়েটিকে তো কুরূপাও বলা যেত না। অবশ্য ভুরু জোড়া খারাপ ছিল, ঠোঁটের ওপরে কালো রোমের রেখা নিশ্চয়ই রূপের জলুস বাড়াত না, চেহারাটাও স্বাভাবিক থেকে একটু ভারি হয়ে উঠেছিল, কিন্তু ষোড়শী হতে না হতেই এই সব ত্রুটিগুলোর সঙ্গে লড়াই করতে পারদর্শিনী হয়ে উঠেছিলেন তিনি। তাঁর কৃত্রিম সাজ-সজ্জা সাঙ্গ হলে তবেই তাঁর ভাবী বর তাঁকে দেখার সুযোগ পেতেন, ফলে বাস্তবের ধারে-কাছে পৌঁছানো তাঁর ভাবী বরের পক্ষে সম্ভব হয়নি। আর তাছাড়া রূপ-লাবণ্য তো শুধু একতরফা তাঁরই দাবি হতে পারে না! তিনি নিজেই বা এমন কি রাজপুত্র ছিলেন! তখন মাইনেটাও খুব একটা বড় অঙ্কের ছিল না, একজন আই. সি. এস.-ও নন। ঐশ্বর্যের প্লাবন, যা স্বাধীনতার পরে 'দ্বিগুণ স্রোতে' বইতে শুরু করে, তখন তার নাম-নিশানাও ছিল না। হাজার হোক একজন মানুষ নিজের অবস্থান অনুযায়ীই তো কোনো কিছু দাবি করবে? বিয়ের পর স্বামী-স্ত্রী উভয়েই পরস্পরের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। বিলাত-ফেরত স্বামী নিজের স্ত্রীর কাছে যা যা প্রত্যাশা করতেন, তা তিনি যথেষ্ট পরিমাণে দেওয়ার জন্যে তৈরি থাকতেন।

কিন্তু মানুষের চিরদিন একই অবস্থা থাকে না। স্বামী দ্রুত এগিয়ে চললেন, যোগাযোগ, ব্যবহার আর যোগ্যতায় অন্যদের পেছনে ফেলে পরবর্তী গ্রেডে পৌঁছে গেলেন, মাইনে আর সেই সঙ্গে উপরি আমদানীও দ্রুত বেড়ে চলল। এখন তিনি

আর আশা-নিরাশার মধ্যে পড়ে থাকা এক সাধারণ তরুণ অফিসার নন। এদিকে তাঁর স্ত্রী চারটে জীবিত এবং চারটে মৃত সন্তানও প্রসব করেছেন। বয়সের তুলনায় বেশি সন্তান হওয়ার ফলে তার প্রতিক্রিয়া পড়েছে স্বাস্থ্যের ওপর। স্বামী দেবতাটির কাছে তিনি ক্রমশ পানসে বোধ হতে থাকেন। দুর্ব্যবহার সহ্য করার আদত প্রমোদবালার ছিল না, তাই তিনি প্রতিবাদ করতেন, কিন্তু আসল প্রভুত্ব তো টাকা-পয়সারই, সেটা স্বামীর হাতেই। স্ত্রীকে তাঁর দয়ার ওপরেই নির্ভর করে থাকতে হয়। কয়েক বছর ধরে তো এমন মনে হচ্ছিল যে দু'জনে বিবাহ-বিচ্ছেদ করে নেবেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই অবস্থাটাকে কাটানো গেলো। উভয়েই ভালো মন্দ বিচার করে দেখলেন, দিন-দিন ছেলেমেয়েরা বড় হচ্ছে, তাদের কাছ থেকে ঠিক তালাকের অনুমতি পাওয়া যাচ্ছে না। তালাকের পর ছেলেমেয়েদের কি হবে? বস্তুত অধিক দূরদর্শিতার প্রশংসা স্বামীরই প্রাপ্য, কারণ তিনি নিজের ইচ্ছের চেয়ে ছেলেমেয়েদের কথাই বেশি করে ভেবেছিলেন। স্ত্রী ক্রমশ বিগত-যৌবনা হয়ে পড়েছিলেন। রাতদিন গজগজ করতে করতে ঘরের শান্তি নষ্ট করতেন। অবশেষে স্বামীর প্রস্তাব তিনিও স্বীকার করে নিলেন। স্বামী তালাক দিয়ে দিলেও তো তাঁর আর বিয়ে করার বাসনা ছিল না, সে সম্ভাবনাও ছিল না। রাতের আলোয় তাঁকে দেখতে সুন্দরী যুবতী বলে মনে হলেও দিনের উজ্জ্বলতায় কানাকড়িটিও নন। তালাক নিলে হয়ত ছেলেমেয়েদের দাবি ছাড়তে হতো, ফলে শুধু সামান্য হাত-খরচের টাকার ওপরেই নির্ভর করতে হতো তাঁকে। সেটা না করে বরং ভালোই করেছেন। স্বামীর সঙ্গে লোক-দেখানো ওপর-ওপর পুরনো সম্পর্ক বজায় রাখাতে অনেক সুবিধে হয়েছে, মধুপুরীতে চার মাস বড় আরামে কাটে তাঁর। কখনো কখনো তাঁর মুখ থেকে 'হায় রে বার্ধক্য' বেরিয়ে যায় ঠিকই, কিন্তু সেজন্যে স্বামীকে দায়ী করা যায় না। এখন দু'জনের জীবন দুই স্বতন্ত্র ধারায় প্রবাহিত। দু'জনে পরস্পর সম্পূর্ণ পৃথক থেকে জীবনের আনন্দ উপভোগ করেন, কিন্তু সমাজের চোখে তাঁদের পরস্পরের সম্পর্ক সেই আগের মতোই। প্রমোদবালা এভাবে জীবন কাটাচ্ছেন গত বারো বছর ধরে। জীবনের যাবতীয় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য তাঁর কাছে যথেষ্ট শস্তা ছিল, কিন্তু এ-বছর তাঁর প্রথম মনে হচ্ছে, এতদিন ধরে তিনি যে অভিনয় করে আসছেন, তা আর বেশিদিন চালানো সম্ভব নয়। যতই চেষ্টা-চরিত্র করে বার্ধক্যের ওপর কালো আস্তরণ টেনে দিতে চেষ্টা করুন না কেন, রাতের আলোতেও অনুসন্ধিৎসু চোখের সামনে থেকে তা লুকানো সম্ভব হয় না। মদের আসরের দিল-দরিয়া মেজাজও আর অপেক্ষাকৃত তরুণ পুরুষকে কাছে টানতে সাহায্য করে না, পাশের টেবিলে বসে বসে তরুণী মেয়েরা প্রকাশ্যে না হোক, আড়-চোখে প্রমোদবালার অভিনয় দেখে দারুণ ঠাট্টা-তামাশা করতে থাকে।

কুমার জুরঞ্জয়

পৃথিবীর বহু জায়গায় সামন্তবাদ অবসান হয়েছে অনেক কাল আগেই। কিন্তু ইংরেজরা ভারতে সেটাকে যথেষ্ট পালন-পোষণ করে রেখেছিল। স্বাধীনতার পর আসল রাজক্ষমতা ইংরেজ বেনেদের হাত থেকে দেশী বেনেদের হাতে না এলে ভারতে সামন্তবাদের অস্তিত্ব খুঁজেই পাওয়া যেত না। যেখান থেকে ভারতের সবচেয়ে বড় বেনেরা আসতেন, সেই রাজস্থানে ইংরেজরা রাজাদের বল্গাহীন অবস্থায় ছেড়ে রেখেছিলেন। পুজো, ভেট ইত্যাদির মারফত বেনেরা নিজেদের কাজ কিছুটা গুছিয়ে নিতেন, কিন্তু সেখানে কোনো আইন-কানুন ছিল না; বলতে গেলে একজন ব্যক্তিরই আধিপত্য ছিল। অন্তত পুঁজি বিনিয়োগ করে সেখানে শিল্প কারখানা স্থাপনে কোনো শেঠ আগ্রহী ছিলেন না, সেজন্য ভারতের প্রকৃত শাসক দেশী বেনেদের চোখে স্বেচ্ছাচারী পুতুল-রাজা কাঁটার মতো খচখচ করে বিঁধত। কিন্তু, যতদিন ইংরেজ এখানে ছিল, শুধু ততদিনই নয়, এখান থেকে তারা চলে যাওয়ার পরও বেনেদের এমন ক্ষমতা ছিল না যে কেবল নিজেদের জোরেই এই কাঁটাগুলোকে রাস্তা থেকে তুলে ফেলে দেন। এজন্য অবশ্য তাঁদের ভাববার বিশেষ দরকার ছিল না, কারণ ইংরেজ আমলেই দেশীয় রাজ্যের প্রজারা অনেকবার গুলি খেয়েছে, তবু তারা সংঘর্ষের পথ ত্যাগ করেনি। ওদের ভয়েই শেষ পর্যন্ত রাজাদের হাতে অবাধ ক্ষমতা দিতে হয়েছিল। শুধু তাই নয়, নিজেদের অধিকারও ত্যাগ করতে হয়েছিল। এখন তাঁরা সরকারের পেন্সন ভোগ করছেন, এদিকে আবার সেই সঙ্গে গরিব প্রজাদের উপার্জনে যথেষ্ট ফলারও চালিয়ে যাচ্ছেন। যদিও শত বর্ষের প্রাচীন রাজ্যগুলিকে মৃত্যু-যন্ত্রণা পোয়াতে হয়নি, বলা যেতে পারে, হার্ট-ফেল হয়েছিল তাদের, কিন্তু শান্তিপূর্ণ লুট-তরাজ চলেছিল বেশ ভালোই। যে-সব রাজা বেশি বুদ্ধিমান, তাঁরা শুধু নিজেদের গয়নাগাঁটি টাকাকড়িই নয়, কোষাগারে সঞ্চিত রাজস্বও ঝেড়ে-মুছে সাফ করে দিয়েছিলেন, অকেজো বাড়ি-ঘরগুলো ছেড়ে দিয়ে বাকি সমস্ত অট্টালিকাকে নিজেদের সম্পত্তি বানিয়ে নিয়েছিলেন। আর যেখানে নাবালক কিংবা নির্বোধ রাজা ছিলেন, সেখানে যারা চার্জ বুঝে নিতে এসেছিলেন তাঁরাই 'যত পারো লুটে-পুটে নাও' স্লোগান তুলে ছিবড়ে করে ছেড়ে দিলেন। নিজেদের অপরাধের যাতে কোনো চিহ্ন না থাকে, সেজন্য বহু জায়গায় পুরনো ঐতিহাসিক কাগজপত্রের হোলি খেললেন এইসব নতুন প্রভুরা

—আর তার ফলে কত ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ দলিল-দস্তাবেজ নষ্ট হয়ে গেলো চিরদিনের মতো। চালাক-চতুর রাজারা, এমন কি নিমকহালাল চাকর-বাকরের সহযোগিতায় সাধারণ ধনীব্যক্তিরাও রাজ্যের অধিকাংশ সম্পত্তি হাতিয়ে নিতে চাইলেন। কতজন তো হাজার হাজার একর উর্বর জমি দখল করে নিজেদের ফার্ম তৈরি করলেন, ট্রাক্টর আনিয়ে তাতে চাষাবাদ শুরু করে দিলেন। আর সরকার তো কৃষকের স্বার্থরক্ষা বলতে এটুকুই বোঝেন, নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্যে যেটুকু করতে বাধ্য হন তাঁরা।

কুমার ভুরঞ্জয় এই রকমই এক দেশীয় রাজ্যের রাজকুমার। তাঁর বাবা, ঈশ্বর তাঁর মঙ্গল করুন, ১৯৪৭-এর ঘূর্ণিঝড় দেখার জন্যে অপেক্ষা করেননি, নইলে দেশীয় রাজ্যের সঙ্গে তাঁরও হার্টফেল হতো। তিনি ভারতের সবচয়ে বড় স্বেচ্ছাচারী রাজা ছিলেন, তাঁর কীর্তি-কলাপের খ্যাতি বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। তিনি খুন করাতেন, তা নিয়ে দেশে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ত, কিন্তু ইংরেজ তাদের এমন একনিষ্ঠ ভক্তটির সাতটি খুন কেন, ষাটটি খুনও মাফ করে দিতেন। তাঁর রাজ্যটা যথেষ্ট বড়, তবু তার আগে মহারাজার খরচ কুলোতো না, শেঠদের কাছ থেকে ধার করতে হতো। হারেমে নতুন নতুন সুন্দরী মেয়ে নিয়ে আসা তো তাঁর একটা বাতিক ছিল। পাহাড়ী অঞ্চলে যখন তিনি আসতেন, তখন সংবাদপত্র ও নাগরিক জীবনের অনেক পেছনের যুগে বাস করে যে-সব সরল সাদাসিধে মানুষ, তাদের মধ্যেও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ত—বউ-বেটীদের আগলাও...অমুক রাজা এসেছেন। কিন্তু সেটা তেমন বউ-বেটীদের আগলানোর মতো ব্যাপার ছিল না। রাজা তো আর নিজে সব জায়গায় লুট-পাট করে বেড়াতেন না। তিনি কত রঙরুট অফিসার চারদিকে ছড়িয়ে রেখেছিলেন, তারা রাজ্য এবং রাজ্যের বাইরে থেকেও সুন্দরী মেয়ে সংগ্রহ করার কাজ করত। প্রাতঃস্মরণীয় সম্মানার্হ পুরুষোত্তম রামের পিতা প্রাতঃস্মরণীয় সম্মানর্হ পুরুষোত্তম দশরথের ষোলো হাজার রানী ছিলেন। আমাদের এই মহারাজার রানীর সংখ্যা অবশ্য ষোলো হাজারে পৌঁছায়নি, কিন্তু হাজারের ওপর যে ছিল, তাতে সন্দেহ নেই। চার ডজনের ওপর তো তাঁর রাজকুমারীই ছিল, আর রাজকুমারও যা ছিল, তাতে একটা পল্টন গড়ে তোলা এমন কিছু কঠিন ছিল না। এঁদেরই একজন হলেন আমাদের এই গল্পের নায়ক কুমার ভুরঞ্জয় সিং। স্বর্গবাসী মহারাজা তো তাঁর অন্তঃপুরটিকে দেশ আর ভাষার এক চিড়িয়াখানা বানিয়ে রেখেছিলেন। রানীর সংখ্যা যতই হোক, তাদের কেউ কেউ বয়স আর সৌন্দর্যের খাতিরে কিছুকালের জন্যে হয়ত মহারাজার একান্ত অনুরাগের পাত্রীও হয়ে উঠত, কিন্তু গদির প্রশ্ন উঠলে সেটা সদ্বংশজাত রানীর জ্যেষ্ঠ পুত্রেরই পাওনা ছিল। এই নিয়মানুসারেই, জ্যেষ্ঠ পুত্র হওয়া সত্ত্বেও কুমার ভুরঞ্জয় গদি থেকে বঞ্চিত হলেন, তাঁর কয়েক ডজন কনিষ্ঠ ভ্রাতার মধ্যে যিনি সবচেয়ে বড়, তিনিই হলেন মহারাজা কিন্তু স্বর্গীয় মহারাজা অন্যান্য কুমারদের

বেলা যেরূপ, সর্বজ্যেষ্ঠ কুমারের বেলা সেরূপ কার্পণ্য করেননি। তিনি মধুপুরীতে দুরঞ্জয়কে দু-তিনখানা বাংলো আর যথেষ্ট উর্বর জমি আগে থেকেই দিয়ে রেখেছিলেন, এ থেকেই সেটা অনুমান করা যায়।

কুমার দুরঞ্জয়ের গায়ের রঙ শ্যামবর্ণ, বলতে গেলে, কিছুটা কালোই। এমনিতে ছ'ফুটের লম্বা চওড়া চেহারা। রঙে তেমন কিছু যায় আসে না, যদি চেহারাটা ভালো হয়। রঙ তো সৌন্দর্যের গ্যারান্টি নয়। কুমারের শরীরটা মোটা-সোটা, আর সে অনুপাতে মাথায় ঘিলু একটু কম, তবুও তাকে একেবারে বেকুব বলা যায় না। তিনি যুবরাজ ছিলেন না, কয়েক ডজন রাজকুমারের একজন হওয়ার জন্য হাত খরচও খুব কম পেতেন। বাবার যখন হারেম চালাতেই সারা রাজ্যের উপার্জনে কুলোয় না, তখন তিনি কুমার দুরঞ্জয়ের প্রতি আর কত উদারতা দেখাবেন? এদিকে দুরঞ্জয় একটা বেশ বড়-সড় রাজ্যের রাজকুমার, কত আর হাত ছোট করবেন? তাতে আবার এক রাজার শালা আর অন্য একজনের ভগ্নিপতি। পৃথিবীতে তাঁর প্রথম আগমন হেতু পিতাও তাঁকে যথেষ্ট আদর আশকারা দিয়েছিলেন। তাঁর নিজের মোসাহেব রয়েছে, সাঙ্গোপাঙ্গও রয়েছে। খরচপত্রের জন্যে রাজ্যের তরফ থেকে জায়গির জুটেছিল, কিন্তু জায়গির থেকে যা আয়, তা কাজ চলার মতো নয়। তবুও বাবা যতদিন বেঁচে ছিলেন, এবং বিশেষ করে ইংরেজরা যতদিন দেশ ছেড়ে চলে যায়নি, অন্তত ততদিন পর্যন্ত কুমার প্রকৃতপক্ষে কুমারই ছিলেন। সেবারে মধুপুরীতে আর একখানা বাংলো নেওয়ার বড় ইচ্ছে হয়েছিল তাঁর। তিনি যখন সেখানে গেলেন, তাঁর সঙ্গে ছিল ঢাল তলোয়ার আর বন্দুকধারী আরদালী মোসাহেবের দল। দূর থেকে সেই পল্টন দেখে বাড়ি বিক্রেতা মহিলাটি সত্যি সত্যিই দারুণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। তিনি অবশ্য তাঁদের ডাকাত বলে ভাবেননি, ডাকাত বলে ভাববার কারণও ছিল না, কেননা ডাকাতদের উর্দি অতো জমকালো হতে পারে না, তাছাড়া দিন-দুপুরে তারা এভাবে আসতেও পারে না, আর তখনকার দিনে মধুপুরীতে ডাকাতি কেন, চুরির কথাই শোনা যেত না। পরে যখন বোধগম্য হলো ব্যাপারটা তখন তিনি আর তাঁর সঙ্গিনীরা খুব হেসেছিলেন। এটা সেই সময়ের কথা, যখন মধুপুরী পুরোপুরি ইংরেজদের হাতেই ছিল, অর্থাৎ তাঁরা সারা ভারতটাকে যেভাবে শাসন করতেন, সেভাবে তো নয়ই, বরং মধুপুরীকে ইংলণ্ডেরই একটা অংশ হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন। তখন কোনো গোরা বা আধা গোরা এসব রাজা-মহারাজাদের কালো হাবশীর চেয়ে বেশি কিছু মনে করত না।

দেশীয় রাজ্যের সিংহাসনে ছোট ভাই বসলেন, কিন্তু তার কিছুদিন পরেই শুরু হলো ঘূর্ণিঝড়, ফলে তাঁকেও পেন্সন নিয়ে সরে দাঁড়াতে হলো। তাঁর কয়েক

ভজন ভাই-বোন সবাই পেন্সন পেলেন। কুমার ভুরঞ্জয়েরও হাত খালি রইল না, বরং পৃথিবীতে তাঁর প্রথম আগমনহেতু সরকারের কাছে তিনিই প্রাধান্য পেলেন বেশি। জায়গির তখনও হাত থেকে চলে যায়নি। যদিও কৃষকদের সন্তুষ্ট করার জন্যে জমিদারী উচ্ছেদের মতো দেশীয় রাজ্যের জায়গিরগুলিকেও উচ্ছেদ না করে উপায় ছিল না নতুন প্রভুদের, তবু সেটা কার্যত মনসা-বাচা-কর্মণা অহিংস নীতি অনুসরণ করেই। বছরের পর বছর ধরে তাঁদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চলেছে, আরও দাম বাড়াবার দাবিতে জায়গিরদারেরা বার বার ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন, আবার তাঁদের আপোস আলোচনায় রাজি করানো হয়েছে—নতুন মহাপ্রভুদের সমাজতন্ত্রের পথ বুঝি এই রকমই। সরকার কুমার ভুরঞ্জয়ের জায়গির এখনও কেড়ে নেয়নি ঠিকই, কিন্তু সরকার ঢিলেমি দেখায় তো কৃষকদের বিটলেমি বাড়ে। জায়গিরে এখন আর কোনো প্রভাব প্রতিপত্তি নেই কুমারের। সশস্ত্র পাইক বরকন্দাজ সঙ্গে নিয়ে জমকালো পোশাক পরে জায়গিরে গিয়ে কৃষকদের ওপর রোয়াব দেখানো তো দূরের কথা, বরং তাদের হাসি-ঠাট্টার পাত্র হতে হয় তাঁকে। বন্দুক-কার্তুজ সঙ্গে থাকা সত্ত্বেও তাদের মুখ বন্ধ করা সম্ভব হয় না, দাঁতে দাঁত ঘষেই তাঁকে চুপ করে থাকতে হয়। রাজ্য আর জায়গিরের এ রকম দুরবস্থা দেখে কুমার সাহেবের মনে হয়েছে সময় কাটানোর জন্যে মধুপুরীই ভালো। মাকড়শা বিছে-কাঁকড়ার মতো ছড়িয়ে থাকে পাহাড়। একটা থেকে আর একটা আঁকা-বাঁকা শাখা বেরিয়ে যায়। আর আপাতদৃষ্টে শ'খানেক গজ দূরত্বের কোনো একটা জায়গায় পৌঁছতে মাইলের পর মাইল ঘুরপাক খেতে হয়। সওয়া শ'বছর আগে ইংরেজরা বসবাসের জন্য যখন মধুপুরীকে বেছে নিয়েছিল, তখন তারা তার ঠাণ্ডা আবহাওয়ার জন্যেই আকৃষ্ট হয়েছিল। ছ-সাত হাজার ফুট উঁচু মধুপুরীর আবহাওয়া তো ঠাণ্ডা বটেই, সেই সঙ্গে তখন সেখানে ছিল ঘন জঙ্গলও, যার ফলে তার সৌন্দর্য হয়ে উঠেছিল দ্বিগুণ। জঙ্গল সাফ হয়ে গিয়ে যখন সেখানে শহর গড়ে উঠল, তখন সেখান থেকে অনাদিকালের হিমাচ্ছাদিত পর্বতশৃঙ্গগুলি চোখে পড়ত। প্রায়শ এ রকম জায়গাতেই ইংরেজদের বাংলো তৈরি করার ঝোঁক ছিল, যাতে সেখান থেকে হিমালয় পর্বতমালা বেশি বেশি করে চোখে পড়ে। কিন্তু সাধারণত যা-ঘটে, যারা আগে এলো তারাই বাজি মাত করল, পরে যারা এলো, এদের অদৃষ্টে যা জুটল তাতেই খুশি হতে হলো। ইংরেজরা বাজার-হাট থেকে বেশ একটু দূরে থাকাটাই পছন্দ করত। সে-সব জায়গায় প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের যেমন অভাব নেই, তেমনি কালা আদমীদের ছায়াও মাড়াতে হয় খুব কম। নির্জনতা খুঁজতে গিয়ে কত ইংরেজ তো এমন এমন জায়গায় বাংলো তৈরি করেছে যে সেখান থেকে পর্বতমালা চোখেই পড়ে না। আর এক শ্রেণীর বাংলো আছে, যেখান থেকে হিমালয় চোখে না পড়লেও অন্তত মাইল বিশেক দূরেই নিচের সমভূমি নজরে আসে। তৃতীয় শ্রেণীর বাংলোগুলো এই

উভয় বৈশিষ্ট্য থেকেই বঞ্চিত, সবুজ গাছগাছালিতে ঢাকা ছুটো পাহাড়ের মাঝখানে পড়ে গেছে তারা। এই রকমই একটা বাংলো কুমার তুরঞ্জয়ের কপালে জুটেছে। মধুপুরীতে বাংলো তৈরি শুরু হয় যদিও সওয়া শ'বছর আগেই, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পর্যাপ্ত বাংলো তৈরি হতে থাকে এক শতাব্দী আগে, তারপর অর্ধ শতাব্দী ধরে নতুন নতুন বাংলো তৈরির হিড়িক চলে। অবশেষে সে-উদ্দীপনাও থেমে যায় এক সময়, তখন প্রথম মহাযুদ্ধ। মহাযুদ্ধের পরেই এই রমণীয় নগরীতে লক্ষ্মীর আসন টলে। বহু ইংরেজ নিজেদের বাংলো বিক্রি করতে শুরু করে, আর ভারতীয়রা, বিশেষ করে রাজা মহারাজা এবং কিছু কিছু শেঠ মহাজন সেই সব বাংলো কিনতে শুরু করেন। কুমার তুরঞ্জয় বাংলোটা পেয়েছিলেন ঠিক এই সময়। মহারাজ পিতা নিজের সুপুত্রকে সেটি কিনে দিয়েছিলেন না কুমার নিজেই কিনেছিলেন আজ সেটা বলা সম্ভব নয়। অন্তঃপুরে জন্ম হওয়ার ফলে এমনিতেই তো তিনি বুদ্ধিতে খাটো, তার ওপর সমস্ত কাজই তিনি মোসাহেবদের দিয়ে করাতেন, সুতরাং কেনা কাটার বুদ্ধিতে যদি তিনি আরও খাটো হন, তাতে আশ্চর্য কি। হিমশৈলশিখরই বলুন আর সমতল উপত্যকার দৃশ্যরাজিই বলুন, এই বাংলো থেকে কোনো কিছুই উপভোগ করার সুযোগ নেই। এই বাংলোয় এসে অবধি সেজন্য তাঁর ভীষণ আফসোস, বিশেষত কখনো কখনো শীতকাল শুরু হওয়া পর্যন্ত যখন তাঁকে থাকতে হয় এখানে। প্রায় সারাদিন এতটুকু রোদ্দুর পাওয়া যায় না, বেশ কষ্ট হয় এখানকার ঠাণ্ডায়। কিন্তু কি আর করবেন, এখন যে তাঁর গলায় পিণ্ডি আটকানো অবস্থা। //

তিন

কুমার-পত্নীর তো বাংলোর দোষ-গুণ বিচার করার ফুরসৎ ছিল না। তিনি ছিলেন এক দেশীয় রাজ্যের রাজকন্যা আর কুমার হলেন পিতার উপেক্ষিত কয়েক ডজন পুত্রের একজন। কুমার-পত্নীর নিজের কিছু টাকা-পয়সা ছিল। বাপের বাড়ি থেকেও কিছু পেতেন। তাছাড়া নিজে একজন রাজ-দুহিতা বলে একটা গর্ববোধও ছিল তাঁর। তাই স্বামীকে খুব একটা ভয়-ডর করে চলতেন না। অন্য দিকে কুমারও ওসব ভ্রূক্ষেপ করতেন না, সম্মানার্হ পুরুষোত্তম পিতৃদেবের পদাঙ্ক অনুসরণ করার ইচ্ছে ছিল তাঁর, কিন্তু বলতে গেলে বাধা ছিল একটাই, হাতে টাকা-পয়সার বড় টান, তাই অনেক উঁচুতে লক্ষ্য স্থির করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। বিশ্ব-সংসারের দিকে চোখ মেলে তাকানোর সামর্থ্য ছিল না কুমার-পত্নীর, কারণ সকালে তাঁর প্রাতরাশের টেবিলেই মদের বোতল আর গেলাস এসে হাজির হতো, তারপর গেলাসে নিরবচ্ছিন্ন চুমুক দেওয়াটা শেষ হতো রাতে ঘুমোবার সময়। চব্বিশ ঘণ্টা নেশায় বুঁদ হয়ে থাকতেন তিনি। মদের গেলাসে

নিজের দুঃখের বোঝা লাঘব করতে করতে বেচারী কুমার-পত্নী একদিন পরলোকে পাড়ি দিলেন। ততদিনে যে দেশীয় রাজ্যের দফা-রফা হয়ে গেছে, সেকথা কানে শুনেও বিশ্বাস করতে চাইতেন না তিনি।

স্ত্রীর মৃত্যুতে কুমারের দুশ্চিন্তার কিছু ছিল না। সারা ভারতের রাজা রাজোয়াড়দের ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি তাঁর শ্বশুরবাড়িরও পালা পড়েছিল, তাই সেদিক থেকে কিছু আশা করা সম্ভব ছিল না। নিজের যা আয়, তা খাটো চাদর গায়ে দেওয়ার অবস্থা, মাথা ঢাকে তো পা ঢাকে না, পা ঢাকে তো মাথা খালি হয়ে যায়। আয়ের পথ দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে, সম্পত্তি বিক্রি করে করে বেশি দিন কাটানো সম্ভব নয়, এইসব ভেবে ভেবে তিনি আরও মন-মরা হয়ে পড়েন। তাঁর শালা রাজাসাহেব আগে যখন আসতেন, তখন এমন হাসি-ঠাট্টা পান ভোজনের আয়োজন হতো যে দেখে মনে হতো, তাঁদের জগতে দুঃখের ঠাঁই নেই কোথাও। তিনি এখন নিজেই দুরবস্থায় পড়ে নাকানি-চোবানি খাচ্ছেন, খরচ চালাবার জন্যে সম্পত্তি বিক্রি করা ছাড়া উপায় নেই তাঁর। শালা প্রথমে নিজের বাংলোটা বিক্রির ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্যে ভগ্নিপতিকে খুব দৌড়-ঝাঁপ করিয়ে ছেড়েছিলেন। তখন বাংলোর বেশ ভালো দামও পাওয়া যাচ্ছিল, কিন্তু মোসাহেবদের পরামর্শ ছাড়া রাজাদের পক্ষে তো সম্পত্তি বিক্রি করা সম্ভব নয়। খদ্দেরকে এ রকম সম্পত্তি কিনতে হলে মোসাহেবদের পায়ে তেল দিতে হয়। এই-সব গোলমালের জন্যেই রাজা সাহেবের বাংলোটা বিক্রি হলো না। কয়েক বছর পরে যখন দেখা গেলো, মধুপুরীতে বাংলো আর বাড়ির দাম আগের দামের অর্ধেকে এসে দাঁড়িয়েছে, তখন তিনি ও তাঁর মোসাহেবরা ভীষণ হতাশ হয়ে পড়লেন।

কুমার দুরঞ্জয় 'যোগ্য পিতার যোগ্য পুত্র'; তফাৎ শুধু পরিমাণের দিক দিয়ে। পিতা যেখানে শত শত ভালো জাতের কুকুর পুষতেন, সেখানে পুত্র সে রকম দু-চারটেও পুষবেন না, সেটা কি হয়? তাঁর বিলিতী জাতের উৎকৃষ্ট সবচেয়ে বড় আকারের কুকুর গ্রেট ডেন রয়েছে এক জোড়া, আর এক জোড়া থেঁকী ভুটিয়া কুকুর। খুব লম্বা আর উঁচু হওয়া সত্ত্বেও গ্রেট ডেন দুটোকে তেমন ভয়ঙ্কর দেখায় না। ওরা বেশ বুদ্ধিমান। জানে যে মানুষ তাদের শিকারের পাত্র নয়। অপরিচিত ব্যক্তিদের দেখে ওরা কখনও ঘেউ-ঘেউ করে না। কিন্তু ভুটিয়া জোড়ার কথাই আলাদা। গায়ে বড় বড় লোম থাকার জন্যে ওদের গ্রেট ডেনের চেয়েও বেশি মোটা-তাজা দেখায়। হয়ত গায়ের জোরেও গ্রেট ডেনরা ওদের সঙ্গে পেরে উঠবে না। বাইরের লোকজনের কাছে তো ওরা যম। ওদের দেখে কিংবা দূর থেকে ওদের ভয়ঙ্কর আওয়াজ শুনে মানুষের অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে। কুমার সাহেবের বাংলো নির্জন জায়গায় একটি ছোট রাস্তার ধারে। ঐ রাস্তা দিয়ে লোকজনের যাতায়াত করার খুব একটা দরকার হয় না। কিন্তু যখনই কেউ ওদিক দিয়ে যায়, সে-ই প্রথমে দেখে নেয় ভুটিয়া কুকুর জোড়া ভালো করে বাঁধা

আছে কি-না। কুমার অতো বোকা ছিলেন না যে কালান্তক দুটোকে ছেড়ে রাখবেন; কারণ ছাড়া পেলে ওরা লোকজনকে কামড়াবেই।

পিতার রাজধানীতে এবং নিজের জায়গিরে এখনও কুমারের বাড়িঘর রয়েছে। মধুপুরীতে সীজন কাটিয়ে সেখানে যাওয়াটা এখনও বন্ধ হয়নি তাঁর, বিশেষ করে রাজধানীর প্রাসাদে শীতকালটা কাটান তিনি। কেবল এই দু'জোড়া কুকুরই নেই তাঁর, আরও কুকুর রয়েছে, ঘোড়া, পাখি, হরিণও রয়েছে বাড়িতে। তিন জায়গাতেই চাকর-বাকর আছে—বেশ ব্যয়-বহুল ব্যাপার। বাইরে থেকে কুমারের চাল-চলন খাটো চাদরের মতো নয়। নিমন্ত্রণ-পান-ভোজনে তেমনি দরাজ। মধু-পুরীতে কোনো জলসা বা ফাংশন হলে তিনি অবশ্যই নিমন্ত্রিত হন, আর সেখানে গিয়ে নিজের দরাজ হাতের কথা ভুলে যান না তিনি। ভালো ভালো মদের ওপর তাঁর খরচ-পত্তর খুব কম নয়, তার ওপর ছেলেমেয়েদের ভালো বেশ-ভূষায় না রাখলে চলে না। ইংরেজরা চলে গেলেও ভারতে ইংরেজির রাজত্বটা থেকে গেছে, সেজন্যে কুমার তাঁর ছেলেদের মধুপুরীর একটা ভালো ইংরেজি স্কুলে পড়ান। মেয়েরা ছোট, তারা এখন কনভেন্টে। ক্রমশ টাকা-পয়সার এমন অনটন দেখা দিয়েছে যে, স্কুলের ফী-ও যথাসময়ে দেওয়া হয় না—তার চেয়ে বরং বলা উচিত, এমন সব ব্যাপারে তাঁকে টাকা-পয়সা খরচ করতে হয়, যা না করে উপায় থাকে না। পান-ভোজনেও কুমারকে যথেষ্ট খরচ করতে হয়, কারণ একে তো সমস্ত জিনিসপত্রেরই চড়া দাম, অন্য দিকে অতিথি-অভ্যাগতের যাতায়াত কম নয়। নিজের আর নিজের নতুন নতুন প্রেয়সীদের জন্য কাপড়-চোপড় গয়না-পাতিও দরকার হয়। সবই বাকিতে আসে। দোকানদারের সাহস নেই যে ধার দেওয়া বন্ধ করে দেবে, কারণ ধারের বেশ কিছু টাকা বছরে শোধ হয়। এভাবেই কুমারের ধার নেওয়া আর ধার শোধ চলতে থাকে। অনেক দোকানদার তো বুঝতেই পারে না যে ধারের টাকা তামাদি হয়ে গেছে।//

লাদুরাম তার পছন্দসই দামেই কুমারকে জিনিসপত্র দিয়ে থাকে। কখনো কখনো নগদ টাকাও ধার দিয়ে দেয়, কারণ কুমার তাঁর মনের মতো সুদ দিতে কার্পণ্য করেন না। লাদুরাম বেচারী পনেরো-বিশ হাজারের আসামী—অর্থাৎ তার মূলধন চার-পাঁচ হাজার টাকার। কুমারের কাছেই তার চার-পাঁচ হাজার টাকা বাকি পড়ে গেছে। তাগাদা দিতে যাওয়ার ফল হলো, কুমার তার দোকান থেকে জিনিসপত্র কেনাই ছেড়ে দিলেন। তিনি লাদুরামেরই এক পড়শী দোকানদারের কাছ থেকে প্রথমে কিছুদিন নগদে, তারপর বাকিতে কেনা-কাটা শুরু করলেন। মানুষের কাছে অনুরোধ-উপরোধে কোনো ফল নেই দেখে লাদুরাম একদিন নিজেই কুমারের বাংলোয় গিয়ে হাজির হলো। দূর থেকে উঁকি মেরে ভালো করে দেখে নিলো, ভুটিয়া কুকুর জোড়া বাংলোর সামনে বাঁধা আছে কি-না। মনের মধ্যে তখনও ভয় রয়েছে, কিন্তু তার জানাশোনা পুরনো চাকরটা অভয় দিলো যে কুকুর দুটো

বাংলোর পেছন দিকে বাঁধা আছে। লাতুরামের ধড়ে প্রাণ এলো। বড়লোকদের চড়া দামে এমনি এমনি মালপত্র বেচা যায় না, সেজন্যে চাকর-বাকরকে খুশি রাখতে হয়, দু-চার পয়সা দিতে হয় তাদের, অতএব কুমার সাহেবের ভৃত্য যদি লাতুরামের সঙ্গে সহৃদয় ব্যবহার করতে রাজি হয়, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। লাতুরামের কথায় একজন ভৃত্য কুমার সাহেবের কাছে গিয়ে নিবেদন করল, 'হুজুর, একটা লোক এসেছে।'

কুমার সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, 'কে ? বাংলোর খদ্দের ?'

'না হুজুর, লাতুরাম বেনে। টাকার জন্যে এসেছে।'

লাতুরামের নাম শুনেই কুমার সাহেব ভুরু কোঁচকালেন। একজন চাকরকে হাঁক দিয়ে বললেন, 'খিয়ালী, ভুটিয়া দুটোকে ছেড়ে দে তো।'

কুমার বেশ উঁচু গলাতেই কথাটা বলেছিলেন, অতোটা জোরে বলার দরকারও ছিল না, কারণ লাতুরাম কুমারের ঘরের কাছেপিঠেই ছিল। ভুটিয়ার নাম শুনতেই লাতুরামের প্রাণ উড়ে গেলো। তৎক্ষণাৎ সে পেছন ফিরে ভুঁড়ি দোলাতে দোলাতে বাইরে এক লাফ দিলো। বাড়ির বাইরে থেকেই শুরু হয়েছে কয়েক গজের চড়াই, লাতুরামের গায়ে এত জোর এলো কি করে কে জানে, এক দৌড়ে সে চড়াইটা উঠে গেলো, তারপর বাংলোটা যতক্ষণ চোখের আড়াল না হলো ততক্ষণ হনহন করে সড়ক ধরে হেঁটে চলল। নিজের নির্বুদ্ধিতায় নিজের ওপরেই রাগ হলো তার। উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করতে গিয়ে তার মালুম হলো যে নালিশ করার সময় পেরিয়ে গেছে। ব্যাপারটা এই রকমই, কারোর চোটপাটের ভয়ে কুমার ধার দেনা শোধ করে দিতে রাজি নন। বড় জোর তিনি এইটুকু অনুগ্রহ করতে পারেন যে পরে আর তিনি বাকিতে জিনিসপত্র নেবেন না। কেউ যদি মামলা-মোকদ্দমা করতে চায়, করে বেড়াক। কুমারের ওপর সমন জারি হওয়া সম্ভব নয়। সেদিন বাড়ি ফিরে লাতুরামের ১০৩° জ্বর এলো।

চার

এখন মধুপুরীতে কুমার দুরঞ্জয়কে ধার দেওয়ার মতো কেউ নেই। সবাই জানে যে তাঁকে ধার দেওয়া মানে টাকা জলে ফেলে দেওয়া। মধুপুরীতে থাকলে কুমারের খরচটাও বেড়ে যায়। ইদানীং খরচ কমানোর কথা ভাবছেন তিনি। জায়গিরের ঘরবাড়ি তো একরকম ছেড়েই দিয়েছেন, বেশির ভাগ সময়টা কাটান রাজধানীর বাড়িতে। তিনি জানেন যে ঘামে নেয়ে ভিজে 'লু' আর ভেপসা গরমে দিন কাটানো খুব কঠিন, কিন্তু মধুপুরীতে থাকার খরচপত্রের টাকা আসবে কোত্থেকে ? মধুপুরী কেন, রাজধানীর বাড়িতে বাস করার খরচ যোগানোই মুশকিল তাঁর পক্ষে। কত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করে ফেলেছেন, এখন মধুপুরীতে তাঁর নিজের

থাকার বাংলোটাও বিক্রি করার জন্যে তৈরি। কিন্তু সেটা জলের দরে নেবারও লোক নেই। বছর তিনেক আগে ভালো দাম পাওয়া যাচ্ছিল, কিন্তু তাঁরও দশা হয়েছে তাঁর শালার মতো, মোসাহেবদের পাল্লায় পড়ে তখন বিক্রি করেননি। মোসাহেবদের মধ্যে ভালো মন্দ দুই-ই আছে। ভালো হওয়াটা যখন লাভের ব্যাপার, তখন ভালো হলে দোষ কি? কুমার যদি কপনিধারী হয়ে পড়েন, তাহলে তাদের আমল দেবে কে, দু'বেলা দু'মুঠো অন্নই বা জুটবে কেত্থেকে? দেশীয় রাজাদের রাজত্বি খতম হতেই সব জায়গাতেই ইয়ার-দোস্ত-মোসাহেব মেয়েমানুষদের দিনকাল শেষ হয়ে যাচ্ছে, একে একে জবাব দিয়ে দেওয়া হচ্ছে তাদের। যা ছিল হীরের টুকরো, এখন তা কানা-কড়ি।

কুমার এখন টাকাকড়ির ব্যাপারে খুব চিন্তিত। চিন্তার কারণ আরও বেশি, কারণ, সব সম্পত্তি যদি বিক্রি-টিক্রি করে খেয়ে ফেলেন, তাহলে পরে চলবে কি করে? তাঁর বয়েস তো এখন পঞ্চাশও হয়নি। ছেলেপিলের চিন্তা না-ই বা করলেন, কিন্তু নিজের জন্যে ভাবনাটা তো রয়েছে। একদিন তাঁর কৃতজ্ঞ মোসাহেব পরামর্শ দিলো, মধুপুরীর বাড়িটা অমুক মহারাজকুমারের ফার্মের সঙ্গে বদল করে ফেলুন। দুরঞ্জয় শীতকালে তখন রাজধানীতে নিজের বাড়িতে ছিলেন। আর ঠিক সেই সময় তাঁর দূর সম্পর্কের জ্ঞাতি অন্য এক মহারাজকুমারও শহরে এসেছিলেন। রাজত্বি চলে যাওয়ার সময় মহারাজকুমার বেশ লুটপাট চালিয়ে ছিলেন, দু'হাজার একরের ফার্মও তৈরি করে নিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, বংশানুক্রমে চাষবাস করত যে-সব কৃষকেরা, তাদের কাছ থেকেই সে-সব জমি কেড়ে নিয়ে ফার্ম তৈরি করা হয়েছিল। কংগ্রেস-সরকারের ন্যায়-অন্যায় দেখার ফুরসৎ নেই, সর্বত্র এই রকমই চলছে। পুরনো সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের বংশমর্যাদা যাতে ক্ষুণ্ণ না হয়, সেটাও চান তাঁরা। মহারাজকুমার যখন নিজের ফার্ম তৈরি করেন, তখন তাঁর কাছে প্রচুর টাকা। দু'খানা ট্রাক্টর আনিয়ে নিলেন, নিজের থাকার জন্যে একটা বাংলোও তৈরি করে ফেললেন। তখন কি উৎসাহ, খাকী জামা-প্যান্ট পরে মাথায় হ্যাট লাগিয়ে নিজেই ট্রাক্টর চালান। গাড়ি চালানোটা তো রপ্ত ছিল ভালোই, ট্রাক্টর চালানো এমন কি কঠিন! আমেরিকা, ইংলণ্ড থেকে প্রকাশিত ফার্মের বিষয়ে লেখা বহু বইপত্র পড়ে ফেললেন তিনি। প্রচুর দাম দিয়ে বীজ-সার আনালেন, কোনো এক মোসাহেবের পরামর্শে সেই মোসাহেবেরই এক আত্মীয়কে কৃষি-বিশেষজ্ঞ হিসেবে নিযুক্ত করলেন। দু-তিন বছর ফার্মের কাজ চলল এইভাবেই। কত টাকা আসছে আর তা কিভাবে খরচ হচ্ছে, সেটা দেখা মহারাজকুমার নিজের পদমর্যাদার পক্ষে অসমীচীন বলে মনে করতেন। ট্রাক্টর প্রায়ই খারাপ হতে থাকে। প্রায়ই কোনো-না-কোনো যন্ত্রপাতি নষ্ট হয়ে যায়, ভেঙে যায়। মহারাজকুমার গাড়ি চালাতে জানেন, তাই ট্রাক্টর চালান বেশ ভালোই, কিন্তু মেরামতি আর যন্ত্রপাতি বদলানো তাঁর সাধ্যের বাইরে। তৃতীয় বছর কাটতে না-কাটতেই

কার্মের হাল দেখে তাঁর উৎসাহে ভাটা পড়ল। চতুর্থ বছরে তো রীতিমতো সঙ্কট দেখা দিলো। যা আয় হয়, খরচ হয়ে যায় তার চেয়ে বেশি, সেটা পূরণ করতে ধার দেনা করতে হয়, না-হয় কোনো কিছু বিক্রি করতে হয়। ফার্মটাকে নিয়ে এখন গলায় পিণ্ডি আটকানোর মতো অবস্থা। ট্রাক্টর নিয়ে চাষাবাদ করে জীবন কাটানো তাঁর কাছে বড় কঠিন বলে মনে হতে লাগল।

ফার্ম নিয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকলেও মহারাজকুমার তাঁর স্ত্রী আর সাঙ্গপাঙ্গদের নিয়ে গ্রীষ্ম কাটাতে মধুপুরী চলে যান, কিংবা অন্য কোনো শৈলাবাসে। সেখানে তাঁর নিজের কোনো বাংলো নেই, বাবার যেটা ছিল, সেটা বড়দা দখল করেছেন। কানা আর খোঁড়ার গল্প যে রকম—মহারাজকুমার ফার্মের পিণ্ডি থেকে রেহাই পেতে চান, মধুপুরীর মতো জায়গায় একটা বাংলো কিনতে চান, আর কুমার তুরঙ্গয় তাঁর বাংলোটা বিক্রি করতে চান। প্রথমে কুমার তুরঙ্গয়ের ইচ্ছে ছিল বাংলোটাকে নগদ টাকায় বিক্রি করার, কিন্তু তাঁর প্রভুভক্ত মোসাহেবরা বোঝালো যে ফার্মের সঙ্গে ওটাকে বদল করে নিলেই ভালো হয়। বাংলো কেনার মতো খদ্দেরও নেই, ওদিকে ফার্ম একটা আয়ের উৎস। গাড়ি-জীপ চালানোতে নিজের পারদর্শিতায় কুমারের বেশ খানিকটা গর্ব রয়েছে। তিনি মনে মনে উল্লসিত হয়ে উঠলেন—বেশ তো, খাকী জামা-প্যান্ট পরে দিব্যি আমেরিকান হয়ে যাবো। কুমারের মোসাহেবরা মহারাজকুমারের সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করল। মহারাজকুমার জিজ্ঞেস করলেন, 'বাড়িটা কেমন? মধুপুরীর কোথায়?'

কুমারের মোসাহেবরা সসম্ভ্রমে জানালো, 'হুজুর, মধুপুরীর যে-এলাকায় শুধু সাহেবরা থাকেন, সেই এলাকায় বাড়িটা। বাথরুম, ড্রইং রুম আছে, ডাইনিং হলও আছে। সেই সঙ্গে বাইরের দিকে চার কামরার একটা ছোট বাংলোও রয়েছে, প্রাইভেট সেক্রেটারী কিংবা অতিথি-অভ্যাগতদের জন্যে। চারপাশে সবুজ গাছ-গাছালি। বড় সুন্দর জায়গা।'

'ওখানে গাড়ি যায় তো?'

'বাংলোর একেবারে ভেতরে জীপ চলে যায় হুজুর। রাস্তা একটু ঠিক-ঠাক করে নিলে গাড়িও নিয়ে যাওয়া যাবে।'

বলা বাহুল্য, কুমার আর মহারাজকুমার উভয়েরই মোসাহেবরা নিজেদের মধ্যে আগেই সলা-পরামর্শ করে নিয়েছে, কেনা-বেচায় কে কত পাবে, সে-হিসেবও পাকা। কুমার তুরঙ্গয়ের পিতৃদেবও মহারাজা ছিলেন, সেজন্য তাঁকেও মহারাজ-কুমার বলা উচিত, কিন্তু এখানে আমরা সংক্ষেপে তাঁকে শুধু কুমার বলে উল্লেখ করছি। মহারাজকুমারের মোসাহেবরা মাঝখানে বলে উঠল, 'হুজুর, শুধু জীপ গেলেই যথেষ্ট। ওখানকার বাংলোগুলো তো আপনি দেখেছেন, যেমন আরাম, তেমনি নিরিবিলি। বেছে বেছে ভালো ভালো জায়গাতেই বাড়িগুলো তৈরি করা হয়েছে। তারপর জীপ গেলে সেটা তো উপরি পাওনা।'

মহারাজকুমার ভেবে-চিন্তে দু'দিন বাদে তাঁর মতামত জানাবেন বললেন। ভেবে আর দেখবেন কি, তিনি তো জানেনই, কুমার দুরঞ্জয় যে ফার্মের আশা করছেন, সেটা একটা আপদ। মধুপুরীতে অত বড় একটা বাংলো এমন একটা জিনিসের বিনিময়ে পাওয়া যাচ্ছে, যা মহারাজকুমার এমনিতেই যে কোনো দামে দিয়ে দিতে রাজি। বাংলোটা কিনতে তাঁর আগ্রহ তো হবেই। সেই শীতকালেই তিনি মোসাহেবদের মধুপুরী পাঠালেন বাড়ি দেখে আসতে, তারা ফিরে এসে প্রশংসার পাল্লাটা ভারি রেখেও সাফ জানিয়ে দিলো যে গাড়ি সেখানে কিছুতেই ঢুকবে না। তবে, এই অসুবিধেটুকু ছাড়া মোসাহেবরা বাড়ি সম্পর্কে আর যা সব বলল, তাতে মহারাজকুমারের জিভ দিয়ে নাল ঝরার উপক্রম। ওদিকে কুমারও ফার্ম দেখে এলেন। মনে মনে বলতে লাগলেন, 'মহারাজকুমার নিজের অপরিণামদর্শিতার জন্যে এমন হীরের টুকরো হাতছাড়া করছেন।'

সেই শীতকালেই মধুপুরীর বাড়ির সঙ্গে ফার্মের বিনিময়ের কথা পাকা হয়ে গেলো, শুধু তাই নয়, এমন কি লেখাপড়াও হয়ে গেলো। কুমার দুরঞ্জয় এখন ফার্মের মালিক। বাড়ি থেকে সত্তর মাইল দূরের ফার্মে তাঁর গাড়ি ছোটাছুটি শুরু করল। তিনি ভবিষ্যতের প্রোগ্রাম তৈরি করতে লেগে গেলেন মোসাহেবদের সঙ্গে। প্রথমত তাঁর উল্লসিত হওয়ার যথেষ্ট কারণ যে, ভাঙা-চোরা বাড়িটার যা হোক একটা সদগতি হলো, তার বদলে হাতে পেলেন হীরের টুকরো, উল্লাসের আর একটি কারণ, মধুপুরীতে পাওনাদারদের তাগাদায় এখন থেকে তাঁকে আর অস্থির হতে হবে না। ফার্মের সঙ্গে পাওনাদারদের কাছে কর্জ বাবদ কুড়ি হাজার টাকা জুড়লে বাংলোর দাম নিতান্ত কম দাঁড়ায় না, ব্যাপারটা নিয়ে তিনি যতই ভাবেন, ততই তাঁর আনন্দের সীমা-পরিসীমা থাকে না।

মহারাজকুমারের আগেই তাঁর দু-একজন লোক এসে মধুপুরীর নতুন বাংলো মেরামত করতে লেগে গেলো। এমনিতে হয়ত তিনি আরও দু-চার সপ্তাহ পরে মধুপুরী আসতেন, কিন্তু নতুন বাড়িটা দেখার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছিলেন তিনি, তাই তাড়াতাড়ি এসে পৌঁছলেন। ইংরেজ আমলে মধুপুরীতে গাড়ির স্ট্যাণ্ডেই গাড়ি দাঁড় করাতে হতো, গাড়ি যাতায়াত করার উপযোগী রাস্তাগুলো দিয়ে কেবল লাটসাহেব আর দু-চারজন বড় বড় অফিসারদের গাড়িকেই যাতায়াত করতে দেওয়া হতো। ইংরেজ-রাজত্ব চলে যাওয়াতে একটু সুবিধে হয়েছে। কিন্তু টাকা-পয়সা ছাড়লে যে-কেউ এখন ঐ সব রাস্তা দিয়ে গাড়ি নিয়ে যেতে পারে। বাংলো পর্যন্ত গাড়ি যাবে না, মহারাজকুমার সেটা জানতেন, তাই তিনি জীপ নিয়ে এসেছিলেন। পারমিট যোগাড় করে বাংলোর দিকে রওনা দিলেন তিনি, কিন্তু বাংলো থেকে আধ মাইল দূরেই তাঁকে জীপ থামাতে হলো। লোকেরা জানালো যে সামনে জীপ নিয়ে যাওয়ার রাস্তা নেই। মহারাজকুমারের মেজাজ খারাপ হয়ে গেলো, কিন্তু যখন জানা গেলো যে রাস্তা এক-আধটু মেরামত করে নিলে জীপ

নিয়ে যাওয়া অসুবিধে হবে না, তখন টেম্পারেচার একটু কমলো। অগত্যা জীপ থেকে নেমে পায়ে হেঁটেই রওনা দিলেন। চাকর-বাকরেরা ইতিমধ্যে বাংলোটাকে বাসোপযোগী করে তুলেছে, তাই ও-ব্যাপারে তাঁর মনঃক্ষুণ্ণ হওয়ার বিশেষ কোনো কারণ ছিল না। অবশ্য বাংলোর সবকিছুই পুরনো, ফার্নিচারের সংখ্যাও কম, কিন্তু তাঁর ফার্মের দশাও তো ঠিক এই রকমই। জঙ্গলের ভেতরে দম-আটকে-যাওয়া পরিবেশে নির্জন বাংলোটায় দু-চার দিন কাটানোর পরেই স্ত্রী আর ছেলেপিলেদের বিতৃষ্ণা ধরে গেলো। তারা বিরক্তি প্রকাশ করতে লাগল। মহারাজকুমারেরও মন ভেঙে গিয়েছিল। বাংলোয় জীপটাকে আনা যাচ্ছে না, এটাই তাঁর ক্ষোভের সবচেয়ে বড় কারণ। মধুপুরীর বাড়ির সঙ্গে তাঁর উচ্ছন্নে যাওয়া ফার্মটাকে বদল করার পর তিনি কখনও ভাবতেন না যে তাঁর ফার্মটা ছিল একেবারে ফুলে ফুলে সুশোভিত, বরং মনে মনে বলতেন, 'আচ্ছা গাধা বানিয়েছি দুরঞ্জয়কে।' কিন্তু এখন এই জীর্ণ-দশার বাড়িটা আর তার আশপাশের জায়গা দেখে তাঁর মনে হচ্ছে, দুরঞ্জয়ই বাজিমাত করেছে।

মহারাজকুমার এখন ভাবছেন, এখানকার এই বাড়িটা বিক্রি করে দিয়ে অন্য কোথাও বাড়ি কিনে নেবেন। তিনি নিজেই মধুপুরীর কয়েক জায়গায় ঘোরা-ফেরা করে জানতে পারলেন, বিশ-পঁচিশ হাজারেই এর চেয়ে অনেক ভালো বাড়ি পাওয়া যেতে পারে। এমন কি, সে-সব বাড়িতে গাড়ি নিয়ে যাওয়ার রাস্তাও আছে। বাড়িটা বিক্রি করে দেওয়ার জন্যে তিনি এজেন্টদের ভালো রকম কমিশনের লোভ দেখালেন। কিন্তু মধুপুরীর লোকজনেরা কেউ ভাবতেই পারে না যে ও বাড়ি জলের দরেও কেউ নিতে চাইবে। ফার্নিচার থেকে পাঁচশো-হাজার আসতে পারে। দরজা-জানালা খসিয়ে বিক্রি করলে তা থেকেও আসতে পারে কিছু, কিন্তু দরজা জানালা খসানোর জন্যে যে কুলি-মজুর লাগাতে হবে, তাদের মজুরির টাকা ওগুলো থেকে উঠবে কি-না সন্দেহ।

হিমালয়ের মতো পর্বতে অবস্থিত আধুনিক শৈলাবাসগুলিতেও তীর্থক্ষেত্রের কিছু কিছু লক্ষণ চোখে পড়ে। তীর্থক্ষেত্রে যেমন পাণ্ডারা দূর-দূরান্তর থেকে আসা যজমানদের অভ্যর্থনা করার জন্যে তৈরি থাকে, ঠিক সেই রকম এই সব শৈলাবাসেও বাস-ট্যাক্সির স্ট্যাণ্ডেই হোটেলের পাণ্ডারা এসে হাজির হয়, বোঁচকা-বুঁচকি বওয়া কুলিদের কেড়ে নেওয়ার জন্যে ঝাপটা-ঝাপটি শুরু করে দেয়।

গত অর্ধ শতাব্দীতে ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থা কোথা থেকে কোথায় গেছে, এখানেই তার সন্ধান মেলে। এই শতাব্দীর শুরুতে হ্যাট-ধারী কালো কিংবা সাদা লোককে সাহেব বলা হতো, বাকি সব ভদ্রলোককে সম্বোধন করা হতো 'বাবু' বলে। তখনও শেঠ মুখ্যভূমিকায় আসেনি। কিন্তু আজ আপনি মধুপুরীর মতো আধুনিক শৈলাবাসগুলিতেই যান, আর বদরীনাথ-কেদারনাথের মতো মহাতীর্থেই যান, সবাই আপনাকে শেঠ বলে ডাকবে, তাতে আপনার আশ্চর্য হওয়ার বা আক্ষেপ করার কোনো কারণ নেই। অন্তত উত্তর ভারতে আগে শেঠ সম্বোধন পেতে হলে বিশেষ ধরনের পাগড়ি দরকার ছিল, এখন ওসবের দরকার নেই। হ্যাট-পরা বাবুকেও এখানে শেঠ নামে ডাকা হয়। এই পদবিটি যাঁরা দিয়েছিলেন, তাঁরা খুব পণ্ডিতও ছিলেন না, অর্থনীতিবিদও ছিলেন না। ওটা জনসাধারণের দেওয়া একটি পদবি, অনেক আগে থেকে ভেবে-চিন্তে দেওয়া নয়। হয়ত তীর ছোঁড়াছুঁড়ি হয়েছিল অনেক: বাবু, পণ্ডিত, শেঠ, লালা, মুনশী। প্রথমত এত সব পদবি মনে রাখা কঠিন, দ্বিতীয়ত সব পদবি সবার পছন্দ নয়। এক সময় হয়ত শেঠ খুব উঁচু পদবি ছিল, কিন্তু পরে ধীরে ধীরে অনেক জায়গায়, দাঁড়ি-পাল্লা নিয়ে কেনা বেচা করে যে বেনে, তার নামের সঙ্গেও সেটা জুড়ে দেওয়া শুরু হলো—উত্তরে শেঠ, তো দক্ষিণে তারই বিকৃত রূপ চেট্টি। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি শেঠ শাসক গোষ্ঠীর চেহারা নেয়—ভারতে সেটা হতে একটু দেরি হয়েছে—তবু সম্মান প্রদর্শনের জন্য এর চেয়ে উপযুক্ত শব্দ আর কি হতে পারে? আজকাল রাজা আর ক'টাই বা পাওয়া যায়? অবশ্য সাধারণ মানুষ এখনও অত-শত বোঝে না, কিন্তু তাঁদের অস্তিত্বের নাম-নিশানাই কি অবশিষ্ট আছে! পোশাক-পরিচ্ছদে অসাধারণত্ব না থাকলে মধুপুরীতে যে-কেউ তাঁদের শেঠ বলে ডেকে ফেলতে পারে, তাতে অবশ্য দোষের কিছু নেই। হাজার হলেও, 'কভি গাড়ি নাও পর তো কভি

নাও গাড়ি পর' প্রবাদবাক্যটি তো আর মিথ্যে নয়। এখন রাজার প্রভুত্ব শেঠদের ওপর নয়, বরং শেঠদেরই করুণার পাত্র রাজা।

আমাদের গল্পের নায়িকা শেঠ সম্প্রদায়ের, তাঁকে শেঠানী বলাটাই যুক্তিসঙ্গত, কিন্তু তাঁর কানে শেঠানী শব্দের তিনটি অক্ষর শূলের মতো বেঁধে—আমাদের সৌভাগ্য যে এ-লেখা তাঁর চোখে পড়বে না। শেঠানী পুরোপুরি মেম, ঘাটতি বলতে, পোশাক-পরিচ্ছদে তিনি মেম নন, শাড়িই পরেন। ভাষাটা ইংরেজি, আর উত্তর ভারতের হিন্দী প্রধান অঞ্চলে যে-সব ইংরেজ মেম বসবাস করেন, তাঁদের হিন্দীর মতোই হিন্দী বলেন তিনি, তবে সেটাও চাকর-বাকরদের সঙ্গেই চলে। রূপের জন্যে ফরসা হতেই হবে, এমন কোনা কথা নেই। তা যদি হয়, তাহলে ইউরোপের সমস্ত দেশকেই সুন্দরীদের রত্নখনি বলতে হয়। ভারতে যেখানে বিভিন্ন প্রদেশে শতকরা পনেরো থেকে তিরিশ ভাগ সুন্দরী মেয়ে চোখে পড়ে, সেখানে ইউরোপে, তা যে কোনো দেশই হোক না কেন, এই সংখ্যাটা শতকরা পনেরো ভাগেও পৌঁছায় না। তথাপি, শেঠানী ফরসা তো বটেই, আবার সুন্দরীও। পঁয়ত্রিশ বছরে পা দিয়েও তাঁর দেহে যৌবন ঢলঢল করছে এখনও। বিশ বছর বয়েসে তিনি কোনো শহরে বা দেশে সর্বসুন্দরী খেতাব যদি বা না পেতেন, অতি সুন্দরী হিসেবে যে গণ্য হতেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। দুঃখের বিষয়, মধুপুরীতে সেকালে সৌন্দর্য-প্রতিযোগিতায় ভারতীয় মহিলাদের অংশগ্রহণের কোনো সুযোগ ছিল না, নইলে কোনো-না-কোনো বছর তিনি অবশ্যই 'মিস মধুপুরী' হতে পারতেন। বস্তুত এই অসামান্য রূপের জন্যেই কোটিপতি শেঠের স্ত্রী হওয়ার সৌভাগ্য হয়েছে তাঁর, নইলে তাঁর বাপ-মায়ের অতো সামর্থ্য কোথায়? দিন-রাত—এমন কি স্বপ্নেও, ইংরেজিতে কথা বলা আর ইংরেজি আদব-কায়দা মেনে-চলা একজন প্রৌঢ়া সুন্দরীকে মেমসাহেব বলাটাই ঠিক, কিন্তু বংশের কথাটা ভেবে দেখা দরকার, কিংবা ন্যূনপক্ষে পেশাটা—কারণ সেটাই তো জীবনের প্রধান অবলম্বন, সেদিক দিয়ে বিচার করে আমরা যদি তাঁকে শেঠানী-মেম বলি, তাহলে এমন কিছু অন্যায় হয় না। ইংরেজরা এ-দেশ থেকে চলে যাওয়ার পর, ইংরেজ-রাজত্ব খতম হওয়ার পরও, যদি আপনারা শোনেন, মধুপুরীর রাস্তাঘাটে সর্বত্র সেই একই রকম ইংরেজি কথাবার্তা শুনতে পাওয়া যায়, যেমনটি ইংরেজ-আমলে শোনা যেত, তাহলে নিশ্চয়ই আপনারা কেউ অবাক হবেন না। ফারাকটা শুধু এই, তখন সেটা শ্বেতাঙ্গদের মুখ থেকে বেরোতো, বর্তমানে সেই বর্ণবৈষম্য দূর হয়েছে। মেমসাহেব যখন তাঁর ছেলে-মেয়েদের নিয়ে বাংলোয় থাকেন কিংবা বাইরে যান, তখন তিনি কেবল ইংরেজিতেই কথা বলেন, তা-ও আবার অক্সফোর্ডের উচ্চারণে। শেঠ বিলাতে পড়াশোনার সুযোগ পাননি, বিলাতের মুখ দেখেছেন বাপ মারা যাওয়ার পর। কোনো ইংরেজি স্কুলে কিংবা অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান স্কুলেও পড়া হয়ে ওঠেনি, বাপ গোঁড়া ছিলেন, সেটা একটা কারণ, আর তাছাড়া শেঠদের মধ্যে ওসবের রেওয়াজও ছিল না। তিনি

জানতে পারেন, সব ইংরেজি একরকম নয়। বাবু ইংরেজির কথা ছেড়েই দিন, শুদ্ধ ইংরেজিও নানা রকম, আর তাই দিয়েই একজনের শিক্ষা-সংস্কৃতি মাপা হয়। যখন তিনি জানতে পারলেন যে অক্সফোর্ডের উচ্চারণকেই সর্বোৎকৃষ্ট বলে ধরা হয়, তখন তিনি সেটাই মন দিয়ে রপ্ত করতে শুরু করলেন। কাজকর্মে, এমন কি ঘুমোবার সময়েও, তিনি তাঁর চিন্তা-ভাবনা যে ইংরেজিতে প্রকাশ করার চেষ্টা করেন, তা অক্সফোর্ড অ্যাকসেণ্টে। মেমসাহেবও এ-ব্যাপারে একনিষ্ঠ পতিব্রতা।

শেঠ নিজে যখন অক্সফোর্ডের পরম ভক্ত, তখন তিনি নিজের স্ত্রীকে সেইভাবে গড়ে তুলতে তো চাইবেনই। কিন্তু মাথায় হলুদ পাগড়ি-পরা বাপ বুড়ো শেঠজী যতক্ষণ বেঁচে ছিলেন, ততোক্ষণ স্ত্রীকে ষোলো আনা মেম বানাবার মতো সাহস ছিল না তাঁর। দু'জনেই মনে মনে জপতেন, বুড়োটা কবে টেঁসে যাবেন। ভাবতেন, চিত্রগুপ্ত দু'পেগ বেশি চড়িয়ে বেবাক ভুলে যায়নি তো যে, বুড়ো শেঠজীর জন্যে একটা পরোয়ানা পাঠানো বাকি আছে! পরোয়ানা আসতে আসতে যদি শেঠজীর বয়েস চল্লিশ পেরিয়ে যায়, তাহলে তখন আর লাভ কি? তাই শেঠজী পঁচিশে পা দিতে না দিতেই বুড়ো শেঠজী যখন টেঁসে গেলেন, তখন দু'জনের খুশি আর ধরে না —রঙিন দুনিয়ায় মজা ওড়াবার যথেষ্ট সময় আছে তখনও। পরের বছরই শেঠ শেঠানী দু'জনেই বিলেত গেলেন। মহাযুদ্ধ চলছে, ভয়ের কথা, কিন্তু যুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করার সবুর সইলো না ওঁদের। মেমসাহেব ওখানেই তাঁর সুন্দর কালো কুচকুচে দীর্ঘ চুল ছেঁটে ছোট করে নিলেন। বিশেষ ঢঙে চুল ছাঁটাতেন তিনি, বাইরে একটা বেপরোয়া ভাব দেখালেও, পাকা ইংরেজ নাপিতের হাতে তাঁর কোঁকড়ানো কালো চুলগুলোর দিকে চেয়ে ওগুলোকে বড় সুন্দর বলে মনে হতো তাঁর। চুল-ছাঁটা বৌ-মা বিলাত থেকে ফিরলে শাশুড়ীর বেজায় খারাপ লেগেছিল। কিন্তু তিনি তো জানতেনই, স্বামী বেচারী চলে যেতেই বৌ-এর ওপর তাঁর খবরদারির যুগও শেষ হয়েছে। বুড়ী শেঠানী এখনও বেঁচে আছেন, কিন্তু তাঁর অবস্থা, সেই দুধ থেকে তোলা মাছির মতোন। দেয়ালে কপাল ঠুকে ঠুকে নিজের কপাল নিজেই ভাঙছেন। তৃতীয় পুরুষের কথা দূরে থাক, দ্বিতীয় পুরুষেই কেউ তাঁর কথা কানে তুলেত চায় না।

কোনো ফ্যাশন অন্ধের মতো অনুসরণ করা বিপজ্জনক। ইউরোপে অনেক আগেই ফ্যাশনের দোকান-বাজার চালু হয়ে গেছে। সেখানে ডাক্তারদের মতো ফ্যাশন-বিশেষজ্ঞরা এক একজনকে দেখে তার রূপ, রঙ, দেহের গড়ন, অর্থাৎ মোটা না পাতলা —এসব দেখে প্রেসক্রিপশন লিখে দেন। সে-সব প্রেসক্রিপশন যথেষ্ট চড়া দামের, তার চেয়ে আজকালকার সিনেমার প্রেসক্রিপশন অনেক সস্তা সন্দেহ নেই, অর্থাৎ দেশী-বিদেশী চিত্র-তারকাদের বেশ-ভূষা, হাব-ভাব দেখে নিজেই তার নকল করতে শুরু করে দাও। এইরকম অন্ধ অনুকরণ সৌন্দর্য বাড়ানোর বদলে বহুক্ষেত্রে সৌন্দর্য নষ্ট করে দেয়। কিন্তু ফ্যাশন-পাগল মেয়েরা কি সে-সব গ্রাহ্য

করে ? প্রত্যেক মেয়েই নিজেকে সৌন্দর্যের ভালো সমঝদার ভাবে। ভাবখানা এই রকম —সে তো বড় আয়নার সামনে দাঁড়িয়েই সাজগোজ করে, কোনো দোষ ত্রুটি থাকলে কি আর চোখে পড়বে না ? 'আপ রুচি খানা পর রুচি-পরনা' যারা বলে তারা যতই হায়-হায় করুক, আজকাল তো 'পর-রুচি খানা' হলেও হতে পারে, কিন্তু 'আপ-রুচি পরনা' অবশ্যই হওয়া চাই।

মেমসাহেবের ক্ষেত্রে অবশ্য একথা বলা যায় না যে তিনি চিত্রতারকাদের অনুকরণ করেন। তিনি তিন-তিনবার প্যারিসের ফ্যাশন-বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিয়েছেন, সে-সব মেনেও চলেন। কিন্তু একটা ফ্যাশন তো আর এক বছর চলতে পারে না! রোজ রোজ সে পরামর্শ কে দেবে, তাই এ-ব্যাপারে চিত্রতারকাদের ওপরই নির্ভর করতে হয়। তাঁর ছোট ছোট ঘন কালো চুল আজকাল কাট-ছাঁট করাতে হয় ভারতেরই কোনো বিশেষজ্ঞের হাতে।

দুই

হিমালয়ের শৈলাবাসগুলির রানী হলো মধুপুরী। তাই এখানে খরচাটাও বেশি হওয়া স্বাভাবিক। সমভূমিতে টেম্পারেচার যখন ১১০° ছাড়িয়ে ওপরে উঠতে থাকে, তখনই সাধারণত লোকে আসে এখানে। কিন্তু মেমসাহেব তাঁর দেহের তাপমাত্রার চেয়ে বাইরের তাপমাত্রা একটু বেশি হলেই সমভূমি ছেড়ে মধুপুরীর দিকে দৌড় দেন। কখনো কখনো তো তিনি মার্চের শেষ দিকেই এসে হাজির হন। ফেরার সময় হলো, বাইরের তাপমাত্রা কমতে কমতে যখন শরীরেব তাপমাত্রার কাছাকাছি হয়, তখন —অর্থাৎ, বছরে সাত মাস তিনি মধুপুরীতেই কাটান। তাঁর দুটি মেয়ে ও একটি ছেলে এখানেই ইংরেজি স্কুলে পড়ে। পাঁচ বছরের চতুর্থ শিশুটি এখন মাদ্রাজী আয়ার কোলে খেলাধুলো করছে। আয়াটি কালো-কুৎসিত যাই হোক না কেন, বেশ শুদ্ধ ইংরেজি বলতে পারে। অবশ্য অক্সফোর্ড অ্যাকসেণ্টে নয়। ছোট শিশুটি সে-শিক্ষা পায় বাপ মা-র কাছেই।

তাই ছোট ছেলেটিকে বাদ দিলে, বলতে গেলে, মেমসাহেবের গোটা পরিবারটাই মধুপুরীতে থাকে। শেঠ এই সাত মাসে দু-চার-বারই আসেন। এক হপ্তার বেশি কখনও থাকেন না। ব্যবসা পত্তরের ভাবনা রয়েছে তাঁর। চিনি কলই বলুন আর কাপড়-কলই বলুন, এখন তো আর সেই শতকরা দশ-বিশ টাকা লাভের কারবার নেই। কোনো শেঠই তা পছন্দ করেন না, কিন্তু আমাদের শেঠ বাপের পুরনো ঢঙের কারবারের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক কারবারেও আপ-টু-ডেট। সব সময় বাজার, ব্যবসায়, আর সরকারী নীতির নাড়ী দেখতে হয়। ম্যানেজার ক্যাশিয়ারের ওপর বিশ্বাস করা যায় না। এমনিতে খোলা বাজারের চেয়ে চোরা-বাজারে লাভ বেশি, তাই কারখানায় যা তৈরি হয় তার কম-সে-কম অর্ধেক

চোরাবাজারে যাওয়া দরকার। আর সেই চোরাবাজারী জমা-খরচ পাকা হিসেবের খাতায় তুলে শেঠজী নিজেকে ফাঁসাতে যাবেন কেন? যদিও তিনি জানেন, ফেঁসে যাওয়া মানে, পঞ্চাশ-ষাট লাখ টাকা মুনাফা থেকে দু-চার লাখ টাকা ভেট দেওয়া ছাড়া আর কিছু না। কিন্তু তাই বা যাবে কেন? এ-ধরনের কারবারে, মুখের কথা আর কাঁচা-পাকা হিসেবের খাতার তালগোলে ম্যানেজার-ক্যাশিয়ার যদি নিজেদের জন্যে অর্ধেকটা সরিয়ে ফেলে, শেঠ তার হদিস পাবেন কি করে? সেজন্যে শেঠ সাহেব চান সব কাজ তাঁর চোখের সামনে হোক। বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে টাকা-পয়সা খরচের ব্যাপারে তিনি বড় হাতভারী হয়ে উঠছেন, সেটা মেমসাহেবের পছন্দ নয়।

মধুপুরীতে প্রথম শ্রেণীর বাড়ি আর বাংলোগুলো বাজার থেকে কয়েক মাইল দূরে দূরে। ইংরেজরা বাজারের কাছাকাছি থাকাটা পছন্দ করত না। তাই তারা তাদের বাংলোগুলো বেশ কিছুটা দূরেই তৈরি করেছিল। ইংরেজদের দেখাদেখি রাজা-মহারাজা-তালুকদার-জমিদারেরাও মধুপুরীর প্রতি আকৃষ্ট হন, কিন্তু তাঁরা ইংরেজদের পাড়ায় বাড়ি তৈরি করার সুযোগ পেতেন খুব কমই। ইংরেজরা চলে যাওয়ার পর সেই সব সুন্দর সুন্দর বাংলোতে বহু কাল ধরে মানুষের গলার আওয়াজই শোনা যায় না, অনেক বাংলোর আসবাবপত্র লোপাট হয়ে গেছে, ফুলের টব ভেঙে গেছে, মেরামত না করার ফলে ছাদ চুঁইয়ে ঘরের ভেতর জল পড়ে এখন। প্রতি বছরই বাংলোগুলোর টিন-কাঠ উড়ে যাচ্ছে। মজবুত দেওয়াল বলেই রক্ষে, কোনোরকমে বাড়িগুলোকে খাড়া করে রেখেছে, নইলে কবে ধরাশায়ী হতো। ওগুলো যে দীর্ঘশ্বাস ফেলছে, আর কয়েক বছরের মধ্যেই ধরাশায়ী হবে, তা দেখলেই মালুম হয়। ইংরেজদের এলাকায় এক জমিদার — মানে এক মহারাজাও বাড়ি তৈরি করার মওকা পেয়েছিলেন। টাকা-পয়সা খরচ করতে কসুর করেননি। টাকায় যখন দশ সের গম, তখনই তাঁর জমিদারীর সালিয়ানা আয় ছিল পঁচিশ লাখ টাকা, তবু তাতে তাঁর কুলোতো না। এমন বাদশাহী মেজাজে দেদার টাকা ওড়ানো যাঁর স্বভাব, তাঁর সম্বন্ধে আর কি বলব? দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার কিছুদিন পরেই মহারাজা একেবারে ল্যাজে-গোবরে হয়ে গেলেন। আগেও তিনি গ্রীষ্মকালে কখনো কখনো মধুপুরী আসতেন, কিন্তু মধুপুরীর বদলে ইউরোপ যাওয়াটাই তাঁর পছন্দ ছিল বেশি। একবার তিনি এক ইউরোপীয় মহিলাকে বিয়েও করেছিলেন, কিন্তু সেটা বিশেষ সুবিধের হয়নি। মহারাজার বাড়ি 'স্প্রিং ফিল্ড' (বসন্ত নিকেতন) সত্যি সত্যিই ঋতুরাজের নামের সঙ্গে সমার্থক ছিল। যুদ্ধ শেষ হওয়ার মুখেই মেমসাহেব সেই বাড়িটা ভাড়ায় নিয়েছিলেন, এখন তিনি প্রত্যেক বছর এসে ওখানেই থাকেন। মহারাজা কিংবা তাঁর উত্তরাধিকারীদের কাছে এটা এমন কিছু ক্ষতির নয়। মধুপুরীতে আগে যে বাড়িতে পাঁচ হাজার টাকা ভাড়া উঠত, এখন সেখানে দু'হাজার টাকাও ওঠে না।

কিন্তু মেমসাহেব সেই যুদ্ধের সময় বাড়িটা যে ভাড়ায় নিয়েছিলেন, এখনও প্রায় সেই ভাড়াই দিয়ে থাকেন। তাঁর পক্ষে বাড়িটা বেশ বড়-সড়। আটখানা লাগালাগি ঘর, তার ওপর ডাইনিং আর ড্রইং রুমগুলো যেন এক-একটা হলঘর। অবশ্য মহারাজার কাছে এ-বাড়িও যথেষ্ট ছিল না, কারণ তাঁর পরিবার-বর্গ ও অতিথির সংখ্যা ছিল অনেক। মেমসাহেবের এত অতিথি-অভ্যাগত রাখার ক্ষমতা নেই, কিন্তু তবুও, তিনি নিজে অতিথিবৎসল, আর তাছাড়া একা একা পান-ভোজন তাঁর পছন্দ নয়। কিন্তু তিনি তো শুধু ঘরগুলো ব্যবহার করার জন্যই অতিথি-অভ্যাগতদের পুষতে পারেন না; ফলে কিছু ঘর এমনিই পড়ে থাকে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা তাঁর পছন্দ, তাই সব ঘরই সাফ-সুতরো করতে হয়। আয়া ছাড়াও তাঁর পাঁচ জন চাকর আছে। মোটরের টায়ার লাগানো নিজস্ব রিকশা আছে, আর সেগুলোর জন্যে ছ'জন রিকশাওয়ালা রেখে দেন সাত মাস। মধুপুরীতে যখন রাজা-মহারাজা আর বড় বড় তালুকদারদের জমাটি আসর ছিল, তখন জমকালো উর্দি-পরা রিকশাওয়ালা থাকত প্রচুর, আজকাল তো ও রকম রিকশা তিনটে কি চারটে চোখে পড়বে। মেমসাহেবের রিকশাওয়ালাদের উর্দিতে নম্বরও দেওয়া থাকে। দুঃখের বিষয়, এখন আর অতো রিকশা-গৌরব দেখানোর সুযোগ নেই তাঁর।

তিন

মেমসাহেব গতবার ইউরোপে গিয়েছিলেন। প্যারিস থেকে অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে কয়েক শিশি ভালো দামী সেন্ট নিয়ে এসেছিলেন। সেদিন প্যারেলাল সন্স দোকানটায় যেতেই হঠাৎ তাঁর খেয়াল হলো যে সেন্টগুলো প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। তিনি দোকানে সেই প্যারিসের সেন্ট চাইলেন। প্যারেলাল বললেন, 'ও সেন্ট প্যারিস ছাড়া আর কোথায় পাওয়া যাবে মেমসাহেব! ইংরেজ আমলে আমরা আনতাম, কিন্তু সরকার এখন খুব কড়াকড়ি করেছে, তাছাড়া খরচ করার মতো খদ্দেরও কম আজকাল।'

মেমসাহেব একটু হতাশ গলায় বললেন, 'তাহলে ওটা পাওয়া যাবে না? কিন্তু ওটা না হলে তো চলবে না আমার। আগে যদি জানতাম, তাহলে অমন করে খরচ করতাম না, দু'হাতে বিলিয়েও দিতাম না।'

'পাওয়া যাবে না বলে কোনো কথা নেই। কি এমন জিনিস আছে, যে পাওয়া যায় না? কিন্তু দাম পড়বে অনেক, পেতে দেরিও হবে একটু।'

'তাহলে পাওয়া যাবে?' মেমসাহেব তাঁর কোমল আঙুল দিয়ে কানের ওপর এসে পড়া কয়েকগাছি চুল পেছন দিকে সরিয়ে দিলেন, আঙুলের ডগায় লাল রঙে পালিশ করা নখগুলো চকচক করে উঠল। খুশি-খুশি গলায় বললেন,

'আপনি আনিয়ে দিন তাহলে। একটু তাড়াতাড়ি। দামের জন্যে ভাববেন না।'

প্যারেলাল সন্সের পুরনো কারবার। সব জায়গাতেই তাঁর যোগাযোগ। সেই দিনই তিনি বোম্বাইয়ে ফোন করলেন। জানতে পারলেন, গোয়া থেকে ঐ সেণ্ট আনানো যেতে পারে। ভারতে যতদিন ফরাসী আর পর্তুগীজদের বসতি রয়েছে, অন্তত ততোদিন কোনো জিনিসের ওপর বাধা-নিষেধের ভারতীয় আইন কানুন শেলফে তুলে রাখা যেতে পারে। বোম্বাই থেকে লোক ছুটল গোয়ায়, আর সেখান থেকে সেণ্ট নিয়ে সোজা মধুপুরীতে এসে হাজির হলো। সপ্তাহ খানেক পরেই প্যারিসের সবচেয়ে দামী সেণ্ট দু'শিশি প্যারেলালের দোকানে মজুদ! মেমসাহেব প্রায় রোজই টেলিফোনে খোঁজ-খবর নিতেন। যখন তিনি খবর পেলেন, সেণ্ট এসে গেছে, তখন আর এক মিনিট দেরি করলেন না। উর্দি-পরা রিকশাওয়ালা তাঁকে প্যারেলালের দোকানে এনে হাজির করল। বুড়ো দোকানদার নিজের হাতে সেণ্টের কেস রাখলেন তাঁর সামনে। যে কেসটায় সেণ্ট রয়েছে, সেই কেসটাই এক মূল্যবান কারুকার্যের নিদর্শন। মেমসাহেব শিশি দেখলেন। ঠিক ঐ সেণ্ট, একই রকম কাটগ্লাসের চমৎকার শিশি। দাম জিজ্ঞেস করলেন, তো প্যারেলাল এক-একটা শিশির দাম বললেন আড়াই শো টাকা। মেমসাহেব 'ঠিক আছে, ঠিক আছে' বলে তাঁর রিকশাওয়ালার হাতে সেণ্টের কেস তুলে দিলেন।

বাড়ি ফেরার সময় তাঁর মনে আনন্দ-উচ্ছ্বাস আর ধরে না। প্যারিসের সেণ্টের কাছে কি অন্য কোনো দিশী-বিলিতী সেণ্ট দাঁড়াতে পারে?

শুধু সেণ্টের খরচের ব্যাপারেই নয়, সব রকম খরচেই তাঁর হাত দরাজ। প্যারেলাল এবং অন্যান্য আরও এক ডজন ব্যবসায়ীর কাছে এঁরাই তো কল্পতরু। মেমসাহেব দোকানে গিয়ে বেশ দামী দামী জিনিস বেশি বেশি পরিমাণে কেনাকাটা করেন। তাঁর শ্বশুর কখনো কখনো লুকিয়ে-চুরিয়ে মদ খেতেন। কারণ তিনি চাইতেন না যে ছেলেপিলেদের ও রকম খারাপ স্বভাব হোক। কিন্তু তাঁর স্বজাতিরা শুধু পেছিয়ে পড়া রাজ্যগুলোতেই বাস করতেন না। পাঞ্জাবেও থাকতেন, যা আধুনিকতা আর ফ্যাশনে সারা দেশের কান কাটতে পারে। মেমসাহেব হলেন সেখানকার, খাওয়া-পরা-চাল-চলনে এমন এগিয়ে থাকা মেয়ে যে, তাঁর সাত পুরুষে স্বপ্নেও কেউ তা দেখেননি। মদ-মাংস ছাড়া তো এক মুহূর্ত চলে না। আধুনিকতা তাঁর সিগারেটেও গিয়ে পৌঁছেছে। তাঁর প্রিয় সিগারেট 'পাঁচশো পঞ্চান্ন', দোকানে গেলেই ডজন দু'য়েক টিন রিকশায় তুলে নেন। তাঁর সমগোত্রীয় মহিলারা প্রায়ই তাঁর কাছে যাওয়া-আসা করে, তাদের আদর-আপ্যায়ন আছে। আর মদ? শেরী, হুইস্কি, শ্যাম্পেন, শারতু, পোর্ত্, আর ব্রাণ্ডীর সবচেয়ে ভালো জিনিসই তাঁর পছন্দ। কেনার সময় দু-চার বোতল নয়, বরং দু-তিনটে পেটী কিনে নেন। প্রত্যেক পেটীতে

এক ডজন করে বোতল থাকে। হুইস্কি তাঁর খুব প্রিয়, আঠাশ টাকা বোতলও পাওয়া যায়, কিন্তু তিনি পছন্দ করেন সবচেয়ে দামী হুইস্কি, ছাপ্পান্ন টাকা বোতল। এক-একবারে দু-পেটী করে কেনেন। পঁয়ত্রিশ টাকা বোতল শ্যাম্পেন পছন্দ, তার ওপর মুখের স্বাদ বদলাবার জন্যে তিরিশ টাকা দামের ব্র্যাণ্ডীর বোতল আসে। ছাব্বিশ টাকা করে শারতুর বোতলও চলে, কিন্তু বারো টাকা বোতলের শেরী আর এখনকার অন্যান্য মদ তাঁর 'প্যাণ্ট্রী'-তে শুধু বৈচিত্র্য বাড়ানোর জন্যেই আসে কিন্তু তবু বলতে হবে যে মদ্যপানেও মেমসাহেব যথেষ্ট সংযমের পরিচয় দেন। মধুপুরীতে তাঁর শ্রেণীভুক্ত এমন অনেক মহিলা রয়েছে, সকাল সাতটায় ঘুম থেকে ওঠার সময়েই কেবল তাদের প্রকৃতিস্থ দেখা যায়, তারপর ব্রেকফাস্টের সময় থেকেই তারা টানতে শুরু করে, আর সব সময় নেশায় চুর হয়ে থাকে। মেমসাহেব সূর্যাস্তের পরই বোতলে হাত ছোঁয়ান, অবশ্য কখনো কখনো সন্ধ্যে পাঁচটায় চায়ের আসরে কোনো বিশেষ মহিলার নেমন্তন্ন থাকলে তাঁকে আসরে যোগ দিতে হয়, সেটা নিতান্তই অতিথি অ্যাপ্যায়নের জন্য, সে-সব দিনগুলোর কথা আলাদা। মদ খেয়ে বকাবকি করা তাঁর অভ্যেস নয়। চোখে রঙ ধরে, রুজ লাগানো গাল দুটো আর একটু লাল হয়ে ওঠে, ঘড়ি-ঘড়ি লিপস্টিক লাগানো ঠোঁট দুটোতে আর একটু ঘন ঘন লিপস্টিক বোলানো শুরু হয়! এ-ছাড়া তাঁর ওপরে নেশার আর কোনো প্রতিক্রিয়া হয় না।

চার

সেদিন মেমসাহেব প্যারেলাল সঙ্গে গেছেন। ছোট ছেলেটিও সঙ্গে রয়েছে। খেলার জিনিস হিসেবে তিনশো টাকা দামের একখানা তিন চাকার সাইকেল তার পছন্দ। ছেলের জন্যে নৌ-সেনা এ্যাডমিরালের উর্দিও পছন্দ হলো মেমসাহেবের। একবারে হাজার খানেক টাকার জিনিস কিনে নেওয়া তাঁর কাছে মামুলী ব্যাপার। বুড়ো প্যারেলাল ঘড়েল ব্যবসায়ী। দেখলেন, মেমসাহেবের কাছে প্রায় সাত হাজার টাকা বাকি পড়ে গেছে। আগেকার ধারের কোনো কিনারা না করে নতুন করে ধার দিতে আদৌ ইচ্ছে করছিল না তাঁর। যখন তাঁর কর্মচারীটি জিনিসপত্র গোছগাছ করে দিচ্ছে, তখন তিনি মৃদুকণ্ঠে অথচ বেশ একটু কড়া গলায় বললেন, 'মেমসাহেব, আপনার কাছে লোক পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু টাকা পাইনি। আপনি নিজেই দেবেন বলেছিলেন।'

'ও, আই অ্যাম সরি' —মেমসাহেব তৎক্ষণাৎ নাটকীয় ভঙ্গিতে জবাব দিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বললেন, চেক-বইটা আনতে ভুলে গেছি।'

নিজের বন্ধু-বান্ধবীদের কাছ থেকে মেমসাহেব শুধু চেক-বই আনতে ভুলে যাওয়াটাই নয়, এমনি আরও অনেক ফন্দি-ফিকির শিখেছেন। মধুপুরীতে এমন কোনো জহুরী, জেনারেল স্টোর, ফটোগ্রাফীর দোকান নেই যে স্প্রিং-ফিল্ডের

মেমসাহেবের কাছে তার দু-চার হাজার টাকা বাকি নেই। প্রত্যেক বছর এসেই তিনি প্রত্যেককে চার-পাঁচ শো টাকা করে পাঠিয়ে দেন, ভবিষ্যতের ভরসায় আবার যথারীতি মাল দেওয়া শুরু হয় তাঁকে। বছরে দশ হাজার টাকার মাল নিয়ে জোর চার-পাঁচ হাজার টাকা শোধ করেন। এখন তাঁর প্রায় বিশ হাজার টাকা ধার দেনা রয়েছে। শেঠ ওটা স্বচ্ছন্দেই মিটিয়ে দিতে পারেন! কিন্তু হাতটা তেমন দরাজ না রাখার জন্যে মেমসাহেবের ভারি খারাপ লাগে। গত তিন-চার বছর শেঠকে তাঁর প্রতি আর ততোটা অনুরক্ত বলে মনে হয় না। যদি তাঁদের মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদের চল থাকত, কিংবা বিয়েটা সিভিল-ম্যারেজ হতো, তাহলে বলা যায় না, শেঠ হয়ত কবেই স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে ফেলতেন। তবু হয়ত সেটা সম্ভব হতো না, কারণ শেঠ তাঁর ছেলেমেয়ে চারটিকে দারুণ ভালোবাসেন। কিছুদিন থেকে দু-জনের মধ্যে সম্পর্কটা বড় ঢিলে-ঢালা। মেমসাহেব মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, 'যখন আমার এই মুখের ওপর বসন্তের হাওয়া বইত, তখন সে ভোমরার মতো ওড়াউড়ি করত সব সময়, আর এখন...'

কার্পণ্য দেখানো সত্ত্বেও শেঠ এখনও তাঁর স্ত্রীর পেছনে সাত মাসে তিরিশ-চল্লিশ হাজার টাকা খরচ করেন। মাসে চার হাজার টাকা কম নয় —এই ভেবে তিনি তো নিজের ব্যবহারে কোনো ত্রুটি খুঁজে পান না, কিন্তু মেমসাহেবের হাত সেটা মানতে চায় না। তিনি এমন এক জীবন-যাপনে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছেন যে তাতে টাকাকড়ির কোনো দাম নেই, দরকারী অদরকারীর মাত্রাজ্ঞানও নেই। যাই কিনুন না কেন, সবচেয়ে দামী আর ডজন ছাড়া কথা নয়। স্কুলে-পড়া ছেলেমেয়ে তিনটি রোজ মা-র কাছে আসে না, কেবল ছোট ছেলেটি আর অতিথি-অভ্যাগত, তাই চকোলেটের জন্যে ততো খরচ হওয়ার কথা নয়। কিন্তু তবুও তিনি একবারে ছ-ডজন, অর্থাৎ নব্বই টাকার চকোলেট না কিনে পারেন না।

ব্যবসায়ীরা বলে থাকেন, ধার-বাকি তো দোকানদারীর শোভা। মেমসাহেব তাঁদের সেই কথার ওপরই চলছেন। তাঁর স্বামীও নিজের কল-কারখানার জন্যে ব্যাঙ্ক থেকে, মহাজনের কাছ থেকে লাখ লাখ টাকা ধার করেন, নিজেও ধার দেন। তাহলে মেমসাহেব এমন কি খারাপ কাজ করছেন? প্যারেলালের মতো লোকেরা তো চোখ বুজে খদ্দেরদের লুটেপুটে খাচ্ছেন। শতকরা পঞ্চাশ টাকা মুনাফা না হলে মন ভরে না। তিনি যখন এত লোককে ঠকাচ্ছেন, তখন পঞ্চাশ জনের মধ্যে মেমসাহেবের মতো এক আধজন খদ্দের যদি জুটে যায়, তাহলে তাতে নাক সিঁটকানোর কি আছে? তাছাড়া তাঁর তো একেবারে নিরাশ হওয়ার মতোও ব্যাপারটা নয়, কারণ শেঠের এখনও পোয়া-বারো। অবশ্য এখন অনেকেই ভাবছেন যে মেমসাহেবের কাছ থেকে টাকা-পয়সা লোটা সোজা নয়। মামলা মোকদ্দমা চালাতে গেলে আরও খরচ বাড়বার আশঙ্কা, তাছাড়া এমন কিছু কিছু জিনিস আছে, যার দাম ঠিক-ঠিক হিসেবের খাতায় লেখাও যায় না।

মেমসাহেবের কাছে ঘা খেয়ে শুধু ধনী শেঠ প্যারেলালই ঘায়েল হননি, আরও অনেকেই মারা-পড়ার দাখিল। কিন্তু সব ব্যাপারেই তো আর লেখাপড়া করা যায় না। দুনিয়াতে বেইমান যতই থাক, তবু অনেক জিনিসই বিশ্বাসের ওপরেই দিতে হয়। দামী বেনারসী শাড়ি মেমসাহেবের খুব পছন্দ। দেখবার জন্তে চারখানা শাড়ি আনালেন, তারপর যদি বেমালুম বলে দেন যে তিনি শাড়ি পাননি, তাহলে কোন আদালত তাঁর কাছ থেকে টাকা আদায় করিয়ে দেবে? সবচেয়ে দুঃখজনক, তিনি গরিব লোকের টাকা মারতেও এতটুকু ইতস্তত করেন না। একবার এক ফেরিওয়ালাকে বইয়ের বোঝা মাথায় করে নিয়ে আসতে বলেছিলেন বাড়িতে। তার কাছ থেকে একশো টাকার ওপর বই কিনলেন মেমসাহেব, দামের জন্তে তাকে সপ্তাহ দুয়েক পরে আসতে বললেন। ইত্যবসরে তিনি সীজন কাটিয়ে মধুপুরী ছেড়ে চলে গেলেন। মারা পড়ল বেচারী ফেরিওয়ালাটা। সে একটা দোকান থেকে কমিশনে বই নিয়ে ঘুরে ঘুরে বিক্রি করে বেড়াত। সামনের বছর অব্দি কারবারটা বহাল রাখতে হলে তার তো দোকানদারের বইয়ের দাম মিটিয়ে দেওয়া দরকার। মেমসাহেবের মধুপুরী থেকে চলে যাওয়ার সময় শুধু বড় বড় দোকানেই নয়, এমন কি সবজিওয়ালা, ফলওয়ালা, রুটি-মাখনওয়ালা, দুধওয়ালা, ধোপা, সবারই অনেক টাকা করে বাকি পড়ে রইল। পরের বছর হয়ত টাকাটা পাওয়া যাবে, এই আশায় নিজেদের মনকে সান্ত্বনা দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই তাদের।

মহাপ্রভু

'এসো রমেশ, এসো। তুমি তো ডুমুরের ফুল হয়ে গেলে দেখছি!' কথাগুলো বলতে বলতে শ্যাম শর্মা তার বন্ধু রমেশ বর্মাকে বাংলোর দরজা খুলে দিলো। হিমালয়ের শীতল আবহাওয়ায় মধুপুরীর মতো যে-সব শৈলাবাস রয়েছে, সেখানে সমতল জায়গা বড় কম, তার ওপর শ্যাম শর্মা এমন একটা বাংলোয় থাকে, সেটা আবার ম্যল রোডেও নয়, তার মানে, এখানে চড়াই-উৎরাই আরও বেশি। রমেশ ওপরের দিক থেকে আসছে। ওর চোখ-মুখ দেখেই মালুম হচ্ছিল, আজ বিশেষ খুশির কারণ ঘটেছে ওর। তরুণ-তরুণীদের জন্যে মধুপুরীতে খুশিটা দুর্লভ বস্তু নয়।

শ্যাম মনে মনে ভাবল, রমেশ আজ নিশ্চয়ই তার সুপরিচিতা সুন্দরী মেয়েটির যথেষ্ট কৃপা লাভ করেছে। শ্যাম তাকে ভেতরে নিয়ে গেলো। সার্সি ঘেরা বারান্দাতেই চেয়ার পেতে বসল ওরা। তারপর বেশ হালকা মেজাজে শ্যাম বলল, 'আজ তোমাকে তো খুব খুশি-খুশি দেখাচ্ছে, রমেশ?'

রমেশ বলল, 'সত্যিই, আজ আমার দারুণ খুশি লাগছে।'

'লীলার নেক-নজরে পড়েছ নিশ্চয়?'

রমেশ একটু নড়ে-চড়ে বসল। বুঝতে পারল, একটা অসঙ্গত আলোচনা শুরু হতে চলেছে। সে এইমাত্র ব্রহ্মানন্দ লাভ করে আসছে, আর এখানে তার কলেজের পুরনো সহপাঠী বিষয়ানন্দ চর্চার অবতারণা করতে চাইছে। সে একটু গম্ভীর হয়ে বলল, 'না, তোমার ধারণা ভুল। নেহাত সৌজন্যের খাতিরে সেদিন লীলার সঙ্গে কল্যাণী জলপ্রপাতে আলাপ হয়ে গিয়েছিল।'

'হ্যাঁ, আমারও আশ্চর্য বোধ হচ্ছিল। তোমার ঈশ্বর-ভক্ত মন, বিষয়ের প্রতি আসক্ত হয় কি করে! যৌবন চলে গেলে আর ফিরে আসে না, তা তোমার যতই জানা থাক না কেন।'

'ওসব কথা থাক রমেশ। কয়েক বছর ধরে যে অমূল্য বস্তু খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম আজ তা পেয়েছি।'

'অর্থাৎ তুমি ব্রহ্মলাভ করেছ। খুব আনন্দের কথা।'

'আমার আশ্চর্য বোধ হচ্ছে শ্যাম, তুমি সংস্কৃত নিয়ে এম. এ. পর্যন্ত পড়লে, আমাদের দর্শনেও তোমার ভালো পড়াশোনা আছে। অথচ…'

'হ্যাঁ, বেদান্তটা বেশ ভালো করেই পড়েছি, যোগও পড়া আছে। কিন্তু তাতে কি হলো ?'

'আমার দুঃখ হচ্ছে যে আমি শুধু অর্থনীতি আর রাজনীতি নিয়েই মাথা ঘামালাম। এখন হায় হায় করছি, সংস্কৃতে মূর্খ হয়ে থাকলাম কেন ?'

'এখন পড়ে নাও। মানুষ আজীবন ছাত্র হয়ে থাকতে পারে। আমি তুমি দু'জনেই তো ছুটি শেষ না হওয়া পর্যন্ত এ দু'মাস মধুপুরীতেই কাটাব। এই সময়টা আমি তোমাকে নিয়ম করে সংস্কৃত পড়িয়ে দেবো না-হয়।'

'সংস্কৃত না হলে চলবে না দেখছি। কারণ যোগ-বেদান্তের সব বই-ই সংস্কৃতে।'

'যোগ আর বেদান্ত জানার জন্যে সংস্কৃতের কোনো দরকার নেই। কবীরদাস সংস্কৃত পড়েছিলেন কোথায় ? আমাদের সাধু তপস্বীদের খুব কম লোকই সংস্কৃত জানেন।'

'ঠিক তাই। স্বামী রামতীর্থ আর বিবেকানন্দের বইপত্র পড়ে বড় শান্তি পেয়েছি। নিশ্চয়ই যোগ-বেদান্তের ওপর আরও অনেক বই ইংরেজিতে পাওয়া যেতে পারে ?

'যোগ-বেদান্তের ওপর প্রায় সব বই-ই ইংরেজিতে আছে। এমন কি হিন্দীতেও অনেক বই পাবে। কিন্তু, মনে রাখা দরকার, সিদ্ধস্বামী রামতীর্থের মনেও শেষদিকে মূল সংস্কৃতে বেদান্ত পড়ার ইচ্ছে জেগেছিল। তাঁর তরুণ বয়সেই গঙ্গালাভের সেটা একটা অন্যতম কারণ। আমি তোমাকে সংস্কৃত পড়াতে রাজি আছি, এক বছরের পড়াটা আমি যদি তোমায় তিন মাসেই পড়িয়ে দিতে না পারি, তাহলে আমার নাম নয়। এখানেই শুরু করে দাও, আর ইউনিভার্সিটি খুললে এলাহাবাদ গিয়ে সেখানেও ঘণ্টাখানেক করে সময় দেওয়া যাবে। রাম মঙ্গল করুন, তোমার ক্ষেত্রে যেন রামতীর্থের দশা ঘটার সম্ভাবনা না থাকে। কিন্তু আসল কথাটা তো মাঝখানেই চাপা পড়ে গেলো। ব্রহ্মানন্দ বর্মা মহাশয়ের এ রকম আনন্দের কারণ কি ?'

'সদ্‌গুরু লাভ করার সৌভাগ্য হয়েছে আমার।'

শ্যাম গভীর দৃষ্টিতে রমেশের হাসি-খুশি মুখের দিকে চেয়ে বলল, 'অভিনন্দন, অসংখ্য অভিনন্দন। তবে দেখো ভাই, শেষ পর্যন্ত আবার হোঁচট খেতে না হয়। মধুপুরীটা হিমালয়েই, ভক্তরা সব এদিকেই ছুটে আসে। আগেকার দিনে পুণ্যার্থীরা সপ্ত তীর্থেই সদ্‌গুরুর সন্ধানে যেত। এখন কিন্তু ওসব তীর্থে আর আকর্ষণ নেই। মথুরা উজ্জয়িনীর মতো তীর্থক্ষেত্রে আজকাল তো কোনো পুণ্যার্থীও যায় না। আর যে-সব তীর্থক্ষেত্র রয়েছে, সেগুলোও সাধু সন্তদের জন্যে নয়, পাণ্ডাদের জন্যেই প্রসিদ্ধ। তবে, আমি তোমায় বলব, আমার মতে, সাধু সন্ত হওয়ার চেয়ে পাণ্ডা হওয়াটা হাজার গুণে শ্রেয়।'

'ঐ তো, ঐ জন্তেই আমি অবাক হই, নিজে এত শাস্ত্র ঘেঁটে তুমি সেই রকমই রয়ে গেলে।'

'এটাও ভেবে দেখো রমেশ, সাত পুরুষ কেন, সত্তর পুরুষ ধরে আমরা খানদানী গুরু হয়ে আসছি, এখনও আমাদের অনেক বড় বড় সম্মানিত শিষ্য, নিষেধ করা সত্ত্বেও আমার পা ছুঁয়ে প্রণাম করে। থাকৃগে সে-সব কথা, হয়ত আবার প্রসঙ্গটা অন্তদিকে ঘুরে যাবে, আজ খুশির দিন, ঐ নিয়েই আলোচনা হোক। তোমাকে আগেই বলেছি, আগেকার দিনে সাধু সন্তরা গ্রীষ্মকালে 'লু'-তে পুড়তে পুড়তে সপ্ত তীর্থে যেতেন জনসাধারণকে কৃপা বিতরণ করতে, আজকাল তাঁরা মধুপুরীর মতো তীর্থক্ষেত্রে আসেন, যেখানে গ্রীষ্মকালে আবহাওয়া ঠাণ্ডা থাকে। প্রাচীন তীর্থক্ষেত্রগুলি একাধারে রাজাদের রাজধানী ছিল, প্রমোদ নগরীও ছিল। যোগ আর ভোগের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই, আর বিরোধ থাকলেও, পরস্পরবিরোধীর সামঞ্জস্য-বিধান তো প্রকৃতির নিয়ম। তোমার সদ্‌গুরুর নামটা বলবে কি?'

'ওসব মহাপুরুষের ওপরে তোমার তো আস্থাই নেই, ওঁর নাম বললে চিনবে কি করে তুমি? বললেও হাসি-ঠাট্টা করবে।'

'আমায় ভক্তিহীন ভাবছ তো! কিন্তু রমেশ, অন্যের ভক্তিকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করাটা আমি পছন্দ করিনে, সেটা তো তুমি জানোই। ভক্তি না থাকলেও প্রত্যেকটি ব্যাপার জানার আগ্রহ আছে আমার, তোমার সদ্‌গুরু সম্বন্ধে সে রকম কোনো মনোভাব প্রকাশ করব না আমি। আজকাল মধুপুরীতে সের-সের লিপস্টিক পাউডার কাজল মেখে আসল বা নকল সুরন্দীকে যেমন হাজারে হাজারে ঘুরে ফিরে বেড়াতে দেখা যায়, তেমনি গেরুয়াধারীরও অভাব নেই। কিন্তু আমি জানি, প্রত্যেক গেরুয়াধারীকেই তুমি তোমার সদ্‌গুরু বলে মেনে নিতে পারো না। শ্রী ১০০৮ জগদ্‌গুরুর অনুগ্রহভাজন হওয়ার সৌভাগ্য হয়নি তো তোমার?'

রমেশ খানিকটা তাচ্ছিল্যের সুরে বলল, 'না, ধর্মের দোকানদারদের ঘেন্না করি আমি।'

'বাঃ বাঃ! তাহলে কি রকম বিভূতি লাভ হয়েছে তোমার?'

'তুমি নিশ্চয়ই মহাপ্রভুর নাম শুনেছ!'

'ও, মহাপ্রভু! তুমিই সত্যিই কৃতার্থ রমেশ। আমি বলব, ভগবানের অবতারের সংখ্যা গোনা একদম ভুল। যে অবতারের সংখ্যা দশ কিংবা চব্বিশে দাঁড়ি টেনে দেয়, সে নিশ্চয়ই বিষয়ী মানুষ। ধর্মের ক্ষেত্রে গীতার ওপরে কোনো গ্রন্থ প্রামাণ্য হতে পারে না, আর গীতায় ভগবান এক জায়গায় নয়, বহু জায়গায় বলেছেন —বৈভব সম্পন্ন তেজস্বী ব্যক্তি মাত্রেই আমার অবতার, আমার অংশ থেকেই তাঁরা উদ্ভূত হয়েছেন বলে মনে করবে। যখনই প্রয়োজন হয়, তখনই আমি অবতার রূপে আবির্ভূত হই।' তাই অবতারের সংখ্যা মাত্র দু'ডজনে বেঁধে

দেওয়াটা স্বকপোলকল্পিত। মহাপ্রভু যথার্থই মহান্ প্রভু, তিনি ভগবানের অবতার।'

শ্যাম এমন গম্ভীরভাবে কথা বলছিল যে তার কথায় রমেশের বিন্দুমাত্র সংশয় রইল না। খুশি হয়ে বলল, 'তাহলে তুমি মহাপ্রভুর আধ্যাত্মিক শক্তি মানো?'

'আমার ভক্তি নেই, তাই বলে এটা ভেবো না রমেশ, আমি চিরকালের জন্যে ভক্তিকে জলাঞ্জলি দিয়েছি। এখন ভাই তরুণ বয়েস, খাওয়া-দাওয়া খেলাধুলোর সময়। আমাদের শাস্ত্র চতুর্থ আশ্রমে যোগ-সাধনার কথা বলেছে। ব্যস, তোমার আমার মধ্যে তফাৎ শুধু এইটুকুই, তুমি সময়ের আগেই ওদিকে পা বাড়িয়েছ, আমি ধৈর্যের সঙ্গে সময়ের প্রতীক্ষা করছি। মহাপ্রভু যে প্রভু, তাতে আমার কোনো সন্দেহ নেই।'

'কিন্তু এই রকম প্রতীক্ষায় প্রতীক্ষায় নিজেকে বঞ্চিত কোরো না শ্যাম। আজ মহাপ্রভুর বাষট্টিতম জন্মতিথি ছিল। অনেক নারী-পুরুষ মহাপ্রভুকে দর্শন করতে আর পুজো দিতে গিয়েছিল।'

'আর তুমিও নিশ্চয়ই একান্ন টাকা প্রণামী দিয়েছ! না দাওনি?'

'প্রণামী দিতেই হবে, এমন কোনো কথা নেই। ওটা ইচ্ছের ওপর নির্ভর করে। ভক্তির ব্যাপার।'

শ্যাম তার কাছে পড়ে থাকা খবরের কাগজটা তুলে নিলো, তারপর পাতা উল্টে একটা ছবি দেখিয়ে বলল, 'দেখো, এই মহাত্মাও ভারতের এক সাধক, দুঃখের বিষয়, এঁকেও দেবতাত্মা বলতে হবে। কারোর কাছ থেকে টাকাকড়ি নিতেন না, সেটাই তাঁর খ্যাতি ছিল, কিন্তু তার মানে, একশো দুশো টাকা প্রণামী নেওয়ার মতো সাধু ছিলেন না তিনি। গত বছর মধুপুরীতে শীত পড়লে যখন তিনি নীচে নেমে গেলেন, তখন তাঁর চেলা-চামুণ্ডারাই সোনা-চাঁদি আর নগদ মিলিয়ে এক লাখ টাকার মতো তাঁর হাতে তুলে দিয়েছিল।'

'আর তুমি বলছ, সেই দুঃখেই মহাত্মাকে এই এলাকা ছেড়ে পালাতে হলো!'

'না, আমি সে-কথা বলতে যাচ্ছিনে। আমি জানি মহাপ্রভুকে দর্শন করার জন্য দূর-দূরান্তর থেকে ভদ্রলোক-ভদ্রমহিলারা মধুপুরীতে ছুটে আসেন। দিল্লীর আই. সি. এস. পুরুষ-মহিলা পর্যন্ত চাঁদনি-চকে মালা তৈরি করে নিয়ে নিজেদের গাড়ি হাঁকিয়ে আজ নিশ্চয়ই মধুপুরীতে পৌঁছে গেছেন, তাতে সন্দেহ নেই। একটা সাধারণ মানুষও বোঝে যে মহাপ্রভুর যদি কোনো অলৌকিক ক্ষমতাই না থাকে, তবে এত সব সুশিক্ষিত সভ্য-ভব্য নরনারী সবাই কি গাঁজা টেনেছে!'

রমেশের মনে হলো যে শ্যামের মনোভাবে পরিবর্তন দেখা দিচ্ছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও দীর্ঘক্ষণ ধরে দু'জনে দুই পথে হাঁটছিল বলে যখন-তখন নমস্কার করার ঠাটটুকু থেকেই গেলো। মহাপ্রভুর জন্মোৎসবের বিষয়ে সবিস্তারে বলল রমেশ, সেখানে শ্যামের যাওয়ার সৌভাগ্য হয়নি বলে দুঃখ প্রকাশ করল। মহাপ্রভুকে

দর্শন করার জন্য রমেশ গত সাত-আট দিন সেখানে গেছে, রামের জীবনলীলা সম্পর্কে কিছু কিছু কথা শুনেছে সেখানেই, সে-সব কথা পুনরাবৃত্তি করার প্রয়োজন বোধ করল সে, যাতে শ্যামের ওপর আরও কিছু প্রভাব পড়ে।

সব শুনে শ্যাম বলল, 'কিন্তু রমেশ, তুমি রামায়ণের শুধু উত্তরাকাণ্ডই শুনেছ। সাত কাণ্ডের পুরোটা না শুনলে প্রভুচরিত্রের যথার্থ মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়।'

রমেশ সাগ্রহে জিজ্ঞেস করল, 'ও। দেখছি, মহাপ্রভু সম্বন্ধে আমার চেয়ে তুমিই অনেক বেশি জানো। বলো তাহলে!'

'হ্যাঁ, বালকাণ্ড থেকে উত্তরকাণ্ড পর্যন্ত পুরো প্রভুচরিত্রই জানি আমি। কিন্তু আজ বলা যাবে না, অন্য এক দিন হবে।'

'তাহলে বালকাণ্ডই হোক আজ।'

'এত ব্যস্ত হওয়ার কি আছে! আমি মহাপ্রভুচরিত্রের বালকাণ্ড থেকে শুরু করে শেষটুকু পর্যন্ত শোনাবো, কিন্তু আজ নয়। এই দেখো, মোলু চা নিয়ে এসেছে, ছুটো করে বিস্কুট আর চা খেয়ে আজ আমরা ছুটি নেবো।'

ছুই

রমেশ জানত, বিকেল চারটের পর শ্যামকে তার বাংলোয় আর পাওয়া যাবে না, এদিকে তার প্রভুচরিত্র শোনার আগ্রহও খুব। তাই পরদিন সকালবেলা চা খেয়েই সে শ্যামের বাংলোয় গিয়ে হাজির হলো। এই বাংলোতেই কেন সে একটা ঘর নিয়ে নেয়নি, এই ভেবে এখন তার আপসোস হচ্ছে। শ্যামের কাছে সে সংস্কৃত পড়তে চায়, প্রভুচরিত্র শোনার জন্যেও উৎসুক। চেয়ারে বসতেই শ্যাম জিজ্ঞেস করল, 'তাহলে সংস্কৃত পড়া শুরু হবে, না মহাপ্রভু-চরিত?'

রমেশ বলল, 'ছুটোই, তবে আগে প্রভুচরিত হলেই ভালো হয়।'

শ্যাম গম্ভীর মুখে নিজের হ্যাট খুলে সামনের একটা চেয়ারে রাখল। তারপর তুলসীদাসী রামায়ণের কথকেরা যেভাবে শুরু করে, ঠিক সেইভাবে 'কথা অরম্ভিত হতো হায়...'প্রভৃতি পঙ্‌ক্তিগুলোও দু'বার করে আউড়ে নিলো। রমেশকে অবাক হতে দেখে শ্যাম বলল, 'যেখানেই রাম সম্বন্ধে কিছু আলোচনা হয়, সেখানেই তা শোনার জন্যে হনুমানজী এসে হাজির হন। আমাদের গাঁ-ঘরের লোকেরা তাদের চাদর কিংবা পাগড়ি পাকিয়ে হনুমানজীকে আসন পেতে দেয়, আমার তোমার মতো হ্যাট-কোটধারীদের কাছে সে-সব জিনিস কোথায়! সেজন্য আমি হ্যাটটাকেই হনুমানজীর আসনের জন্য পেতে দিলাম। কিন্তু একটা কথা বলি রমেশ, প্রভু-চরিত তো 'হরিকথা অনন্ত' তাই আসল কাহিনীতে পৌঁছতে কতখানি সময় লাগবে, সেটা আমার পক্ষে এখনই বলা সম্ভব নয়। বুঝবার সুবিধের জন্যে আমি প্রথমে ক্ষেপক অর্থাৎ শাখা-কাহিনী শুরু করছি—

'ভারতের যে কোনো জায়গা থেকেই কাশী খুব কাছে নয়। সেজন্তে সমস্ত ব্রাহ্মণ-সন্তানেরই কাশীর সুযোগ-সুবিধা পাওয়া সম্ভব হয় না। অবশ্য প্রত্যেক রাজ্যেই ছোট বড় কাশী রয়েছে, সেখানে দরিদ্র ব্রাহ্মণ-সন্তান ছাত্রাবাসে ডাল-ভাত খেয়ে পাঠশালায় মুফতে সংস্কৃত শিখতে পারে। আপনারা তো জানেনই, ইংরেজি হলো অর্থকরী বিদ্যা, কিন্তু তার জন্তে মাইনে, বইপত্র আর শহরে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা বড়লোকদেরই সামর্থ্যে কুলোয়। অন্ত জাতের লোক গরিব হলে পড়াশোনার কথা ভাবতেই পারে না, কিন্তু পূর্বপুরুষদের বৃত্তির কথা বিবেচনা করে আমাদের ব্রাহ্মণ-সন্তানদের পক্ষে কম-সে-কম সংস্কৃত পড়তে শেখাটা স্বাভাবিক। টীকারাম এমনই এগারো-বারো বছরের এক গরিব ব্রাহ্মণ-সন্তান। কোনো যজমানের বাড়িতে ভোজ থাকলে তবেই সেদিন ভরপেট খাবার জুটত তার। টীকারামদের পরিবারটা তো ব্রাহ্মণ পরিবার, কিন্তু সাতপুরুষ থেকে সরস্বতীর সঙ্গে তাদের ভাশুর-ভাদ্রবৌ সম্পর্ক। এমনিতে সম্ভ্রান্ত পুরোহিত তারা, তাতে অশিক্ষিতই হোক আর সুশিক্ষিতই হোক, যজমান তো আর তাদের পরিত্যাগ করতে পারে না! টীকারামের দুর্ভাগ্য, যে ক'জন যজমান, পুরোহিতের সংখ্যা তার চেয়ে বেশি, আবার যজমান যে খুব বড়লোক, তা-ও নয়। যখন টীকারাম সেখানকার ছোট-কাশী শিবপুরে এলো, তখন তার জামা-কাপড় যেমন ময়লা, তেমনি ছেঁড়া-ফাটা। রঙে গড়নে তার চেহারাটা ভালোই, কিন্তু গায়ে মাস না থাকলে শুধু হাড্ডিতে কি আর রূপ খোলে? তার এক দূরসম্পর্কের জ্ঞাতি কয়েক বছর ধরে শিবপুরে পড়াশোনা করছিল। তার নাম জিজ্ঞেস করতে করতে একদিন সে তার ডেরায় গিয়ে হাজির হলো। জ্ঞাতি ছাত্রটি সেই দিনই খবর পেয়েছিল যে তাদের ছাত্রাবাসেই একটা সীট খালি আছে। টীকারামের সৌভাগ্য বলতে হবে, সেখানে আসতেই তার ভাত-রুটির ব্যবস্থা হয়ে গেলো।

'একখানা লঘুকৌমুদীও জুটে গেলো টীকারামের। পড়ার কায়দাটা পুরনো ঢঙে, অর্থাৎ প্রথমে দু-এক বছর অর্থ বোঝার চেষ্টা না করে বইটার আগাপাস্তলা শুধু আওড়ে যেতে হবে। কোনো কোনো ছাত্র অমরকোষও মুখস্ত করতে লেগেছিল, কিন্তু টীকারাম তার জন্ত লঘুকৌমুদীই যথেষ্ট বলে ভাবল। গাঁয়েই অক্ষর-পরিচয় হয়েছিল। গাঁয়ের প্রাইমারী স্কুলে সে এক বছরের বেশি পড়েনি, আর যেটুকু শিখেছিল, দু-তিন বছর রাখালী করতে করতে তা-ও বেমালুম ভুলে গিয়েছিল। জ্ঞাতি ছাত্রটির সাহায্যে আবার সে অক্ষরগুলো চিনে নিলো, কিন্তু লঘুকৌমুদী পড়বার মতো বিদ্যেটা দু'মাসের আগে সম্ভব হলো না। তাকে মঙ্গলাচরণ শ্লোকটা পড়িয়ে দেওয়া হলো, ফের কয়েক হপ্তা বাদে অ ই উণ্… । টীকারামের তেমন কোনো তাড়াহুড়ো ছিল না।

'তিন-চার মাস কাটতে কাটতে তার হাড্ডিতে মাস লাগল, চর্বির পরিমাণও বাড়ল একটু। ছাত্রাবাসে দু'বেলা ভরপেট মুলকো রুটি আর ডাল জোটে, মাঝে

মাঝে ব্রাহ্মণ-ভোজনে যাওয়ার সুযোগ হয়। সাধারণ ভোজ হলেও হালুয়া-পুরী তো হবেই, নইলে মালপোয়া, লাড্ডু এবং অন্যান্য মিষ্টিও। কয়েক বছর ধরে শহরে রয়েছে এমন ছাত্র-বন্ধুও ইদানীং জুটে গেছে তার, ফলে শহর তার কাছে আর অচেনা নয়। আগে তো খুঁজে খুঁজে এর-ওর সঙ্গে পরিচয় করতেই তার সারাদিন কাটত। এভাবে ছ'মাস কাটতে কাটতে যখন তার জ্ঞাতি ছাত্রটি উঁচুতে পড়াশোনার জন্যে কাশী চলে গেলো, তখন টীকারাম স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল, কারণ সে টীকাকে পড়ার জন্যে বড্ড বিরক্ত করত। ছ'মাসে টীকারাম পঞ্চ-সন্ধিতে এসে পৌঁছল, কিন্তু তার মানে এই নয় যে লঘুকৌমুদীর তিন-চার পৃষ্ঠা তার কণ্ঠস্থ। এখন সে লঘুকৌমুদীটাকে তাকে তুলে দিয়ে মাঝে মাঝে সেদিকে হাত জোড় করে। ভালো-মন্দ নানা-রকম লোকের সঙ্গেই তার পরিচয় হয়েছিল, তাই আসলে তার সময়েরই অভাব। বছর ঘুরতে ঘুরতে ছাত্রাবাসেরও পরোয়া রইল না তার। মাসে পনেরো-বিশ দিন অবশ্যই ভোজের নেমন্তন্ন জুটে যায়। ভোজে যাওয়ার আগের দিন সিদ্ধি ঘোঁটে, তারপর খিদে বাড়িয়ে সঙ্গী-সাথীদের মতো টীকারামও কপালে ভস্ম-তিলক লাগিয়ে সাদা ধুতি-জামা পরে ভোজে গিয়ে হাজির হয়। আর বলতে গেলে, ভোজের দিন সত্যি-সত্যিই টীকারামের এতটুকু সময় হয় না।'

রমেশ মাঝখানে ফোড়ন কাটল, 'তার মানে, টীকারাম বিদ্যাতে আনাড়িই রয়ে গেলো!'

শ্যাম জবাব দিলো, 'যদি বিদ্যা বলতে তোমার ঐ কেতাবী জ্ঞান হয়, তবে অবশ্য সে আনাড়িই রয়ে গেলো। কিন্তু আমি শুধু কেতাবী বিদ্যাকেই বিদ্যা বলে মনে করিনে। এমন একদিন ছিল, যখন আমাদের মুনি-ঋষিরা বইয়ের নামই জানতেন না, গুরুর মুখে জ্ঞানগর্ভ বাণী শুনেই পণ্ডিত হতেন।'

'তার মানে তুমি বলতে চাইছ, টীকারাম শুনে শুনেই পণ্ডিত হতে লাগল।'

'খানিকটা তাই। তবে নিশ্চয়ই তোমার জানা আছে যে বিদ্যাও অনেক রকমের। টীকারাম যে-বিদ্যা শেখার জন্য সবচেয়ে বেশি মনোযোগ দিলো, তা হলো শহরের এক সভ্য-ভব্য যুবকের চাল-চলন, কথাবার্তা বলার ঢঙ। এমনিতেই ব্রহ্মা টীকারামকে বুদ্ধি দেওয়ার সময় তো খানিকটা কার্পণ্য করেছিলেনই, কিন্তু তার ব্যবহারিক বুদ্ধির অভাব ছিল না। শিবপুরে দু'বছর কাটিয়ে সে আরও বেশি চালাক-চতুর হয়ে উঠল। বইপত্র না পড়লেও লোকের কাছে শুনে শুনে আর তাদের দেখে দেখে সে অনেক কিছুই শিখে নিচ্ছিল।

'এভাবেই টীকারামের ছ-সাত বছর কাটল। আঠারো বছরের যুবক হয়ে উঠল সে। লঘুকৌমুদী তখনও আগের মতোই তাকে দিন গুনছে। পঞ্চ-সন্ধির পরে সে আর এগোনোর চেষ্টা করেনি, বইটা খুলে দেখলেই সেটা বোঝা যায়। বইয়ের শুরুতেই চার-পাঁচটি পাতা বার বার হাত দিয়ে নাড়াচাড়া করার ফলে ময়লা হয়েছে, ছিঁড়ে গেছে, কিন্তু বাকি পাতাগুলো এখনও দেখে মনে হবে, একেবারে

নতুন। শিবপুরে থাকার ফলে অবশ্য টীকারামের একটা উপকার হয়েছে হিন্দী গল্পের বইও সে মাঝে মাঝে পড়তে শুরু করেছে। বুদ্ধি যতই ভোঁতা হোক, আমি বলব, টীকারাম যদি একটু মেহনত করার চেষ্টা করত, তাহলে সে অতোটা মূর্খ থাকত না। আগে আর্যসমাজ ও সনাতন ধর্মের বক্তৃতা শুনতে যাওয়ার ঝোঁক ছিল তার। শিবপুরের বিভিন্ন ধর্মের লোকজনের মধ্যে শাস্ত্র আলোচনা হয়, সে-সব জায়গায় টীকারামের উপস্থিতি অনিবার্য। এসব দিক দিয়ে বিচার করলে বলা যায়, সংস্কৃত শিক্ষায় বঞ্চিত থাকলেও কিংবা অন্যান্য বিষয়ের বইপত্রে জ্ঞান না থাকলেও, টীকারামের জ্ঞানের জগৎ খুব সঙ্কীর্ণ নয়। পড়াশোনায় ঢিলেমী দেখানোর জন্যে যখন কোনো বন্ধু হাসি-ঠাট্টা করে, তখন সে বলে, আমি ভাই ঋষিদের পথ অবলম্বন করে শুধু কানে শুনেই জ্ঞানার্জন করাটাকে বেছে নিয়েছি।

'এইভাবেই টীকারামের সময় কাটছিল। বাল্যকাল কেটে গিয়ে যৌবনে পা দিয়েছে। খাওয়া-পরার চিন্তা নেই, হাতও কখনও খালি থাকে না। ব্রাহ্মণ ভোজনে দক্ষিণা মেলে, কখনো কখনো কারোর বাড়িতে পুজো-অর্চনা করতে গেলে তাতেও কিছু-না-কিছু এসে যায়। পয়সা খরচ করার ব্যাপারে সে খুব হিসেবী, তাই তার কাছে কিছু-কিছু করে পয়সা জমছিল, বিন্দু বিন্দু করে প্রায় শ'খানেক টাকায় এসে পৌঁছল।'

শ্যাম রমেশকে টীকারামের ছাত্রজীবনের গল্প শোনালো। সেদিনকার মতো বৈঠক এখানেই শেষ হলো।

তিন

দু'দিন বাদে ফের রমেশ এলে শ্যাম ঠিক করল যে আজ সে টীকারামের জীবন-কথা শেষ করবে। বলতে শুরু করল সে, 'টীকারামের বয়স এখন পঁচিশ বছর। এখন তাঁকে সবাই পণ্ডিত টীকারাম বলে। শহরের অনেক বাড়িতেই তিনি সুপরিচিত। বাড়ির মেয়েরা তাঁকে জবরদস্ত পণ্ডিত বলেই ভাবে। মধুর কণ্ঠে তিনি সংস্কৃত শ্লোক পাঠ করেন, ব্যাখ্যা করাটা এমন কিছু কঠিন নয়, কারণ টীকা-ভাষ্য সহ অনেক বই বাজারে পাওয়া যায়। টীকারাম চাইলে এভাবেই নিজের জীবন কাটিয়ে দিতে পারতেন। তাঁকে খাওয়া-পরার জন্যে ভাবতে হতো না, টাকা-কড়িও আরও বেশি রোজগার হতো, কিন্তু পঁচিশ বছর বয়েসে তাঁর মনে মনে অনুশোচনা হতে লাগল, 'আমি কিছুই পড়লাম না! কতদিন এভাবে খেয়ে বেড়াব!' তিনি একজন মনস্বী যুবক, ছোট-খাটো সফলতায় সন্তুষ্ট হওয়ার লোক নন তিনি। ভেবে দেখলেন, তাঁর চোখের সামনে কত জন শাস্ত্রী আচার্য হয়ে গেছে, কেউ কেউ তো সেই সঙ্গে এম. এ., এম. ও. এল. পাস করে কলেজের প্রফেসরও হয়েছে, যথেষ্ট মান মর্যাদা তাদের। বেতনটাও ভালো, পরে আরও বাড়বার সম্ভাবনা। টীকারামের

পক্ষে আর ওসব সম্ভব নয়, কিন্তু তাঁর বাস্তব-বুদ্ধির সবাই প্রশংসা করে। তিনি খুব চালাক-চতুর, অবশ্য তা খারাপ অর্থে নয়। আত্মবিশ্বাসের অভাব ছিল না তাঁর। তিনি মনে মনে ভাবেন, 'সরস্বতীও লক্ষ্মীর বাড়িতে গিয়ে ঝি খাটে। যদি কোনো রকমে লক্ষ্মীর সাধনায় সফল হওয়া যায়, তাহলে আমার ঘাটতিটুকু পূরণ করে নিতে অসুবিধে হবে না।'

'টীকারাম ভাবভঙ্গিটা ভালোই জানেন। তাঁর কথাবার্তা লোকে মুগ্ধ হয়ে শোনে। শিবপুরের পথে-ঘাটে তিনি হর-হামেশা ওষুধ বিক্রতাদের দেখেন, তাদের ভাবভঙ্গি আর কথা বলার ঢঙে মুগ্ধ হয়ে পঁচিশ-পঞ্চাশ জন লোক জড়ো হয়ে যায়, অমনি সে তার ওষুধের প্রশংসা করতে করতে বলতে শুরু করে, 'চোখের অব্যর্থ ওষুধ। যদি উপকার না হয়, এক মাসের মধ্যে যখন ইচ্ছে পয়সা ফেরত নিয়ে যাবেন!' ভিড়ের ভেতর থেকে শেখানো-পড়ানো দু-একজন লোক এগিয়ে এসে বলে, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনার ওষুধে দারুণ কাজ হয়েছে, দিন তো আর দু'শিশি।' সে নিজেও অনেকের চোখে ওষুধ লাগিয়ে দেয়। দু-এক ঘণ্টায় দু-চার টাকার ওষুধ বিক্রি করাটা মামুলী ব্যাপার। টীকারাম এ রকম ওষুধের ফেরিওয়ালাদের প্রায়ই দেখেন। তাঁর বিশ্বাস, ও কাজে নামলে তিনি কম কৃতিত্ব দেখাবেন না। কিন্তু পরমুহূর্তেই ভাবনা হয়, ওদের মান-সম্মান বলে কি কিছু আছে? পয়সাটাও এমন কিছু বেশি না। তখন তিনি অন্য ওষুধ বিক্রেতাদের কথা ভাবতে শুরু করলেন। টীকারামের শিবপুর আসার হয়ত কিছুদিন আগে থেকে তারা কাজ শুরু করেছিল, আর এখন তারা লক্ষপতি। টীকারাম ভেবে দেখলেন, এ রকম লক্ষপতি ওষুধ বিক্রেতা হতে গেলে আয়ুর্বেদশাস্ত্র পড়া দরকার। ধুলো-বালিও যদি শিশিতে পুরে হাজারে হাজারে বিক্রি করা হয়, তবু পঞ্চাশ একশো রোগী আপনা আপনিই সেরে যাবে, কিন্তু তার ফলে পেটেন্ট ওষুধের অব্যর্থ গুণের কথাটাই ছড়িয়ে পড়বে চারদিকে। অবশ্য ধুলো-বালি শিশিতে পুরে বিক্রি করার দরকার হবে না টীকারামের। কারণ যেসব সাধু-সন্ন্যাসীদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করেন তিনি, তাঁদের কাছ থেকেই দু-একটা ওষুধ শিখে ফেলেছেন, মাসে মাসে তিনি তাঁর শিষ্যদের তা বাতলেও দেন। কিন্তু ওষুধ বিক্রি করার জন্য একটা কোম্পানী খোলা সোজা নয়। শুরুতে বিজ্ঞাপনেই অনেক টাকা পয়সা ঢালতে হবে। বিশ বছর আগে শুরু করলে সম্ভবত এত খরচ পড়ত না। আজকাল বাজারে এতসব ওষুধপত্তর বেরিয়েছে, সে-সবের মোকাবিলা করে সামনে এগোনো অঢেল টাকা পয়সার জোরেই সম্ভব। শেষ পর্যন্ত এ পথটাও টীকারামের পছন্দ হলো না।

'তাহলে হঠাৎ বড়লোক হওয়ার উপায় কি, ভাবতে ভাবতে টীকারামের খেয়াল হলো, কোনো জগদ্গুরু কিংবা মোহন্তের শিষ্য হওয়ার কথা। কিন্তু জগদ্গুরু হওয়া সম্ভব নয়, কারণ বিদ্যে নেই তাঁর, আর বিদ্যে থাকলেও জগদ্গুরুর

চেলা তো কম থাকে না, কার দান পড়ে বলা যায় না। জীবন নিয়ে জুয়া খেলতে রাজী নন টীকারাম। এমনিতে গড়নপিটনে তিনি মোহন্ত হওয়ার উপযুক্ত। শিবপুরেও টাকা-পয়সাওয়ালা মঠের অভাব নেই, সে-সব মঠের উত্তরাধিকারীরাও যে খুব লেখাপড়া জানে, তাও নয়, কিন্তু মোহন্ত হওয়ার জন্যে কোনো মোহন্তের ভাই-ভাইপো-ভাগনে হওয়া দরকার, কিংবা অন্য কোনোভাবে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলা দরকার। টীকারাম যদি কয়েক বছর আগে এ ব্যাপারে চেষ্টা চালাতেন, তাহলে হয়ত সফলও হতেন। কিন্তু এখন ব্যাপারটা অতো সোজা নয়।

'মোহন্ত আর জগদ্‌গুরুর আসনের কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ একটা উপায়ের কথা তাঁর মাথায় এলো, অমনি চোখ দুটো চকচক করে উঠল তাঁর। চুটকি বাজাতে বাজাতে বলে উঠলেন, হ্যাঁ, এই হলো আমার কাজ। আমি কারোর চেলা হতে যাব কেন, অপরের দয়া ভিক্ষে করে বেড়াব কেন! আমাদের দেশে ভক্তিমান লোকের অভাব নেই। অলিগলিতে ভক্তি গড়াগড়ি যাচ্ছে। অধিকাংশ লোকই ভক্তিপরায়ণ। ঐ ভক্তিকেই কাজে লাগাতে হবে। তা আমি পারব। অত খরচপত্তরের প্রয়োজন নেই। আমি গুরু হতে পারি। সাধক হতে পারি। অভিনেতা রঙ মেখে দু-তিন ঘণ্টা অভিনয় করে, সাধু-সন্ন্যাসী হওয়ার জন্যে প্রায় চব্বিশ ঘণ্টাই অভিনয় করতে হয়, অবশ্যই কঠিন কাজ সন্দেহ নেই, কিন্তু আমার পক্ষে অসাধ্য নয়।

'টীকারাম বেশ বাকপটু, টীকা-ভাষ্যের সঙ্গে নুন লঙ্কা ছড়িয়ে দিয়ে দারুণ আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে কথা শোনাতে পারেন। নিতান্তই যোগাযোগের অভাবে তিনি আর্যসমাজ বা সনাতন ধর্মের উপদেশক হয়ে ওঠেননি বলা যায়, নইলে তিনি শুধু একজন বিখ্যাত উপদেশকই নন, এমন কি মহামহোপদেশকও হয়ে যেতেন। হয়ত এখনও সে সুযোগ চিরকালের জন্য তাঁর হাত-ছাড়া হয়ে যায়নি, কিন্তু সাধু-সন্ন্যাসী হওয়ার চিন্তা যখন মাথায় এসেছে, তখন ও সব তুচ্ছ মনে হলো তাঁর কাছে।'

চার

'হরিদ্বারে গঙ্গাখালের ধারে ধারে এক গেরুয়াধারী সন্ন্যাসী হেঁটে চলেছেন। গৌরবর্ণ, সুদর্শন চেহারার যুবক। সঙ্গে তিনজন লোক রয়েছে। একজনের হাতে সোনালী জরিদার রেশমের ছাতা, দ্বিতীয় জনের হাতে কার্পেটের সুন্দর একটি আসন, তৃতীয় ব্যক্তির হাতে গঙ্গা-যমুনার চমরী গরুর চামর। সন্ধ্যা পাঁচটা কি ছ'টা। ওঁরা একটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জায়গায় এসে দাঁড়ালেন। আসনওয়ালা আসন পেতে দিলেন। সন্ন্যাসী তাতে পদ্মাসনে বসে পড়লেন। ছত্রধারী তাঁর

মাথার ওপর ছাতা ধরল আর অপর ব্যক্তি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চামর দোলাতে লাগল। তিন-চারজন ভক্তও জুটল। কিছুক্ষণের মধ্যেই আরও দশ-পনেরো জন মেয়ে-পুরুষ এসে হাজির হলো। জায়গাটা এমন সাফ-সুতরো যে কারোর কাপড়-চোপড় নোংরা হওয়ার ভয় নেই। প্রথম থেকেই ধর্মচর্চা শুরু হয়ে গেলো, তা থেকে কেউ-ই নিজেকে বঞ্চিত করতে রাজী নয়। সন্ন্যাসীর চেহারাটা যেমন সুদর্শন আর জ্যোতিসম্পন্ন, তেমনি তাঁর মুখ থেকে যেন অমৃত ঝরে পড়ছে। কণ্ঠস্বরে যেমন বিনয়, তার চেয়েও অধিক মাধুর্য। এই প্রথম মহাপুরুষকে এখানে দেখে অনেকের মনেই নানারকম প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, বিশেষ করে তিনি তাঁর বাণীর মাধুর্যে প্রত্যেককেই একান্ত আপনজন করে নিয়েছেন। একজন জিজ্ঞেস করল, 'মহারাজ, এই প্রথম আপনার দর্শন-লাভের সুযোগ পেলাম! জিজ্ঞেস করছি, সেজন্য মাফ করবেন, মহাশয় কোত্থেকে আসছেন?'

'সন্ন্যাসী জবাব দিলেন, 'এই শরীর সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করছ বাছা। এ-শরীর তো এমনিই চলা-ফেরা করে বেড়ায়। এর নাম মায়া। এ-শরীরে কি আছে!'

'প্রশ্নকর্তার নিজের প্রশ্নটাকেই অযৌক্তিক মনে হতে লাগল। কাছে বসে থাকা অন্য শ্রোতাদেরও মনে হলো যে লোকটা সাধুবাবার অমৃত বিতরণে বিঘ্ন ঘটাচ্ছে। প্রায় এক মাস ধরে সাধুবাবা হরিদ্বারে থেকে এই রকম অমৃত বর্ষণ করে গেলেন। তাঁর সব সময় গঙ্গাখালের পাড় বরাবর যাওয়ার দরকার হয় না। মাঝে মাঝে তিনি কোনো বাগানে কিংবা গঙ্গার অন্য দিক দিয়েও চলে যান। আট-দশ দিনের মধ্যেই হরিদ্বারে আসা ভক্তিমান লোকজনের কাছে মহাপুরুষের সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। ফলে তিনি যেখানেই যান, সেখানেই তাঁকে চারদিকে ঘিরে ধরে। কিংখাবের ছাতা, রূপোলী, সোনালী চামর আর দামী দামী আসনের সঙ্গে কখনো মিহি সুতী, কখনো বা রেশমী গেরুয়া বস্ত্র দেখে কারোর কারোর কাছে সে-সব বিলাসিতা বলে মনে হয়, কিন্তু সন্ন্যাসী ভালো করেই জানেন, এইসব শ্রদ্ধা ভক্তিহীন লোকজনের এ রকম মনে করায় তাঁর কিছুই যায় আসে না। ভক্তিমানেরা এটাই বোঝে যে সাধু-সন্ন্যাসীরা 'বহু রূপে বিরাজ' করেন।

'সন্ন্যাসী এভাবে দেশের বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে বেড়ান। তাঁর অনুচরেরা ছত্র-চামর আসন আর সেই সঙ্গে রান্নাবাড়ার আয়োজন সামগ্রী নিয়ে তাঁর সঙ্গে থাকে। যে-কোনো কাজ শুরু করতে গেলেই কিছু পুঁজির দরকার, আর তাঁর যে-টুকু পুঁজির দরকার, সেটুকু রয়েছেই। ভক্তের হৃদয় উদ্বেলিত করতে পারলে টাকাকড়ির কি অভাব হয়? এরূপ এক নিরবচ্ছিন্ন অভিনয় চালিয়ে যেতে লাগলেন তিনি। কয়েক বছরের মধ্যেই তাঁর চারপাশে নারী-পুরুষের ভালো সংখ্যক এক শিষ্যমণ্ডলী জড়ো হলো। তিনি বিশুদ্ধ সৎসঙ্গদানকারী সন্ন্যাসী অর্থাৎ তুক-তাক কিংবা জড়ি-বুটির কারবার করেন না। কারোর ভাগ্যবিচার করেন না তিনি, অবশ্য অনেক সময় তিনি এমনিই যে সব কথাবার্তা বলেন, তাই

শিষ্যরা অভ্রান্ত বলে ধরে নিতে লাগল। তাদের কাছে তিনি হয়ে উঠলেন

'সন্ন্যাসী শুধু ভক্তি নন, জ্ঞানমার্গেও আস্থাশীল ব্রহ্মচারী। কেবল নিশ্চল দাসের কথাতেই নয়, এমনকি তাঁর শিষ্যমণ্ডলীরও বিশ্বাস, 'যেহেতু শব্দই ব্রহ্ম, অতএব ব্রহ্মবিদ্‌ই ব্রহ্মরূপ' কথাটি মহাপ্রভুর ক্ষেত্রে প্রযুক্ত। বলা বাহুল্য, মহাত্মা ব্রহ্মনাথ —মহাপ্রভু আজকাল ঐ নামেই প্রসিদ্ধ —নিশ্চলদাসের 'বিচার সাগর' আর কালীকমলীওয়ালার 'অনুভব প্রকাশ'-এর মতো বইপত্র দেখে দেখে বেদান্তে বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠেছেন। তাঁর শিষ্যরা সব সময় হয় তাঁকে চোখ বুজে ব্রহ্মলীন হয়ে থাকতে, না-হয় ভক্তদের উপদেশ দিতে দেখে। তাঁর বাণীতে মহাপুরুষের জাদু রয়েছে। আসলে জাদু হচ্ছে তাঁর অসামান্য মধুর কণ্ঠস্বর এবং কথা বলার ভঙ্গিটাই। শিষ্যদের মনে হয়, বাণী থেকে ব্রহ্ম নির্গত হচ্ছেন। যদিও তিনি নিজের ব্যাপারে 'এই শরীরে কি আছে' বলে বেমালুম উড়িয়ে দেন, কিন্তু তাঁর ভক্তদের পরিবারের প্রত্যেকের নাম তাঁর মুখস্ত। বহুদিন পরে দেখা করলেও মহাপ্রভু যখন তাঁদের বাড়ির এক-একজনের নাম উল্লেখ করে কুশল জিজ্ঞেস করেন, তখন লোকে ভেবে অবাক হয়। এমন তীক্ষ্ণ স্মরণশক্তির কথা বিবেচনা করলে সন্দেহ থাকে না যে, মহাপ্রভু যদি একটু মেহনত করতে চাইতেন, তাহলে লঘু-কৌমুদীর পঞ্চসন্ধিতে পৌঁছেই তাঁর আটকে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকত না।

মহাপ্রভু আজকাল দু-তিনটি শহরেই বেশির ভাগ সময় কাটান, সেখানে ভক্তরা সব সময় তাঁর মুখপদ্ম থেকে অমৃত পান করে থাকে। বহু সৎসঙ্গকামী তাঁকে সর্বদা ঘিরে থাকে, তিনিও তাদের কৃতার্থ করতে ত্রুটি করেন না।'

পাঁচ

শ্যামের কথাবার্তায় রমেশ বুঝে ফেলেছিল যে, গাঁয়ের সেই এগারো-বারো বছরের ব্রাহ্মণ-সন্তান, যে ছেঁড়া-ফাটা ময়লা জামা-কাপড় পরে শিবপুর গিয়েছিল, সেই হলো শ্যামের মহাপ্রভু। তাঁর সম্বন্ধে শ্যাম যে-সব কথা বলল, তাতে রমেশের মনে ভক্তির অভাব দেখা দিলো না। বস্তুতপক্ষে ভক্তি এমন এক দুর্ভেদ্য বর্ম, তাতে যুক্তি-বুদ্ধির শরক্ষেপণ করলেও তা বিদ্ধ করা সম্ভব নয়। সে এখন শ্যামের কাছে সংস্কৃত পড়তে শুরু করেছে, যাতে সম্পূর্ণ প্রভুচরিত বুঝতে কোনো অসুবিধে না হয়।

শ্যাম তার উপাখ্যানের শেষ কাণ্ডটি সমাপ্ত করল এইভাবে—

'নারী-পুরুষ মিলে মহাপ্রভুর শিষ্যমণ্ডলী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা যুবক-যুবতী সবাই তাঁর শিষ্য। একমেবাদ্বিতীয়ম্ ব্রহ্ম সম্পর্কে উপদেশ দিতে দিতে তিনি বলেন, 'আমি এবং আমার, তুই এবং তোর —এই ধারণার নামই অজ্ঞান। ব্রহ্ম পুরুষও নন,

নারীও নন, তিনি এক। ধর্ম-কর্ম সবই মায়া, ব্রহ্মার তাতে কিছুই যায় আসে না, কারণ তিনি নির্লিপ্ত।' অর্ধনিমিলিত চোখে মহাপ্রভু এক একটি অক্ষর নিক্তির ওজনে মেপে যখন বলেন, তখন শ্রোতারা মুগ্ধ হয়ে যায়। এই শ্রোতাদের মধ্যেই করমা নামে এক যুবতী ছিল—যুবতী ঠিক বলা যায় না, একটু প্রৌঢ়াই বলা যেতে পারে। সে তার ধনাঢ্য পরিবারের লোকজনের সঙ্গে মহাপ্রভুর শিষ্যদলে যোগ দিয়েছিল। কয়েক বছর ধরে উপদেশ শুনে আসছিল। তার হৃদয়ে ছিল অগাধ ভক্তি। ধীরে ধীরে তার প্রতি মহাপুরুষের ব্যবহার অত্যন্ত মধুর হয়ে উঠতে লাগল, করমা সেটাকে ঈশ্বরের অনুগ্রহ বলেই মনে করতে লাগল। কিন্তু নারী-পুরুষের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, তা সেটা ব্রহ্মজ্ঞান উপলক্ষ করেই হোক কিংবা আর কিছু, শেষ পর্যন্ত তা নারী-পুরুষের স্বাভাবিক সম্পর্কে পরিণত না হয়ে যায় না। যদি করমা সেটা বুঝতে পারত, তাহলে হয়ত সে মহাপুরুষকে এতো ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলতে দিত না। কিন্তু সে-ও তো একজন সাধারণ স্ত্রীলোক। মহাপ্রভু জানতেন যে ভক্ত শিষ্যরা তাঁকে যথার্থই ভগবান বলে মেনে নিয়েছে এবং ভগবানের ব্যাপারে তারা তাদের অন্তরের সেই সুদৃঢ় ভক্তিকে বিসর্জন দিতে পারে না। কিন্তু করমার সঙ্গে গুপ্ত প্রেম চালিয়ে যাওয়াটা ভালো বলে মনে হলো না তাঁর। করমাও তাতে রাজী নয়। সাধু-সন্ত দেবগুরুরা শক্তির আরাধনা করে থাকেন, মহাপ্রভুর সামনে এ রকম অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। ঠিক সেই রকম করমাও একদিন মহাপ্রভুর শক্তিতে পরিণত হলো। মহাপ্রভু যখন তাঁর শিষ্যদের একটি পৌরাণিক উপাখ্যান শুনিয়ে তাঁর আর করমার যুগ-যুগ সম্পর্কের কথা বললেন, তখন তাদের ভক্তি বেড়ে গেলো আরও। সেই থেকে শিষ্যদের চোখে করমাও পূজনীয়া ভগবতী হয়ে উঠল। তারও চরণ স্পর্শ করতে লাগল তারা। ইংরেজি পড়া বড় বড় অফিসার এবং তাদের স্ত্রীরাও তাকে 'হার হোলিনেস্' বলে ডাকতে শুরু করল। মায়াময় সংসারে এক দুই এবং দুই চার তো হতেই থাকে। মহাপ্রভু ও তাঁর শক্তি গণেশ-কার্তিকের মতো দুটি পুত্র লাভ করলেন। মহাপ্রভু স্বয়ং তাদের হৃদয়প্রিয় বলে ডাকতে শুরু করলেন, সেই নামেই সকলের কাছে পরিচিত হয়ে উঠল তারা।

'ভারতের সমগ্র হিন্দী-ভাষী অঞ্চলের বড় বড় শহরেই মহাপ্রভুর ভক্ত রয়েছে— পুরনো চিন্তা-ভাবনার লোক কম, নব্যশিক্ষিত বাবু আর শেঠরাই সংখ্যায় বেশি। এখন আর তিনজন অনুচরেই তাঁর কাজ চলে না। সঙ্গে ভজনের ওপর লোক থাকে। নিজস্ব গাড়ি আছে, ভালো ইংরেজি জানা প্রাইভেট সেক্রেটারী আছে। সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন না দিয়েও তাঁর প্রচার চলে পুরোদমে।'

তারপর শ্যাম তার সাম্প্রতিক ঘটনার কথা বলে উপাখ্যান শেষ করল।

'প্রাইভেট সেক্রেটারীর কাজ হলো মধুপুরীর প্রত্যেকের কাছে ছাপানো নিমন্ত্রণ পত্র পাঠিয়ে দেওয়া, তা তারা জন্ম-জয়ন্তীর খবর জানুক আর না জানুক। ভক্তদের

সঙ্গে অপরিচিত ভদ্রলোকদের কারোর কারোর সেখানে গিয়ে হাজির হয়ে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। এইভাবেই রাজ্যের রাজধানীর এক কলেজের প্রিন্সিপ্যালও সেখানে গিয়ে হাজির হলেন। শিষ্টাচার দেখে মহাপ্রভু বুঝলেন যে, ইনিও তাঁর ভক্ত হয়ে উঠেছেন। কিছুদিন পর প্রিন্সিপ্যাল মহাশয়ের কাছে প্রাইভেট সেক্রেটারীর একটি চিঠি এসে পৌঁছল —মহাপ্রভু আপনার প্রতি অসীম করুণাবশত তাঁর হৃদয়প্রিয় এবং হার হোলিনেস্ সহ আপনার গৃহে পদার্পণ করতে সম্মত হয়েছেন। প্রায় বারোজন সঙ্গে থাকবে। তার যথাযথ স্বাগত-সংকারের কথা আপনি নিশ্চয়ই জানেন, আর এ-ও জানেন যে পূজা-অর্চনায় তাঁর আগ্রহ নেই, তিনি তাঁর আপন শ্রদ্ধা-ভক্তির ওপরেই নির্ভর করেন।

'প্রিন্সিপ্যাল মহাশয়ের ব্যাপারটা খুব ভালো লাগল না, কিন্তু যখন দেখলেন যে তাঁর ছাত্রদের মধ্যে কয়েকজন কোটিপতি শেঠের ছেলেও রয়েছে, তাদের বাড়িতে সন্ন্যাসীর পুজো-পাট হয়ে থাকে, তখন তিনি স্বাগত আহ্বান জানিয়ে বসলেন। মহাপ্রভু একদিন সদলবলে সেখানে এসে হাজির হলেন। হয়ত মামুলী গোছের স্বাগত-সংকার হতো তাঁর, কিন্তু তাঁর মুখ থেকে যখন অমৃত ঝরে পড়তে লাগল, তখন দেখা গেলো, সেই শহরেও ভক্তিমান লোকের অভাব নেই।'

মহাপ্রভুচরিত শুনে রমেশের মনে দোটানা দেখা দিলো ঠিকই, কিন্তু ভক্তিমান ব্যক্তির কাছে বেশিদিন কাটানোর সুযোগ হয়নি তার।

লিপস্টিক

'কুঞ্জার বউটাকে দেখেছ তুমি ?'

দুই বুড়ি একটু জিরিয়ে নিতে বসেছিল, একজন আরেক জনকে জিজ্ঞেস করল। মধুপুরী অনেক দূর জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা শহর, বাজার ছাড়িয়ে বাড়িঘর কম, পাহাড় আর জঙ্গলই বেশি। লোকজনকে যখন বাড়ি পৌছানোর জন্যে দু-দু-মাইল পাড়ি দিতে হয়, তখন একটু জিরিয়ে নেওয়ার জন্যে মাঝে মাঝে চেয়ার-বেঞ্চির ব্যবস্থা থাকা দরকার। সে-সব জায়গায় কোথাও কোথাও মাথার ওপর টিন কিংবা সিমেন্টের ছাউনি থাকে। সেখানে বসে রোদ্দুর থেকেও মাথা বাঁচানো যায়। অবশ্য মধুপুরীতে খুব কোমলাঙ্গিনী যারা, তারাই রোদ্দুরে কষ্ট পায়। বর্ষায় কিন্তু সকলেই এগুলোর উপযোগিতা বোধ করে। মধুপুরীর মিউনিসি-প্যালিটির পক্ষে সিমেন্টের তৈরি বেঞ্চিগুলো উধাও করে দেওয়া সম্ভব হয় না বটে, কিন্তু টিনের ছাউনির নিচে কাঠের বেঞ্চিগুলির অধিকাংশই উধাও। হয়ত এগুলোর আর প্রয়োজন আছে বলে মনে করে না তারা। প্রশ্ন ওঠে, টিনের ছাদই বা কার মর্জিতে টিকে আছে এখনও ? হ্যাঁ, একটা ব্যাপার হতে পারে, সম্ভবত তারা ধরে নিয়েছে, বাইরে থেকে যারা আসে, তাদের কাছে শৈলাবাস যেমন শখের ব্যাপার, তেমনি শৌখিন চেয়ার-বেঞ্চিতে বসতেও তারা অভ্যস্ত, কিন্তু শহরে যারা বরাবর বাস করে, বিশেষ করে মেয়েরা, মাটিতে নিঃসঙ্কোচেই বসতে পারে, যেমন ঐ দুই বুড়ি এখন বৃষ্টির ছাঁট থেকে বাঁচার জন্যে বসে পড়েছে। সম্ভবত ঐ বেচারীদের কথা ভেবেই মিউনিসিপ্যালিটির বড়লোক কর্তাব্যক্তিরা এক-আধ জায়গা থেকে বেঞ্চিগুলো হটিয়ে দিয়েছেন।

অপর বুড়ি জবাব দিলো, 'দেখব না কেন রামুর মা, সারা পাড়া-পড়শীই তো দেখছে !'

রামুর মা মুখ বেঁকিয়ে বলল, 'বুঝিনে, কি হতে চায় ও ! দেখেছি, পায়ে রঙ লাগায়। আমাদের দেশে শাশুড়ী, দিদি-শাশুড়ীর আমলে তো সিঁথিতেও সিঁদুর দেওয়ার চল ছিল না, কেবল ছিল এক ফোঁটা।'

'হ্যাঁ, টিপও তো বেরোলো এই সেদিন, আমরা যখন বউ হয়ে এলাম। তা সিঁদুর কপালেই দিক আর সিঁথিতেই দিক, সেটা, তবু সধবার লক্ষণ। কিন্তু ঠোঁটে রঙ, সিঁদুর যাই হোক, এমন-ছিষ্টি-ছাড়া কথা তো জীবনে শুনিনি।'

'শোনোনি, সে কথা? এই মধুপুরীতেই আগে মেমসাহেবদের ঠোঁট লাল করতে দেখেছ। আমাদের পাড়ার বাড়িওলী জমাদারের বউকে শুধালাম, তা বলল কি, ওটাও সধবার লক্ষণ। আমরা এখানে যেমন কপালে আর সিঁথিতে সিঁদুর লাগাই, তেমনি সাহেব লোকেরা ওদের দেশে ঠোঁটে লাগায়।'

'হ্যাঁ, মেমসাহেবদের কথা আলাদা। ওদের ধর্ম-অধর্মের কোনো বাছ-বিচার আছে? ওরা যা-খুশি করুক!'

'মেমসাহেবদের দেখাদেখি খ্রীষ্টানীরা ঠোঁটে রঙ লাগাতে শুরু করল। ভাবলাম লাগাক গে, আমাদের আর ওদের চাল-চলনও এক নয়, ধর্মও এক নয়, যা ইচ্ছে করুক। ওমা, কে জানত, জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর ভেতরেই কুঞ্জার বউ পয়দা হয়ে যাবে!'

'হ্যাঁ রামুর মা। এই রোগ মেমসাহেব আর খ্রীষ্টানীদের থেকে বাবুদের মধ্যেও ছড়িয়েছে। শাড়ি পরুক, চোখে কাজল দিক, সেটা কোনো কথা নয়, কিন্তু ঠোঁট লাল করে কি লাভ?'

রামু-শামুর বাড়িতে এখনও ঠোঁটে রঙ লাগানোর রেওয়াজ হয়নি। কিন্তু তাদের বাড়িতেও সোমত্ত বউ রয়েছে, কুঞ্জার বউয়ের সঙ্গে তাদের খুব ওঠা-বসা। কুঞ্জার বউ সামান্য লেখাপড়া জানে। শ্যামবর্ণ চেহারা বলতে গেলে একটু কালোই। আর চেহারাটা যা না, দেখে মনে হয়, মহাদেব যেমন গৌরী-পুত্রের কাঁধে হাতির মুখ লাগিয়ে দিয়ে দিয়েছিলেন, ব্রহ্মাও তেমনি ভুল বুঝে ছেলের মুখ বসিয়ে দিয়েছেন ওর মুখে। কালো পুরুষালী মুখে, রামু-শামুর মায়েদের কথা অনুযায়ী, 'রঙ' (লিপস্টিক) লাগালে কি শোভা হয়, সেটা বলা মুশকিল। মূলত ঠোঁট লাল করাটা অস্বাভাবিক কিছু দেখাবার জন্যে নয়। সচ্ছল পরিবারের কোনো মেয়ে অত্যন্ত ফরসা হলে তার তুলতুলে নরম মুখের ঠোঁট দুটো এমনিতেই লাল হয়ে থাকে। আমাদের প্রাচীন কবিরা উদ্দীপনায় রক্ত চনমন করে-ওঠা পক্ক বিম্ব-ফলের সঙ্গে ঠোঁটের যে উপমা দিয়েছেন, তার মানে এই যে, কোমলাঙ্গিনীর রূপের চরম প্রকাশের ক্ষেত্রে তার ঠোঁট আপনা থেকেই লাল হয়ে ওঠে। সেকালে বিম্বাধর দুর্লভ ছিল, তাই অন্যান্য মেয়েরাও অধর-রাগ ব্যবহার করত। কিন্তু অধর-রাগে রাঙানো ঠোঁটকে কবি বিম্বাধর বলতেন না, স্বাভাবিক অধরের ক্ষেত্রেই এরূপ উপমা দেওয়া হতো। শরীরের স্বাভাবিক রঙের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে কৃত্রিম রঙ ব্যবহারের প্রচেষ্টা সব দেশেই হয়ে থাকে।

আমাদের দেশে প্রায় সকলের চুলই কালো, তাই বৃদ্ধ বয়েসে যখন চুল সাদা হতে থাকে, তখন তাতে কালো কলপ দেওয়াটা রেওয়াজ। ইরাণ আফগানিস্তানে আগে এবং এখনও বহু লোকের চুল লালচে কিংবা মেহেদি রঙের হয়ে থাকে, তাই সেখানে চুল-দাড়িতে মেহেদি রঙের কলপ ব্যবহার করা হয়। তার ব্যর্থ অনুকরণ আমাদের দেশেও মাঝে মাঝে চোখে পড়ে।

কালো চেহারার ঠোঁটে লাল রঙ লাগানো উচিত না কালো রঙ, রামু-শামুর

মায়েরা সে-তর্কে যায়নি ! আসলে তাদের প্রধান আপত্তি হলো, এই সব নতুন ব্যাপার-স্যাপার চলছে কেন ?

কিন্তু নতুন ব্যাপার-স্যাপার পৃথিবীতে হয়েই থাকে। তারা নিজেরাই তাদের যৌবনকালে সর্বপ্রথম সিঁথিতে সিঁদুর দিয়েছে, পশ্চিমের জেলাগুলিতে সে-সময় তার চল ছিল না। তাদের এ কথাও জানা ছিল না যে তিরিশ-চল্লিশ পুরুষ আগে শাশুড়ীরা একসময় তাদের যৌবনকালে অধর-রাগ নামক ঠোঁট-রাঙানো বস্তু ব্যবহার করত। দেহের রঙ অনুযায়ী সে-রঙ আলাদা আলাদা হতো কি-না, তা অবশ্য বলা সম্ভব নয়। সম্ভবত লাল রঙটাই ব্যবহার করা হতো, কারণ সে-সময় সমস্ত সুন্দরীরাই বিম্বাধরোষ্ঠ হওয়ার জন্যে লালায়িত ছিল। কুঞ্জার বউয়ের দোষ বলতে এইটুকুই, রামু-শামুদের পাড়ায় সে-ই প্রথম বেনে-বউ, যে নিজের ঠোঁট রাঙায়, যা নিয়ে পাড়ার বয়স্কা বুড়িরা খুব টীকা-টিপ্পনী কাটে। পাড়া বলাটাও ভুল, কারণ মধুপুরীতে এক মাইল জায়গা জুড়ে হয়ত গোটা বিশেক বাড়ি, তার মধ্যে এক আধটা দোকান। রামু-শামুর দোকান যেখানে, সেখানে আরও ছ-সাতটা দোকান রয়েছে। এই ছ-সাতটি পরিবার ছাড়া অন্য বাড়িগুলোতে কেবল একজন করে দারোয়ান সারা বছর বাড়ি আগলায়, বাকি শৈলাবাসে বেড়াতে আসা মেয়ে-পুরুষেরা তো দু-এক মাসের অতিথি। শৈলাবাসে যারা বেড়াতে আসে, তারা গরিব ঘরের নয়। গরিব কি করে গরম থেকে বাঁচার জন্যে মধুপুরীর মতো ব্যয়বহুল জায়গায় বেড়াতে আসবে ? অন্যান্য বাড়িগুলোর মেয়েদের মধ্যে কেবল বুড়িরাই যা ঠোঁট রাঙায় না। তাই ও-পাড়ায় যাদের সঙ্গে ভদ্রমহিলাদের সম্বন্ধ রয়েছে, তাদের মধ্যে লিপস্টিক বা অধর-রাগ একেবারে মামুলী ব্যাপার।

'কলিযুগ, বুঝলে শামুর মা, কলিযুগ ! এ না হয়ে যায় ?'

'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ। কুঞ্জার মা আর কি করবে ! দু-একবার ধমকেছে, কিন্তু আজকাল বউ বাড়িতে ঢুকেই তো রাজ্যপাট নিজের হাতে নিয়ে নেয়, শাশুড়ীকে এখন গেরাহ্যি করে কে ? কুঞ্জার বাপ বেঁচে থাকত, তাহলে শাশুড়ীর খানিকটা মান-সম্মানও থাকত। এখন তো বউ-ছেলে একদিকে, শাশুড়ী আর এক দিকে, কি করবে বেচারী !'

'সংসারে এখন উলটো রীতি চলছে দিদি। শুধু দেখে যাও। পায়ের রঙ ঠোঁটে লাগানো শুরু হয়েছে, এর চেয়ে উলটো রীতি আর কি হবে !'

দুই

পাড়ার সাতটি বেনে-পরিবারের মধ্যে কুঞ্জার বউ-ই প্রথম, যে লিপস্টিক লাগাতে শুরু করেছিল। রামুর মা আর শামুর মা চার বছর আগে যখন তার সমালোচনা করেছিল, তখন তারা ভেবেছিল, ওটা বেজাতের ঘরের রীতি, তাদের

ঘরে আগুন হয়ে ঢুকবে না। তারা কি জানত যে সে-আগুন বেজাতের ঘরে ঢুকেই থেমে থাকবে না! আজ সব বাড়ির বউয়েরাই চোখের সামনে শিক্ষিতা শৈলবিহারিণী মেয়েদের ঠোঁট লাল করতে দেখছে। পাশের বাংলোয় ঠাঁই নেওয়া কোনো কোনো শৈলবিহারী পরিবারের সঙ্গে তাদের কারোর কারোর আলাপ পরিচয় হয়। এখানে যারা বেড়াতে আসে, তারা তো বেনে-বামুন পরিবারেরই লোকজন, সাহেব-মেম আর ক'টা। আলাপ-পরিচয় করতে ভয় পাবে কেন? তারা নিজেদের চোখেই দেখে, ঘুম থেকে ওঠার সময় যাদের চোখ-মুখ একেবারে ফ্যাকাসে ফ্যাকাসে দেখায়, তারাই যখন আধ ঘণ্টার জন্যে আয়নার সামনে বসে, ভুরুতে কালো পেন্সিল টানে, চোখে কাজল, গালে পাউডার আর ঠোঁটে লিপস্টিক লাগায়, তখন তারা অপ্সরীকেও হার মানিয়ে দেয়। নিজেদের চোখের সামনে এরূপ অত্যাশ্চর্য ব্যাপারে তারা শুধু চুপচাপ দেখে যেতে পারে কি? মধুপুরীতে এমন কোন মেয়েটি আছে যে বছরে পাঁচ-সাতবার সিনেমায় যায় না? রামুর মা, শামুর মা-ও তুলসীদাস, সীতার বনবাস এবং অন্য দেবদেবীদের ছবি দেখেছে, এমন কি সিনেমার সাদা পরদায় রাম-লক্ষ্মণ-সীতাকে চলা-ফেরা করতে দেখে ধড়মড় করে উঠে হাত জোড় করে দাঁড়িয়েছে, পেছনের লোকের বকা-ঝকা গ্রাহ্য করেনি। 'সিনেমা খারাপ জিনিস' —একথা কখনও বলেনি তারা। তাহলে তাদের ঘরের বউয়েরা যদি তাদের স্বামীর সঙ্গে জনপ্রিয় ছবি দেখতে ঘন ঘন সিনেমায় যায়, তাদের আপত্তির কি কারণ থাকতে পারে? সিনেমা দেখে তারা যথেষ্ট আনন্দ পায়, সেই সঙ্গে অনেক কিছু শিক্ষালাভ হয়, যেমন —প্রেমের বীজ কিভাবে ক্ষেতে রোপণ করা যায়, কিভাবে তা অঙ্কুরিত হয়, আর কি রকম যত্ন-আত্তি করলে তাতে ফুল-ফল ধরে। স্বামীকে হাতের মুঠোয় আনার জন্যে বয়স্কা বুড়িরা তাদের যৌবনকালে বশীকরণ মন্ত্র খুঁজে বেড়াত। কুঞ্জার বউ কিংবা রামুর বউয়ের বশীকরণ মন্ত্রের ওপর কোনো বিশ্বাস নেই, একথা বলা যায় না, কিন্তু সিনেমায় যে পদ্ধতির প্রয়োজন দেখানো হয়, তার ওপরেই তাদের বেশি আস্থা। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সিনেমা আজকাল পথ-প্রদর্শক। সিনেমাই পশ্চিমের জেলাগুলো থেকে ঘাগ্‌রা দূর করে দিয়েছে। বিয়ের সময় পাকা দেখায় এখনও ঘাগ্‌রা-চুন্নরী আসে, কিন্তু তা কেবল বাক্সে ভরে রাখার জন্যে। নতুন বউদের কথা ছেড়েই দিন, রামু-শামুর মা-দের যদি ঘাগ্‌রা পরতে বলা হয়, তাহলে তারাও হয়ত সব সময় রাজী হবে না। কি করে কাপড় পরতে হবে, কিভাবে গয়না পরতে হবে, কেমন করে কথা বলা দরকার, কেমন করে গান গাওয়া উচিত, ইত্যাদি শত শত রকম ব্যাপার-স্যাপার সিনেমা শিখিয়ে দেয়। সিনেমার ছবি প্রায়ই রঙিন হয় না, কিন্তু চিত্রতারকাদের ঠোঁটের কালো রঙ দেখেও বুঝতে দেরি হয় না যে তারাও ঠোঁটে লিপস্টিক ঘষেছে। কুঞ্জাদের পাড়ার তরুণীরা তো এখন এটাই ভাবতে শুরু করেছে যে অপদার্থ মেয়েরাই আজকাল সাজগোজ করতে চায় না। আবার এটা শুধু বউদেরই

ব্যাপার নয়। যে-স্বামীরা তাদের সিনেমা দেখাতে নিয়ে যায়, তারাও চায় যে তাদের বউয়েরা সিনেমার নায়িকাদের মতো দেখতে-শুনতে হোক। গ্রীষ্মকালে মধুপুরীর লোকসংখ্যা অন্য সময়ের চেয়ে সাত-আটগুণ বেড়ে যায়, সে-সময় কোনো প্রসিদ্ধ চিত্রতারকা মধুপুরীতে এলে সারা মধুপুরী হুমড়ি খেয়ে পড়ে, অনেক উঁচু উঁচু ভদ্রঘরের তরুণীরাও ধাক্কা খেতে খেতে চিত্রতারকাকে এক নজর দেখে নিয়ে নিজেকে কৃতকৃতার্থ করার চেষ্টা করে। কুঞ্জার বউয়ের মতো মেয়েরা অতদূর যেতে পারে না, কিন্তু ওদের কানে খবর এসে পৌঁছায় ঠিকই —কখনো তাদের স্বামীরাই বলে, কখনো বা ঠাকুরপোরা। চিত্রতারকা আর সাধারণ ভদ্রমহিলায় পার্থক্যটুকু তাদের পক্ষে বুঝে ওঠা মুশকিল, নইলে যে-রাস্তার ওপর দোকান-পাট, সেই রাস্তা দিয়েই চিত্রতারকারা কতবার রিক্সায় কিংবা পায়ে হেঁটে যাতায়াত করে। যে কোনো অবস্থায় নায়িকাদের অনুকরণ করাটাই তাদের কাছে এখন একান্ত জরুরী হয়ে উঠেছে। তার মানে এই নয় যে প্রত্যেক স্ত্রীলোকের মনেই নিজেকে সুন্দরী দেখানোর উগ্র বাসনা রয়েছে, আসলে তা না করলে স্বামীটাও হাত থেকে বেহাত হয়ে যাওয়ার ভয়। পাড়ায় এক তরুণ বেনে নিজের বউটা খুব সাদা-সিধে বলে অন্য একজনকে নিয়ে ভেগেছে। 'তার বউ দেখতে খারাপ নয়, বরং কুঞ্জার বউয়ের ভাষায়, 'লাখে এক, কিন্তু হলে কি হয়, সাজগোজ করার মূল্য বোঝে না।' কুঞ্জার বউ ব্যাপারটাকে এমন শোরগোল তুলে প্রচার করেছিল যে, লিপস্টিক মহামারীর মতো ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ল। পাড়ারই দেবরানী তার কাছ থেকে কায়দাটা শিখে নিয়ে ঠোঁট রাঙাতে শুরু করল। বড় জা প্রথম প্রথম খুব নাক-ভুরু কোঁচকাত, কিন্তু যখন দেখল তার স্বামীটাও সেদিকে ঘন ঘন উঁকি-ঝুঁকি মারছে, তখন তাকে দেবরপত্নীর শরণাপন্ন হতেই হলো। এখন সে-ও ঠোঁট রাঙায়। কুঞ্জার বউকে সংসারের সব কাজ নিজের হাতে করতে হয়। উনুন-পাট, থালা-বাসন, কোটা-বাটা সব নিজেই করে। ছেলে-পিলের দেখাশোনাও করতে হয়। কাপড় চোপড় নোংরা তো হবেই। তা কাপড়-চোপড় ময়লা চিটে হয়ে যাক, কিংবা ধুলো-মাটিতেই বসে পড়তে হোক, কিন্তু যখন থেকে কুঞ্জার বউ শ্বশুর বাড়ি এসেছে, তখন থেকে ঠোঁট না রাঙানো অবস্থায় কেউ তাকে দেখেনি। নতুন কিছু করলে দুনিয়ার চারদিক হাসাহাসি করে, মানুষকে তখন দৃঢ় হয়ে থাকতে হয়, আর তার ফলে পৃথিবী শেষ পর্যন্ত তার দৃঢ়তাকে স্বীকার করে নেয় এবং স্বীকার করে তাকেই অনুসরণ করতে শুরু করে। কুঞ্জার বউয়ের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে।

নতুন কিছুকে বরণ করে নেওয়ার জন্যে সর্বাগ্রে পুরুষ এগিয়ে আসে, না নারী, সেটা বলা মুশকিল। কিছু কিছু জিনিস আছে, যেগুলোতে সম্ভবত মেয়েরাই সর্বাগ্রে এগিয়ে আসে। তার কারণও আছে। মেয়েরা ভালো করেই জানে যে তাদের জীবনের সমস্ত সুখ-সাফল্য নিজের স্বামীকে সন্তুষ্ট রাখার মধ্যেই। বংশানুক্রমে তারা বশীকরণ মন্ত্রের সন্ধান করে এসেছে, তাই ঐ ধরনের জিনিস

সামনে এলেই তারা তা গ্রহণ করার জন্য আগ বাড়িয়ে যায়। পুরুষেরা মেয়েদের চেয়ে নিজেদের রূপ-সৌন্দর্যকে যে কম গুরুত্ব দেয়, তা নয়, কিন্তু এটা অবশ্য ঠিক যে তারা কৃত্রিম রূপ-সৌন্দর্যের জন্যে অতো পাগল হয়ে ওঠে না। হাজার হলেও, মেয়েদের মতো তাদের কারোর অনুগ্রহের ওপর নির্ভর করে বেঁচে থাকতে হয় না, নিজেদের রুজি-রোজগার নিজেরাই কামায়। অবশ্য এর ব্যতিক্রমও আছে। মধুপুরীতে ঠোঁটে হালকা রঙ লাগানো ছেলে-ছোকরা কখনো-সখনো চোখে পড়ে।

।৯

'হোয়াট ননসেন্স! এই অপদার্থ মেয়েগুলো এটাও বোঝে না যে একই জিনিস কোথাও কোথাও কাজল হয়ে যায়, আবার কোথাও বা কালি।'

'তোমাদের সেটা শেখানো উচিত শৈলা।' —শৈলাকে তার হ্যাণ্ডব্যাগ থেকে ছোট্ট আয়না বের করে ঠোঁটে লিপস্টিক ঘষতে দেখে বিমলা বলল।

'হ্যাঁ, এই বেনেদের বউগুলো তো লিপস্টিককেও এক টাকা সের করে ফেলতে চায়।'

'যদি কোনো ভালো জিনিস বেশির ভাগ লোকে ব্যবহার করতে পারে, তাতে ঈর্ষা করার কি আছে?' বিমলা গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দিলো।

'হুঁ, তোমার কি, তুমি তো বিরহিণী সীতার ভূমিকায় অভিনয় করো, না লিপস্টিক লাগাও, না কাজল।'

বিমলা শৈলার চেয়ে একটু বেশি সুন্দরী। শৈলা কষ্টে-সৃষ্টে কোনোরকমে ম্যাট্রিক পাস করেছে, কিন্তু বিমলা এম. এ.। বড়লোক বাপের মেয়ে হওয়া সত্ত্বেও নিজে স্বাবলম্বী হতে চায় বলে একটি মেয়েদের কলেজে ইংরেজির প্রফেসরী করছে। দু'জনেই ছেলেবেলার বন্ধু, আর এবার মধুপুরীতে একই বাংলোয় থাকার সুযোগ পেয়ে দু'জনেই খুব খুশি। শৈলা একজন কোটিপতির স্ত্রী কিন্তু কখনও সে তার বন্ধুর কাছে গর্ব প্রকাশ করে না, আর বিমলাও শৈলার প্রতি তার ছোটবেলায় সেই ভালোবাসা একই রকম বজায় রেখে চলেছে। বিমলার ওপর আধুনিকতার কোনো প্রভাব পড়েনি একথা বলা যায় না। দেখতে গেলে অত্যন্ত আধুনিকা সে, কিন্তু রঙ-চঙ মেখে সৌন্দর্য বাড়ানোর প্রবৃত্তি তার নেই, প্রয়োজনও নেই। তাই বলে সে ওটাকে নিন্দা-মন্দও করে না, কারণ সে জানে, আজকের মেয়েরাও সেই একই রকম রূপোপজীবিনী, পঞ্চাশ পুরুষ ধরে তারা যেভাবে কাটিয়ে আসছে। সুন্দর রূপ হলে, রোজগার করে খাওয়া-পরার যোগান দেয় যে স্বামী, সে তার ওপর খুশি হয়, তাতে তার উত্তম ও নিশ্চিত ভরণ-পোষণের ভাবনা থাকে না। তাই নারী যতক্ষণ পর্যন্ত পুরুষের উপার্জনের উপর একান্ত নির্ভরশীল থাকে, ততোক্ষণ তাকে নিজের রূপ-লাবণ্যের কথা ভাবতেই হয়। বিমলার বন্ধু শৈলা যদি সাজগোজ করে

প্রথম শ্রেণীর চিত্রতারকার মতো নিজেকে না দেখাতে পারে, তাহলে কোটিপতি শেঠ তার প্রতি নিজেকে উৎসর্গ করতে রাজী হবে কেন, বরং সে অন্য কোনো চিত্রতারকার পেছনে দৌড়ে বেড়াবে। নিজের অসাধারণ রূপ-লাবণ্যকেই শৈলা তার ভালোবাসার গ্যারাণ্টী বলে ভাবে। কিন্তু নোংরা-ময়লা শাড়ি পরে কুলার বউয়ের মতো একটা কালো মেয়ে লিপস্টিকের মতো অমোঘ অস্ত্রটাকে যেমন-তেমনভাবে ব্যবহার করবে, এটা তার বরদাস্ত নয়। //

'সব কাজেরই একটা ছিরি-ছাঁদ আছে। ছিরি-ছাঁদই বলে দেয়, লোকটা চালাক না গোঁয়ার।'

'ছিরি-ছাঁদও তো একরকম হয় না শৈলা। তুমি যে রকম দামী লিপস্টিক ব্যবহার করো, অন্য শিক্ষিতা মার্জিত রুচিসম্পন্না মেয়েরাও কি ঐরকম লিপস্টিক ব্যবহার করতে পারে? তাদের দশ-বিশ টাকা খরচ করার সামর্থ্য নেই, তাই দেড় টাকা দু'টাকার জিনিসই ব্যবহার করে তারা।'

'সেটা কিন্তু ভালো নয় বিমলা। ডাক্তাররা বলেন, খারাপ লিপস্টিক ব্যবহার করলে ঠোঁটে ঘা হয়ে যাওয়ার ভয় আছে।'

'ডাক্তার তো দামী লিপস্টিক প্রস্তুতকারকদের দালালও হতে পারে। ওরা চায়, যাতে লোকে সস্তা জিনিস না নেয়, দামী জিনিস কেনে। কিন্তু সবার স্বামী তো কোটিপতি নয়, আর আজকাল লিপস্টিক সবার কাছেই অত্যাবশ্যক জিনিস হয়ে উঠেছে, অতএব তুমিই বলো, কি করবে ওরা?'

'মনে হচ্ছে, তুমি লিপস্টিকের খুব পক্ষপাতী হয়ে উঠেছ!'

'পক্ষপাতী হওয়ার প্রশ্ন নয়। আমি অস্বীকার করিনে যে যতদিন মেয়েরা নিজের পায়ে না দাঁড়াবে, ততোদিন তাদের রূপোপজীবিনী হয়েই থাকতে হবে, তাতে তারা কুঁড়েঘরেই থাক কিংবা রাজপ্রাসাদেই থাক। সারা পৃথিবীতে, দেশকালভেদে হয়ত একটু আগে-পিছে, সব সময় মেয়েদের যে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি দেখা গেছে, তাতে আমি মেয়েদের দোষী বলে ভাবতে যাব কেন?'

'তুমি বুঝি সেজন্যেই স্বাবলম্বী হওয়ার পথ বেছে নিয়েছ?'

'হ্যাঁ, আমি স্বীকার করি 'তুলসী করুপর কর ধরো, কর-তর (তলকর) কর না ধরো।' কেউ যদি কারোর হাতের নিচে হাত রাখে, সে তার আত্মমর্যাদা রক্ষা করবে কি করে? আমি চাই, সব মেয়েই তলকর কর না-ধরার দিকেই চলে আসুক কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও জানি যে, সেটা মুখে বলা যতো সহজ, কাজে পরিণত করা ততো সহজ নয়।'

'অর্থাৎ সেজন্যে তুমি সামাজিক বিপ্লব চাও না-কি?'

'সামাজিক বিপ্লবের জন্যে ভয় পেয়ো না শৈলা, সেটা কেবল তোমার শেঠজী আর তোমার জন্যে হবে না, তা আসবে বন্যার মতো, তাতে সমস্ত ডুবে যাবে, আর সেটা অতিক্রম করলে সকলেই সুখ-সমৃদ্ধিতে জীবন কাটাবে!'

'তোমার সেই বিপ্লবের পরে সংসারে কি করব আমি ?'

'যা ঐ বেনে-বউ করছে, যার লিপস্টিক লাগানো তুমি দেখতে পারছ না।'

'দেখতে পারছিনে, একথা ঠিক নয় বিমলা। সারা পৃথিবীর মেয়েই লিপস্টিক লাগাক, আমি চাই, কিন্তু নিয়ম মেনে।'

'কিন্তু, জানো শৈলা, 'নিয়ম' এই তিনটি অক্ষর কত দুর্মূল্য ? কোত্থেকে ও বেচারী তিরিশ টাকার জর্জেটের শাড়ি কিনবে ? আর নোংরা-ময়লা না হওয়ার জন্যে অন্তত চারখানা শাড়ি ওর চাই-ই তার ওপর ঘরের সমস্ত কাজ-কর্ম নিজের হাতে করে বলে ওর পক্ষে দু'দিনও কাপড়-চোপড় পরিষ্কার রাখা সম্ভব নয়। পরিষ্কার রাখার জন্যে শুধু বেশি পয়সা খরচ করতে হবে, তাই নয়, সংসারের অন্য কাজও ফেলে রাখতে হবে। তাহলে বলো, ঐ পরিবারটা কি আর টিকে থাকবে ?'

শৈলা ঝাঁজালো কণ্ঠে বলল, 'তাহলে কে বলতে গেছে যে লিপস্টিক লাগাও!'

বিমলা জবাব দিলো, 'যে তোমাকে বলেছে। সুন্দর হতে সকলেরই ইচ্ছে হয়।' এ ব্যাপারে বিমলার সঙ্গে শৈলার অনেকবার কথাবার্তা হয়েছে। বিমলা বলে গেলো, 'কোনো কিছু করার জন্যে আমাদের সেটা আগে বাড়িয়ে দেওয়া উচিত নয়, যতক্ষণ না বুঝি যে সেটা অপরের শক্তিসাধ্য। যদি কোনো কিছু লাভজনক বলে মনে হয়, তাহলে একজনের দেখে আরেক জনও তাকে গ্রহণ করবে, কিন্তু তাকে এমনভাবে গ্রহণ করবে, যা তার ক্ষমতায় কুলোয়।'

'কিন্তু তোমার বিপ্লব সফল হলে তো সব ধান বাইশ পসুরি হয়ে যাবে, তাহলে সব মেয়েই লিপস্টিক লাগাতে শুরু করবে, আর সম্ভবত প্যারিসের তৈরি এই লিপস্টিকের মতোই।'

'আমি লিপস্টিকের ওপর বক্তৃতা দিতে আসিনি শৈলা। আমার বিপ্লব সফল হলে নারীজাতি স্বাধীন হবে, সবদিক দিয়ে, আর্থিক ক্ষেত্রেও। তাতে তার লিপস্টিকের দরকার হবে কি-না, তা আমি জানিনে। বড় জোর বলতে পারি, ওটা এতো বেশি মাত্রায় দরকার হবে না, ওটাকে এতো গুরুত্বও দেওয়া হবে না, আর শুধু কিছু ভদ্রমহিলার জন্যে ওটা সংরক্ষিত থাকবে, তা-ও মেনে নেওয়া হবে না।'

'তাহলে ঐ কথাই হলো না—সব ধান বাইশ পসুরি! আমার অবাক লাগছে, আমাদের সবকিছুই যখন নকল করছে ওরা, তখন চুলটাও ছেঁটে ছোট করে নিচ্ছে না কেন ?'

'ছোট করার জন্যে হাতে পয়সা আসতে দাও, তারপর দেখে নিও শৈলা। তোমার একবার চুল কাটতে ছ'টাকা লাগে, তার ওপর, চুলের কতো যত্ন নিতে হয় তোমায়! বেচারী ওসবের জন্যে অত পয়সা কোথায় পাবে ?'

'তবে তো আমাদের এসব ছাড়তে হবে দেখছি!'

'ছাড়তে চাইলেও ছাড়তে পারবে না শৈলা। মধুপুরীতে বিকেলবেলা যেসব

সুন্দরীরা পাঁচজনের একজন সেজে ঘুরে বেড়ায়, তারা তা করতে গিয়ে নিজেদের পায়ে নিজেরাই কুড়ুল মারবে না-কি? তুমি জানো, কৃত্রিম সাজসজ্জা তুমি ছেড়ে দিলেও তোমাকে কুরূপা দেখাবে না, তোমার সাজসজ্জা স্বাভাবিকতার চেয়ে উনিশ-বিশের পার্থক্য করে দেয়, এই যা। কিন্তু আমাদের ভদ্রলোকের মেয়েরা, যারা রঙ-চঙ মেখে বিকেলবেলা বেড়াতে বেরোয়, তারা কৃত্রিম সাজসজ্জা ছেড়ে দিলে কানাকড়ি হয়ে যাবে না? তাই আমি এদের কৃত্রিম সাজসজ্জা ছাড়তেও বলিনে, আর সেজন্য ঘৃণাও প্রকাশ করিনে।'

'এই তাহলে সংসার, আর সেই সংসারকে তুমি এখন তোমার এই বেদান্ত দিয়ে উদ্বুদ্ধ করতে চাও, তাই না?

'বেদান্ত উদ্বুদ্ধ করে না, বেদান্তের কাজ হলো মানুষকে সংসার থেকে তাড়ানো। তা সে যা খুশি করুক গে। প্রত্যেক সমাজই নতুন কিছুকে প্রথমেই বরণ করে নেয় না। শিক্ষিত-শ্রেণী নতুনকে দ্রুত স্বীকার করে নিতে প্রস্তুত থাকে, কারণ তারা দেশ, কাল উভয়েরই বহু পরিবর্তন চোখের সামনে দেখতে পায়। কিন্তু তা সত্বেও —আচ্ছা বলো তো, তুমি বাড়িতে থাকলে এইরকম স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে পারতে, যেমন এখানে এই মধুপুরীতে করো?'

'না ভাই বিমলা, আমি তো মনে মনে জপি, এই ফোকলা বুড়িটা আর কেন পাছা ঠুকে বসে আছে! যদিও ওর গজগজানিতে আমার কিছুই যায় আসে না, শেঠজী সব সময়েই আমার পক্ষে দাঁড়াতে চায়, কিন্তু তথাপি সংকোচ বলেও তো কথা!'

'আর এখানে, যদি ইচ্ছে হয়, এক শলাকা-ভর জায়গায় এক পোয়া কাজল লাগাও, ঠোঁটের ডগায় পাঁচ তোলা লিপস্টিক ঘষে ঠোঁট রাঙাও, যা ইচ্ছে করো, এখানে তোমারই জগৎ, শাশুড়ীর জগতের কোনো ঠাঁই নেই এখানে।'

'তুমি খুব বাড়িয়ে-চড়িয়ে কথা বলো। কে এতো কাজল আর লিপস্টিক লাগায়, শুনি?'

'মাত্রাতিরিক্ত লাগানোর অনেককে রোজ দেখতে পাচ্ছ তুমি। আমি তো দেখে তাজ্জব হয়ে যাচ্ছি যে আমাদের পশ্চিমের বোনেরা সমস্ত প্রসাধনই মেনে নিতে রাজী, কিন্তু সেই সঙ্গে তাদের বাড়ির বুড়ি-থুড়িদের কথা উড়িয়ে দিতে চায় না। পশ্চিমে একটিও কি মেয়ে আছে যে কাজল পরে!'

'ওরা ওর মাহাত্ম্যটা জানে না ভাই বিমলা। চোখের দুই কোণে, কানের দিকে একটু কালো রেখা টেনে দিলে চোখ দুটো দ্বিগুণ কেন, আড়াই গুণ হয়ে যায়।'

'সৌন্দর্য-বিশেষজ্ঞ তৈরি করার অধিকার সব দেশেরই আছে, কথাটা মানি আমি। কিন্তু আমার কাছে তো এ সবকিছুই খেলাধুলো মনে হয়, তা সে বেনে বউই হোক আর শৈলারানীই হোক, প্রত্যেকেই নিজে নিজেকে নিয়ে পুতুল-খেলা খেলছে, অভিনয় করছে।'

'কথাতেই আছে, পৃথিবী এক রঙ্গমঞ্চ। তাহলে, লোকে যদি পুতুল-খেলাই খেলে, ক্ষতি কি ?'

'আমি ক্ষতির কথা বলছিনে, তাতে অনেকেই আনন্দ পেতে পারে। কিন্তু একথা অবশ্যই বলব যে আজকাল মধুপুরীতে পুরো সীজন কাটানোর লোক ভুরি ভুরি। সবাই তোমার-আমার মতো শৈলবিহারিণী, শৌখিন। কয়েক মাসের জন্যে এখানে সম্পূর্ণ নতুন এক জগৎ তৈরি হয়ে যায়। দিল্লী, কলকাতা কিংবা বোম্বাইয়ে আমাদের শ্রেণীর লোক শতকরা দশ ভাগও নয়, আর এখানে আমাদের শ্রেণীতে যারা পড়ে না, তারা শতকরা দশ ভাগেরও কম। সেখানে আমাদের সমস্ত কিছু অনুকরণ করার জন্যে লোকে অতো উৎসাহী নয়, যতটা এখানে আমাদের পাড়া-পড়শীর ছেলে-মেয়েরা।'

সত্যি-সত্যিই মধুপুরীর মতো হিমালয়ের শৈলাবাসগুলিতে যত দ্রুত ও ব্যাপক হারে ফ্যাশনের প্রচার হয়, সমতলের শহরগুলিতে সেরকম হয় না। এর একটা বড় কারণ হলো, সীজনের সময় বেড়াতে আসা সুন্দরীদের প্লাবনে এখানকার সাধারণ তরুণীদের পা হড়কে যায়, অমনি তারাও সেই স্রোতে ভেসে যেতে থাকে।

ঠাকুর

আপাতদৃষ্টিতে একটি প্রমোদনগরী আর ঠাকুরের পারস্পরিক সম্বন্ধ একটু অদ্ভুত ধরনের বলে মনে হবে। মধুপুরী মধু অর্থাৎ মদিরার পুরী, সেখানে বিলাসী লোকেরা গ্রীষ্মকালে মৌজ করার জন্যে চলে আসে। মধুপুরীর স্থায়ী বাসিন্দা যেখানে আট হাজার, সেখানে সীজনে তার লোকসংখ্যা পঞ্চাশ-ষাট হাজারে গিয়ে দাঁড়ায়। স্থায়ী বাসিন্দাদের নিজেদের মন্দির-মসজিদ রয়েছে। ইংরেজরা মধুপুরীকে ইংলণ্ডের আর পাঁচটা শহরের মতো করে প্রতিষ্ঠা করেছিল, তাই সেখানে তাদের উপাসনা-গৃহেরও প্রয়োজন ছিল, তারই ফলশ্রুতি হিসাবে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে প্রয়োজনের অতিরিক্ত গির্জা আর ক্যাথিড্রল —সেগুলো এখন মধুপুরীর সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

লাখ-লাখ টাকা খরচ করে তৈরি এইসব সুদৃশ্য অট্টালিকায় সীজনের সময় ভক্তিপরায়ণ শ্বেতাঙ্গ-শ্বেতাঙ্গিনীদের ভিড়ও হয়ে থাকে। এত টাকা চাঁদা ওঠে যে সেগুলোর মেরামতী এবং সাজসজ্জার কোনো সমস্যাই দেখা দেয় না। মধুপুরীতে এখন খ্রীষ্টানের সংখ্যা নামমাত্র। আধ ডজনের ওপর গির্জার মধ্যে বড় জোর একটার লোক সঙ্কুলান হতে পারে। গির্জাগুলো তৈরি করার সময় প্রতিষ্ঠাতারা কি ভাবতে পেরেছিল যে এক সময় ভগবানের সংখ্যা বেশি আর ভক্তের সংখ্যা কম হয়ে যাবে।

ইংরেজদের ভগবানদেরও বেশ বড় বড় ঘণ্টা থাকে। ঐ ঘণ্টাগুলো দিয়েই ভক্তদের পুজো-অর্চনার খবর দিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু নেটিভ (কালো) লোকদের ভগবানের ঘড়ি-ঘণ্টা ওঁদের পছন্দ নয়। সেই কারণেই দার্জিলিঙে সবচেয়ে উঁচু টিলার ওপর শত শত বছর ধরে বিরাজমান হিন্দু ও বৌদ্ধদের যে যৌথ দেবতা মহাকাল ছিলেন, পাশেই এক বিশাল গির্জার ভিত্তি প্রস্তর যখন স্থাপন করা হলো, তখন তাঁকে হটিয়ে দেওয়া হলো তাঁর জায়গা থেকে। মধুপুরীতে ভগবানদের —তা তিনি হিন্দুদেরই হোন কিংবা মুসলমানদেরই —নেটিভদের কোয়ার্টারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে বাধ্য করা হয়েছে। মধুপুরীর প্রত্যেকটি বাজারে কমপক্ষে একটি করে মন্দির আগে থেকেই ছিল। কিন্তু ইংরেজরা চলে যেতে না যেতেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় আরও এক ঠাকুর এসে বিরাজমান হলেন। এক দেশে এক রাজা ছিলেন। তাঁর এক আদুরে মেয়ে ছিল। মেয়েটির মনে মায়ের বাড়ির চেয়ে

মামার বাড়ির গর্ব ছিল বেশি। বিয়ের পরও সে তার মামার বাড়ির দাসীদের তাদের রাজস্থানী পোশাকেই দেখতে পছন্দ করে। এই থেকেই ব্যাপারটা বোঝা যায়। সে নিজেও মাঝে মাঝে ঘাগ্‌রা-চুমুরি পরে নেয়। যদিও সে এমন এক রানী, যে চুল ছাঁটে, ঠোঁট রাঙায়, প্যাণ্ট পরে খোলা মুখে ঘুরে বেড়ায়, তবু তার মনটা সেকেলে।

রাজার মেয়ের বিয়ে অন্য এক রাজার সঙ্গেই হওয়া স্বাভাবিক। লোকে বলে, জামাই রাজা হলেও পয়সাকড়ির দিক দিয়ে তার অবস্থা ততো ভালো নয়। কিংবা এমনও হতে পারে, রাজা বাপ তাঁর মেয়েকে একটা ভালোরকম যৌতুক দিতে চেয়েছিলেন। সে যাই হোক, মেয়ের বিয়ে দেওয়ার পর রাজা মহাশয়ের ইচ্ছে হলো, গরমের সময়টা কাটাবার জন্যে তিনি তাঁর ফুলের পাপড়ির মতো মেয়েকে একটা বাড়ি তৈরি করে দেবেন মধুপুরীতে। বাড়ি তৈরির সময় তিনিও স্বল্পকালের জন্যে একটা ছোটখাটো শাহ্‌জাহান বনে গেলেন। বাড়ি ছোটই হোক, কিন্তু তাকে কতখানি সুন্দর করা যায়, সেজন্যে তাঁর ভাবনা-চিন্তার অন্ত রইল না। অবশেষে তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠল লণ্ডনের কোনো এক টাওয়ার কিংবা দুর্গের ছবি। ঠিক করলেন, বাড়িটাকে ঐভাবেই তৈরি করবেন, লোকের দেখে মনে হবে যেন একটা সুদৃশ্য ক্যাস্‌ল।

তারপর স্থান-নির্বাচনের জন্যে তিনি এখানে পাহাড়ে খোঁজাখুঁজি শুরু করলেন। এমনিতে ইংরেজদের বাড়িঘর রয়েছে যে পাড়ায়, সেখানে নেটিভ রাজার পক্ষে বাড়ি তৈরির জায়গা পাওয়া সহজ ছিল না, কিন্তু তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়। ভারতে ইংরেজের দাপট দু'দশক আগেই খতম হয়েছে। যুদ্ধের সময়েই তাদের বাংলো-গুলোতে কিছুদিনের জন্যে লোকজনের সমাগম হয়েছিল, নইলে খালিই পড়ে থাকছিল সেগুলো। ইংরেজরা ভারতীয়দের প্রতি তাদের সেই আগের মনোভাব তখনও ছাড়তে পারেনি বটে, কিন্তু ইংরেজের পরম ভক্ত রাজা মহাশয় তাদের আর দেবতা বলে মানতে রাজী নন। মধুপুরীর প্রত্যেকটি টিলায় অনুসন্ধান চালালো তাঁর লোকজন। অবশেষে বেশ পছন্দসই জায়গা পাওয়াও গেলো একটা। মধুপুরীর বড় হোটেলগুলির একটির কাছেই জায়গাটা। হোটেলটির এক পাশে খ্রীষ্টানদের একটা মঠ। সেখানে টিলার সবচেয়ে ওপরে অপেক্ষাকৃত সমতল জায়গায় বাংলোটা বিক্রি হচ্ছিল। রাজা মহাশয় সেটা কিনে দিতে চাইলেন মেয়েকে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরেই মধুপুরীতে দূর দূর জায়গায় তৈরি বাংলো আর বাড়িঘরের দাম খুব নেমে গিয়েছিল। মেয়ের জন্যে বাড়ি তৈরি করতে রাজা মহাশয় যত টাকা লাগাবেন ভেবেছিলেন, তার অর্ধেকেই তিনি খুব সুন্দর সাজানো গোছানো বাড়ি পেয়ে গেলেন। কিন্তু তাতে তাঁর মানস-পটে আঁকা ক্যাস্‌ল তো আর মর্ত্যে নেমে আসতে পারে না? তার ওপর তিনি মেয়েকে শুধু একটা ক্যাস্‌ল দিয়েই খুশি হতে চান না।

রাজকন্যাকে ইংরেজ আয়ার ছত্রছায়ায় মানুষ করেছেন তিনি। ইংরেজ মেয়েদের মতোই তার স্বচ্ছন্দ চলা-ফেরা, অন্তঃপুরের চার দেয়ালের মধ্যে তাকে কখনও আটকে থাকতে হয়নি। আজকাল দেশীয় রাজা বা জমিদারদের ছেলে জন্মাতে না জন্মাতেই ইংরেজি আদব-কায়দার মধু চুষতে শুরু করে আর গায়ের রঙ ছাড়া সব ব্যাপারেই সে ইংরেজ হয়ে ওঠে। এসব রাজকুমারদের কাজকর্ম 'নেটিভ' রাজকন্যাদের দিয়ে চলতে পারে না। অনেকেই নিজেদের সাধ মেটাবার জন্যে শ্বেতাঙ্গিনী বিয়ে করছে। অনেকে তাদের বিবাহিতা রানীকে প্রাসাদের চার দেয়ালের মধ্যে আটকে রেখেছে শুধু আজীবন চোখের জলে বুক ভাসাবার জন্যে। তাতে কুমারী মেয়ের বাপের দুর্ভাবনা বেড়ে যাওয়াটা খুবই স্বাভাবিক, তাই তাঁরা অন্তঃপুরেই মেয়েদের মেমসাহেব বানিয়ে ফেলার সংকল্প করেছেন।

প্রাচীনকালে চীনের উত্তর আর পশ্চিমের যুদ্ধবাজ সামন্তদের হাতে রাখার জন্যে চীন-সম্রাট একটা নীতি অনুসরণ করতেন এবং তাতে ভালো ফলও পাওয়া যেত। তিনি সামন্তদের যথেষ্ট পরিমাণে সৈন্য দিতেন এবং সেই সঙ্গে রাজকন্যা দান করতেন। যদিও সম্রাটের অন্তঃপুরে রানীর সংখ্যা এতো ছিল যে তিনি তাদের অনেককে চিনতেন না, অনেকের নামও জানতেন না, তবু রাজকন্যার যে পরিমাণ চাহিদা, তা মেটানোর পক্ষে যথেষ্ট হতো না। সেজন্য সুন্দর সুন্দর শিশু কন্যা নিয়ে এসে পালন করা হতো এবং তাদেরকেই রাজকন্যা বলে পাণিপ্রার্থীদের কাছে চালিয়ে দেওয়া হতো। এভাবে চীনে রাজকন্যাদের একটা পুরোপুরি নার্সারী তৈরি করে ফেলা হয়েছিল।

ভারতের রাজপ্রাসাদগুলি সেরকম বিশাল নার্সারী না হোক, বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ কাটতে না কাটতেই সেগুলি মেমরাজকন্যা বানানোর কারখানা অবশ্যই হয়ে উঠেছে।

এ রকম আবহাওয়াতেই রাজকন্যার জন্ম হয়েছে, বড় হয়েছে সে, কিন্তু মেম হওয়াটা যত সোজা, নিজের মনটাকে সম্পূর্ণ বদলানো ততো সোজা নয়। এবং তার প্রয়োজনও নেই। নিজের ইউরোপীয় আয়া মেমসাহেবদের দেখে সে বুঝতে পেরেছিল যে হিন্দু মেয়েদের মতোই ওদের ভগবানে অটুট ভক্তি-শ্রদ্ধা। ওদের মধ্যে যারা রোমান ক্যাথলিক, তারা তাদের গির্জায় মা ও শিশুর সুন্দর সুন্দর মূর্তি রাখে। আর যারা প্রোটেস্ট্যান্ট, তাদের গির্জায় আমাদের আর্যসমাজপন্থীদের মতোই নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা হয়।

রাজকন্যার মা ও দিদিমা দু'জনেই বড় ভক্তিমতী ছিলেন। বেশভূষা আর চাল-চলনে পুরো ইউরোপীয় ছাঁচে ঢালা হলেও রাজকন্যা ভগবানে ভক্তি-শ্রদ্ধা লাভ করেছিল মা ও দিদিমার কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে। সে বরাবর পুজোর সময় রাজপ্রাসাদ-সংলগ্ন সম্রান্ত মন্দিরে গিয়ে ভক্তি-ভরে আরতি করে এবং প্রসাদ নিয়ে বাড়ি ফেরে।

দুই

রাজকন্যার বিয়ে হয়ে গেলো, আর আগে যে-কথা বলেছি, মেয়ের জন্য মধুপুরীতে একটা ক্যাস্‌ল তৈরি করার ইচ্ছে হলো রাজা মহাশয়ের। তাঁর বাড়িতে এক মীরার জন্ম হয়েছে। জানিনে সে-ও মীরার কণ্ঠস্বর 'নিত্‌ উঠ্‌ দরশন্‌ পার্সঁ' গায় কি-না। গান গাওয়ার মতো গলা সবাই পায় না, তা তার জন্ম আর লালন-পালন অন্তঃপুরে যতোই কোকিলের কুহুতানের মধ্যে হো'ক না কেন। কিন্তু গান না গেয়েও দেব-দ্বিজে ভক্তি দেখানো সম্ভব। যেই রাজা মহাশয় ক্যাস্‌লের নকশা দেখালেন, অমনি মেয়ের কথাবার্তায় ইঙ্গিতে তিনি বুঝে ফেললেন যে পুরনো বাংলোটাকে ক্যাস্‌লে রূপান্তরিত করলেও রাজকন্যা তাতে কখনও সুখী হবে না, যদি না তার নিত্য ঠাকুর দর্শনের ব্যবস্থা হয়।

ক্যাস্‌লের নকশা তৈরি করতে বাপ যেমন হিমসিম খেয়েছিলেন, এখন মন্দিরের জন্যেও তেমনি তাঁর ভাবনার অন্ত নেই। পাঁচজনের মন্দির নয় যে তাতে মধুপুরীর হাজার হাজার ভক্ত নরনারীর ঠাকুর-দর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে। তিনি শুধু তাঁর মেয়ের জন্যেই একটা ছোট্ট সুন্দর মন্দির তৈরি করাতে চান। অতুলনীয় সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তোলার জন্য শাহ্‌জাহান তাজমহলটাকে সম্পূর্ণ মর্মর পাথরে তৈরি করিয়েছিলেন। রাজা মহাশয় তাঁর মেয়ের জন্যে মর্মর পাথর না হলেও অন্তত সেই রকম সিমেণ্ট দিয়ে মন্দির তৈরি করাবেন বলে মনস্থির করলেন। যুদ্ধ চলছে। সব জিনিসই দুর্মূল্য। কিন্তু রাজা মহাশয়ের শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিরা তখনও বিশ্বাস করতে পারেননি যে যুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁদের জমিদারীর ওপর বজ্রপাত হবে এবং উপার্জনের স্রোত শুকিয়ে যাবে। তখনও কৃষকেরা চুপচাপ রাজা মহাশয়কে খাজনা, বেগার এবং আরও বিশ-পঁচিশ রকমের অবৈধ কর নিয়মিত দিয়ে আসছে।

এদিকে রাজা মহাশয়ের এমন খরচ-পত্তর নেই যে তালুকের আয় পুরো আদায় না হলে ঋণের বোঝা মাথায় চাপবে। ফলে তাঁর কোষাগারে যথেষ্ট টাকা। ধর্মে মতি রয়েছে, নিজেদের আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি অনুরাগও আছে, কিন্তু রুচিজ্ঞানটা এতো উন্নত যে দেশ-কালের উর্ধ্বে মনের মতো একটা কিছু করার পরিকল্পনা খাড়া করা সম্ভব হয়ে ওঠে না তাঁর পক্ষে। তাই অনেক ভেবেচিন্তে শেষ পর্যন্ত তিনি বিগত শতাধিক বছর ধরে উত্তর ভারতে যেসব চূড়াবিশিষ্ট মন্দির তৈরি হয়ে এসেছে, তেমনি একটা মন্দির বেছে নিলেন। মনে মনে ঠিক করলেন, যে বাংলোটাকে ক্যাস্‌লের রূপ দেওয়া হচ্ছে, তার সামনে সবচেয়ে উঁচু জায়গায় ঐ ধবধবে সাদা মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করবেন।

মধুপুরীর এই দেবালয়ে এলে প্রত্যেকে স্বীকার করতে বাধ্য হবেন যে

মধুপুরীতে এমন সুন্দর জায়গা সম্ভবত আর কোথাও নেই। এখানে দাঁড়িয়ে আপনি পূর্ব থেকে পশ্চিমে দিগন্ত-বিস্তৃত হিমশৈলশিখরশ্রেণীর নয়নাভিরাম দৃশ্য দেখতে পারেন, সবুজ-শ্যামল গাছ গাছালিতে ঢাকা মধুপুরীর এঁকে-বেঁকে চলে যাওয়া পাহাড়গুলি দেখে আপনি আপনার চোখ জুড়াতে পারেন। ওপর থেকে নীচ পর্যন্ত বিস্তৃত পাহাড়ের ঢালুতে উপত্যকার দৃশ্যগুলো আপনার চোখের সামনে বিশাল বিশাল ছবির মতো চিত্রিত বলে মনে হবে। এই বৈশিষ্ট্যগুলো ছাড়া জায়গাটার বাড়তি যেটুকু সুবিধে রয়েছে, তা হলো, মধুপুরীর প্রধান সড়কটি এখান থেকে খুব কাছেই, সামান্য উৎরাই অতিক্রম করলেই রাস্তা, সব সময় রিকশা পাওয়া যায়, কারণ শৈলবিহারীরা ঝাঁকে ঝাঁকে বেড়াতে আসে সেখানে —অর্থাৎ ক্যাস্‌লটি একদিকে যেমন একান্ত নিরিবিলিতে, তেমনি আবার শহরের মধ্যিখানেও।

যুদ্ধের সময় ট্রেনগুলোকে সৈন্য আর সৈন্যদের রসদসামগ্রী বওয়ার কাজে লাগানো হয়েছে। কলকারখানায় কয়লা জুটছে না। কয়লার অভাবে কাঠ কুটোর দাম আগুন হয়ে উঠেছে, তার ফলে লোকে আম বাগান কেটে সাফ করে ফেলেছে। এমন একটা সময়ে মধুপুরীর মতো পাহাড়ে ক্যাস্‌ল আর মন্দির তৈরির আসবাবপত্র পৌঁছানো সোজা কথা নয়, কিন্তু কথাতেই আছে 'দ্রব্যেণ সর্বে বশাঃ', অথবা 'জর বরুসরে ফৌলাদ নিহী নর্ম্‌ শবদ্‌' —সোনা ইস্পাতকেও নরম করে, পাথরের চাঁই ভেঙে রাস্তা বের করতে পারে। ওদিকে দুনিয়ার ভাগ্য নির্ধারণ করতে ধুন্ধুমার লড়াই চলছে, আর এদিকে মধুপুরীতে রাজকন্যার ক্যাস্‌লের চূড়ার ভিতে একটার পর একটা পাথর গেঁথে দেয়াল তোলা হচ্ছে। রাজা মহাশয়ের কর্মচারীরা দেখাশোনা করছে। নকশা অনুযায়ী যাতে ক্যাস্‌ল তৈরি হয়, সেজন্য ঠিকেদার আর ইঞ্জিনীয়ার সব সময় সতর্ক।

রাজকন্যার শয়নঘরের একেবারে সামনেই মন্দিরের ভিত পড়ল। যদি সে শুয়ে শুয়ে মন্দির-চূড়া দর্শন করতে চায়, তাহলে তো পা মেলে দিতে হয় মন্দিরের দিকেই, কিন্তু ধর্মপরায়ণা আধুনিক মীরা —ইউরোপীয় পোশাক আর ছাঁটা-চুল সত্ত্বেও দেব-দ্বিজে যা ভক্তি, তাতে রাজকন্যা, মানে বর্তমানে রানী, মীরা থেকে কম যায় না। সে কি ওসব করতে পারে? তার ইচ্ছে, ঠাকুর বাড়ি তার শিয়রের দিকে হবে, যাতে সে সকালে উঠেই মুখ ফিরিয়ে ঠাকুর দর্শন করতে পারে। তার শয়নঘরের জানালা আর সেই সঙ্গে মন্দিরের দরজা বসানোর সময় বিশেষভাবে খেয়াল রাখা হয়েছে যাতে সে মন্দিরে না গিয়েও শয়নঘর বা বসার ঘর থেকে ঠাকুর দর্শন করে হাত জোড় করতে পারে —মধুপুরীতে প্রবল বর্ষা হয়, সেজন্য সব সময় ক্যাস্‌ল থেকে মন্দিরে যাওয়া সহজ নয়।

ক্যাস্‌ল-চূড়ার দেওয়াল ক্রমশ উঠতেই থাকে, কয়েক মাস পরেই একদিকে কয়েকখানা শয়নকক্ষ, বৈঠকখানা, খাবার ঘর, স্নানাগার নিয়ে ক্যাস্‌ল তৈরি হয়ে গেলো। ইংলণ্ডের পুরনো ক্যাস্‌লগুলোতে যেমন দেখা যায়, তেমনি শির-তোলা

চূড়া। দেয়ালগুলোকে অবশ্য শত্রুর কামানের মুখে পড়তে হবে না, কারণ সেটা তো আর আসল দুর্গ নয়, নকল দুর্গ। ঠিকেদারদের দিয়ে তৈরি বাড়ি অতোটা নির্ভরযোগ্য হয় না, কেননা সিমেণ্ট বাঁচাবার জন্যে ওরা তার জায়গায় বালি-মাটিই বেশি ব্যবহার করে। ভেতরটা যেমন হবে হোক, ওরা কেবল বাইরেটাই সুন্দর আর জাঁকালো করে তুলতে চেষ্টা করে। খুব কম করেও মোট পাওনার এক তৃতীয়াংশ তো পকেটে পুরতেই হবে। আধুনিক মীরার ক্যাস্‌ল বাইরে থেকে দেখতে সুন্দর জাঁকালো মনে হয়, আর বাকিটা সামনে বসে বসে ঠাকুরই সব দেখছেন।

দূর থেকে দেখতে মন্দিরটাকে চুনকাম করা সাধারণ মন্দির বলেই মনে হয়। তেমনি সাদা-সিধে রেখা, তেমনি মামুলী চূড়া, চূড়ার ওপর স্বর্ণচক্র। মর্মর পাথরে তৈরি হলেও তাতে সৌন্দর্যসৃষ্টি হবে কি করে? যতই হোক, সৌন্দর্যসৃষ্টি ততোটুকুই তো সম্ভব, ওটা যে তৈরি করেছে, তার মগজে যতটুকু রয়েছে। মধুপুরীতে সাধারণ বাড়িতেও বিজলি আলো জ্বলে, তাহলে এমন সাধের তৈরি মীরার মন্দিরে বিজলির প্রদীপ জ্বলজ্বল করবে না কেন! চার কোণে তীব্র আলোর বড় বড় বাতি অর্থাৎ সার্চলাইট লাগিয়ে দেওয়া হলো। সেগুলো যখন জ্বলতে থাকে, তখন রাত্রিবেলাও শঙ্খধবল দেবালয়টিকে অনেক দূর অবধি অলকাপুরীর এক সুদৃশ্য গম্বুজের মতো দেখায়। বলা বাহুল্য, এরূপ পরিপাটি করে মন্দিরটা তৈরি করার সময় ভাবতেই পারা যায়নি যে তালুকদারীতে বজ্রপাত হতে চলেছে, তখন ঠাকুরের জন্যে টাকা-পয়সাটা অতো সস্তা থাকবে না।

মীরাকে তাঁর গিরিধারী গোপালের উপাসনার জন্যে বহু কষ্ট সহ্য করতে হয়েছিল, বিষের পাত্রে চুমুক দিতে হয়েছিল, সেকথা সবাই জানে, তাই বলে মধুপুরীর আধুনিক মীরার ব্যাপারে একথা ভেবে নেওয়া ঠিক হবে না যে তাকেও সেই একই পথ অনুসরণ করতে হবে। আধুনিক মীরার স্বামী এক আধুনিক কেতাদুরস্ত যুবক। ইউরোপীয় পদ্ধতিতে তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা, কিন্তু প্রতিটি দেশের সামন্তদের মতোই তিনিও প্রাচীন রীতিনীতির ঘোর উপাসক। তিনি নিজে তাঁর মীরার মতো ভগবদপ্রেমে অতোটা হাবুডুবু খেতে পারেন না ঠিকই, কিন্তু মীরার দেব-দ্বিজের প্রতি ভক্তিতে কখনও বাধা দেন না। বড়লোক বাপের আদুরে মেয়ের যথাযোগ্য সমাদর করাটাকে তিনি তাঁর কর্তব্য বলে মনে করেন। ক্যাস্‌ল আর মন্দির এমন তত্ত্বাবধানে রাখা হয়েছিল যে ছ'বছর পরেও দেখে মনে হয় যেন সদ্য তৈরি করা হয়েছে। ঠাকুরের সন্ধ্যা-আরতি যথাবিধি হয়, কাঁসর-ঘণ্টা বাজে, বারোমাস একজন পুরোহিত রাখা হয়েছে, দারোয়ান ছাড়া একজন মালিও রয়েছে। মধুপুরীতে মে মাসের মাঝামাঝি থেকে জুন মাসের শেষ পর্যন্ত প্রচণ্ড ভিড় থাকে, অবশ্য সেটাও ঠাসাঠাসি ভিড় নয়। তারপর থেকে শুরু হয় লোক সমাগম, সেপ্টেম্বরের শেষ পর্যন্ত ভিড় সমান থাকে। ক্যাস্‌লের মীরা তখন পুরো সময়টা এখানে কাটায়, অত্যধিক ঠাণ্ডা যতদিন না পড়ে। ঠাকুরেরও একটা লাভ হয়

তাতে—জন্মাষ্টমী-দেওয়ালীতে মন্দিরের বাইরেটা বিজলি বাতির আলোর মালা দিয়ে সাজানো হয়। তখন শত শত প্রদীপের মাঝখানে আলোয় উদ্ভাসিত মন্দিরটি দূর-দূরান্তর থেকে চোখে পড়ে।

প্রধান সড়ক থেকে মন্দিরে পৌঁছতে দু-আড়াইশো গজের চড়াই ভাঙতে হয়, সেজন্য ভক্তিশ্রদ্ধা বা কৌতূহল যাদের রয়েছে, তারাও সবাই মন্দিরে আসার চেষ্টা করে না, এমন কি যাদের ইচ্ছে রয়েছে তাদের কাছেও প্রধান বাধা ঐ পথটাই। আধুনিক মীরা অন্তঃপুরের অসূর্যম্পশ্যা নয়, বরং সকাল সন্ধ্যে যে-কোনো লোকের চোখে পড়বে, মাথায় কাপড়-চোপড় না দিয়ে প্যাণ্ট পরে রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। তখন সাধারণত এক তৃতীয় শ্রেণীর চিত্রতারকা, কিংবা মুসৌরীতে যত্রতত্র ঘুরে বেড়ানো 'সোসাইটি গার্ল'-এর সঙ্গে তার কোনো পার্থক্য থাকে না, কিন্তু ঠাকুরের কাছে যাওয়ার সময় তার ক্যাস্‌ল অন্তঃপুরের রূপ পরিগ্রহ করে।

হাজার হলেও ঠাকুর হচ্ছেন মীরার প্রাইভেট গিরিধারী গোপাল, তাই মন্দিরের দরজা রাম-শ্যাম-যদু-মধু সবার জন্যে খোলা থাকতে পারে না। যাওয়ার আগে প্রথমে ক্যাস্‌লে অনুমতি নাও, তারপর মন্দিরের দিকে পা বাড়াও। এজন্য অনেকেরই ঠাকুরের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা উবে যায়। শীত পড়লেই ক্যাস্‌ল নির্জন হয়ে পড়ে তখন কেবল একজন দারোয়ান আর একজন পুরোহিত থাকে। সে-সময় সম্ভবত কারোর অনুমতি নেওয়ার দরকার হয় না, কিন্তু হলে কি হয়, তখন আবার দুটো বড় বড় কালো কুকুর খোলা অবস্থায় ঘুরে বেড়ায়, তাদের আঁচড়-কামড় খেয়ে ঠাকুরকে ভক্তি দেখাতে যাওয়ার ইচ্ছে জাগে না কারোর।

ঠাণ্ডা সড়কের ওপর যারা ঘুরে বেড়ায়, পাহাড়ের ওপর মন্দিরটা তাদের চোখে পড়ে। যদি মন্দিরের পেছনে নির্মল নীল আকাশ থাকে, তাহলে নিষ্কলঙ্ক নির্মল শুভ্রতার জন্য মন্দিরটিকে আকাশের নীল প্রেক্ষাপটে বড় চিত্তাকর্ষক বলে মনে হয়। বাংলোটিও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারে না; কারণ মধুপুরীতে একমাত্র সেটিই ক্যাস্‌লের মতো দেখতে। অধিকাংশ শৈলবিহারীই মধুপুরীর সমতল পথঘাট বেশি পছন্দ করে, কিন্তু কিছু কিছু উৎসাহী মানুষ আছে, যারা চড়াই ভাঙতেও ইতস্তত করে না। বেচারীরা রিকশা-স্ট্যাণ্ডের কাছে এসে মন্দিরের দিকে পা বাড়িয়ে দেয়; কিন্তু কিছুদূর যেতেই, হয় কালো কুকুর দুটো যমদূতের কুকুরের মতো পথ রোধ করে দাঁড়ায়, না-হয় দারোয়ান বলে দেয়—অনুমতি না নিয়ে আর এগুবেন না।

লোকেরা যে বলাবলি করে, চমৎকার জায়গাটিতে ধন-দৌলতের ওপর সাপ এসে বসেছে, কথাটা মিথ্যে নয়, কিন্তু সেজন্য কেবল মীরাকেই দোষ দেওয়া যায় না। হাজার হলেও সেখানে কিছু ফুল আছে, ফুলের বাগানও আছে। আমাদের দেশে অধিকাংশ লোকই নাগরিক কর্তব্য পালনের জন্য নিজেদের দায়বদ্ধ বলে ভাবে না। তারা কখনো ফুল ছেঁড়ে, কখনো-বা অন্য কিছু নষ্ট করে। মন্দিরে কেউ না

থাকলে তারা নিজেদের নাম অমর করে রাখার জন্যে দেয়ালে কিছু-না-কিছু লিখে রাখবেই। এ রকম অবস্থায় বিনা অনুমতিতে প্রবেশ নিষেধ করে দেওয়াটা অন্যায় বলা যেতে পারে না। আমাদের বিশ্বাস, সকাল-সন্ধ্যে আরতির সময় মন্দিরে যাওয়ার ব্যাপারে দুর্গবাসিনীর দিক থেকে কোনো বাধা থাকার কথা নয়, কিন্তু আগেই যে কথা বলেছি, মধুপুরী শৌখীন ব্যক্তিদের জন্যে তৈরি হয়েছে, ধার্মিকদের জন্যে নয়।

তিন

মধুপুরীর একান্ত নিরিবিলিতে অধিষ্ঠিত ঠাকুর, এক সহৃদয় পিতা আর তাঁর ধর্মপরায়ণা তরুণী কন্যার অন্তরের ভক্তির প্রতীক। ভক্তির প্রতীক সাধারণত ভালোই হয়, কিন্তু দিনকাল কেমন দেখতে হবে তো! মন্দিরে এসে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় ঠাকুর কি ভাবতে পেরেছিলেন সে-কথা? তিনি যদিও বা কিছুটা অনুমান করতে পেরেছিলেন, কিন্তু তাঁর ভক্ত রাজা আর রাজকন্যা কি ঘুণাক্ষরেও জানতেন যে দিনকাল বদলে যাবে। এক সময় যা অন্তরের ভক্তির প্রতীক ছিল, আজ তা নির্বুদ্ধিতার প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঠাকুর তো আর খোলা আকাশের নীচে বসিয়ে দেওয়া পাথর কেটে তৈরি শিবলিঙ্গ নন যে মেঘের জল-টল খেয়েই সন্তুষ্ট থাকবেন।

এটা ঠাকুরবাড়ি। গৃহলক্ষ্মীর সঙ্গেই ঠাকুর তাঁর মন্দিরের ভেতরে বাস করেন। তাঁর পরার জন্যে কাপড়-চোপড় চাই, গয়নাগাঁটিও চাই। ঠাকুরের যদি কয়েক হাজার টাকার আসল গয়নাগাঁটি থাকে তাহলে শীতকালে যে-কোনো সময় দারোয়ান-পুরোহিতের প্রাণ চলে যাওয়ার আশঙ্কা। ঠাকুর কেবল জল-লপ্সি খেয়ে খুশি থাকার পাত্র নন, তাঁর ভোগের জন্যে পাকোয়ান (এক প্রকার পিঠে) চাই। আরতির সময় শঙ্খ-ঘণ্টা বাজাবার জন্যে আরও কিছু লোকজন দরকার। সবই খরচের ব্যাপার। শঙ্খ-ধবল মন্দিরের সাজসজ্জার কথা যদি না-ও ভাবা যায়, তবু মাসে মাসে দু-আড়াইশো টাকা করে খরচ আছেই। টুক-টাক মেরামতী আর সেই সঙ্গে পালপার্বণের খরচ জুড়লে বছরে চার-পাঁচ হাজার টাকার কম খরচ হওয়ার কথা নয়।

জমিদারী-তালুকদারী খতম হয়ে গেছে। এখন তো গায়ের চর্বি গলিয়ে গলিয়ে বেঁচে থাকা। গলায় বাঁধা চুষিকাঠি আর কতক্ষণ চুষে বেড়ানো যায়?

পুরোহিত বারো মাস থাকেন। সকাল-সন্ধ্যে মন্দির থেকে কাঁসর-ঘণ্টার আওয়াজ শোনা না গেলে বুঝতে হবে যে মীরা এখন ক্যাস্‌লে নেই। পুরোহিত সম্ভবত রোজকার মতোই আরতিটা করে দেন। ভালডা নয়, আসল ঘি ঢেলে আরতি করা হয়, এটা জোর দিয়ে বলা যায় না। কাপড়-চোপড়ে মুড়ে না রাখলেও

ছ'মাস তো ঠাকুর বেচারীকে তপস্যায় ফেলে রেখে চলে যায় সবাই। ঠাকুরকে এমন তপস্যা করতে যারা বাধ্য করে, তাদের কি তিনি আশীর্বাদ করবেন? সারা শীতকালটা ঠাকুরবাড়ির দিকে তাকালে মনে করুণার উদ্রেক হয়, চারদিক নিস্তব্ধ, বিষণ্ণ।

আজ থেকে একশো বছর পরের কথা মনে হয়। ২০৫৩ খ্রীষ্টাব্দ আসবে। তখন এই ক্যাস্‌ল আর মন্দিরের অবস্থা কি দাঁড়াবে? আজকের তরুণী মীরার পাত্তা থাকবে না সেদিন, তার চতুর্থ কিংবা পঞ্চম পুরুষ কোটি কোটি জনগণের সমুদ্রে বিন্দুর মতো মিশে যেতে থাকবে। তখন সম্ভবত তার মনে এক অস্পষ্ট স্মৃতি জেগে থাকবে যে, সে কোনো এক তালুকদার-রাজার বংশধর। তার কিন্তু একথা জানা থাকবে না যে, মধুপুরীতে তারই এক প্র-প্র-প্রপিতামহীর জন্য এমন এক মন্দির প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল, ঠিক যেন মর্মর পাথরের তৈরি, আর সেই মন্দিরের পাশেই একটি ক্যাস্‌লে তিনি নিজেও বাস করতেন।

মন্দিরই হোক আর গির্জা-মসজিদই হোক, কেবল তা পূজা-অর্চনার জন্যই তৈরি করা হয় না, বরং প্রতিষ্ঠাতা ও সবের মাধ্যমে নিজের অহঙ্কারকে পৃথিবীতে চিরস্থায়ী করে রাখতে চান। তিনি মনে করেন, এর ফলে তাঁর নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। পাহাড় কেটে অনড় গুহা-প্রাসাদ যাঁরা তৈরি করেছিলেন, তাঁদের নাম পর্যন্ত ভুলে গেছে মানুষ। পাহাড় চেঁচে ইলোরার মতো সুন্দর বিশাল মন্দির যাঁরা নির্মাণ করেছিলেন, তাঁদের নাম আজ আমাদের জানা নেই। তাহলে ইদানীংকার তৈরি মধুপুরীর এই মন্দিরের গুরুত্ব আর কতটুকু? ওটা সম্ভবত একশো বছরও দাঁড়িয়ে থাকবে না ঐ জায়গায়। তাহলে এর ফলে ওটার প্রতিষ্ঠাতার অমরকীর্তি অটুট থাকবে কি করে?

শিল্পকলার দিক দিয়েও মন্দিরটায় এমন কিছু নেই, যার জন্যে একশো বছর পরে সরকার ওটাকে নিজস্ব সংরক্ষণে নিয়ে আসার কথা বিবেচনা করবে। ওর মূর্তিগুলো বেখাপ্পা, মন্দিরটাও সুচারু নয়। মূর্তিগুলো কোনো মিউজিয়ামে রাখার উপযুক্তও নয়। মন্দিরের পাথরগুলো হয়ত কোনো কাজে লেগে যেতে পারে। যাই হোক, একশো বছর পরে এই নির্জন কয়েদখানা থেকে ঠাকুরের মুক্তি পাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

আর ক্যাস্‌ল? ওটার ভাগ্য তো মধুপুরীর ভাগ্যের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। আজ দেশে দারিদ্র্য যে রকম বেড়েছে, তার ফলশ্রুতিই হলো মধুপুরীর দিনদিন শীর্ণকায় হওয়া, রক্ত-মাংসহীন হয়ে পড়া। যে সব বাড়ি তৈরি করতে পঞ্চাশ লাখ টাকা খরচ হয়েছে, আজ সেগুলো বছরের পর বছর ধরে পরিত্যক্ত। বাড়িগুলোর অধিকাংশ আসবাবপত্র নিশ্চিহ্ন —কতো দরজা-চৌকাঠ চুরি হয়ে গেছে, দ্রৌপদীর শাড়ির মতো ছাউনির টিন একটার পর একটা নেমে যাচ্ছে। যেখানে এক সময় সুন্দর বাংলো কিংবা বাড়ি ছিল, এখন সেখানে শুধু দেয়ালগুলো দাঁড়িয়ে আছে।

আমি মনে করি, শতবর্ষ পরে ভারতের এ অবস্থা থাকবে না, দেশ ধনধান্যে সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে। তখন মধুপুরী হয়ত আরও বিস্তৃত, আরও সমৃদ্ধ হয়ে গড়ে উঠবে, মানুষের আনাগোনা আরও বেশি হবে। ততোদিনে ক্যাস্‌লের দেয়ালগুলো যদি ফাঁপা না হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে ওগুলো তখনও দাঁড়িয়ে থাকবে। সে সময় মন্দিরটাকে হয়ত আজ থেকে আরও ভালোভাবে ব্যবহার করা হবে, কিন্তু তখন 'নিত্‌ উঠ্‌ দরশন্‌ পাস্যূঁ' বলে ঠাকুরের সামনে হাত জোড় করে দাঁড়াবার মতো, কোনো তৃতীয় মীরা থাকবে না।

রায়বাহাদুর

মাত্র কয়েক বছর আগে রায়বাহাদুর একটা দারুণ লোভনীয় খেতাব ছিল। রায়বাহাদুর তো দূরের কথা, শুধু রায়সাহেব খেতাব পেলেই লোকে নিজেকে কৃতার্থ বলে মনে করত, পূর্বজন্মের পুণ্যফল কিংবা কঠোর সাধনার সাফল্য লাভ বলে ধরে নিতো। আর. বি. (রায়বাহাদুর), সি. আই. ই., স্যর, কে. সি. আই. ই. ইত্যাদি কয়েকটি অক্ষর দিয়ে ইংরেজরা আমাদের দেশবাসীকে কত না মোহ-মুগ্ধ করে রেখেছিল। এই কয়েকটি অক্ষর কিছু কিছু লোকের পক্ষে মান-মর্যাদার দিক দিয়ে ভালোই হয়েছিল কিন্তু বেশির ভাগ লোকের কাছেই তা খরচপত্রের একটা উপসর্গ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট থেকে লাটসাহেব পর্যন্ত, কোনো কাজের জন্যে যখনই যাঁদের চাঁদার দরকার পড়ত তখনই তাঁরা খেতাব-ধারীদের এত্তেলা পাঠাতেন, আর সেই হুকুম শিরোধার্য করতে বাধ্য হতেন মান্যবরেরা। কিন্তু ব্যবসার ক্ষেত্রে এই অক্ষর কটি হাজার হাজার টাকার নয়, লাখ লাখ টাকার কাজ দিতো। নামের সঙ্গে অক্ষর কয়টি জুড়ে দেওয়ার ফলে বাজারে তাঁদের সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ত। সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় নিজেদের কাজ গুছিয়ে নিতে পারতেন তাঁরা। লালা দয়াচাঁদের রায়বাহাদুর পদবীটা শুধু খরচ-পত্রের ব্যাপার ছিল না। তাঁর ধন-সম্পদ ফুলে-ফেঁপে ওঠার পেছনে এর যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল। প্রথমে এক বেকার উকিল ছিলেন, তারপর নিজের কুশলতায় ইংরেজের কৃপাপাত্র হয়ে উঠলেন, অবশেষে ওকালতি ছেড়ে দিয়ে ব্যবসায়ে নেমে পড়লেন। জীবনে কখনও পিছু হটেননি তিনি, সব সময় সামনেই এগিয়ে গেছেন। যদিও রায়বাহাদুর পদবীটাকে তিনি ঈশ্বরের দয়া বা ভাগ্যের দান বলে মনে করতেন, তবু সেটাই আসল ব্যাপার ছিল না। আসল ব্যাপার হলো তাঁর নিরলস প্রচেষ্টা, আর তার চেয়েও বেশি, সময়কে ঠিক মতো চিনে নিয়ে সেই অনুযায়ী চলা।

বড় বড় জমিদারেরাও রায়বাহাদুর হতেন। ভালো পসার জমানো কোনো কোনো উকিলকেও রায়বাহাদুর খেতাব দেওয়া হতো। ইংরেজরা ভাবত, এসব লোককে হাতে রাখা খুব লাভজনক। কলেজের পড়াশোনা শেষ করে দয়াচাঁদ যখন ওকালতি শুরু করলেন, অথচ পসার জমাতে পারছিলেন না, তখন কি তিনি ভাবতে পেরেছিলেন যে তিনি যুগ যুগ ধরে বেঁচে থাকবেন, সব যুগেই সকলের

শিরোমণি হয়ে থাকবেন। ওকালতিতে নিরাশ হয়ে তিনি এক সৈন্য শিবিরের অফিস-ক্লার্ক হলেন। ঘটনাচক্রে এমন কাজ পেলেন, যার সঙ্গে রসদ-সামগ্রী ও তার ঠিকেদারদের যোগাযোগ রয়েছে। ইংরেজ অফিসারেরা আজকালকার মতো অতো খবরদারি করত না। কিন্তু অফিসার আর তাদের মেমদের কাছে মদের বোতল কিংবা অন্য ধরনের উপঢৌকন একেবারে অস্পৃশ্য ছিল না, বিশেষ করে বড়দিনে তো দামী দামী উপহার সামগ্রী তাঁদের কাছে পাঠানো হতো। এ গুণটা দয়াচাঁদ বেশ ভালোই রপ্ত করেছিলেন। কেরানী থাকার সময় ঠিকেদারদের দিয়ে তিনি তাঁর সাহেব আর সাহেবের মেমের কাছে ভেট পাঠাতেন। তিনি যখন এক টাকা খাটিয়ে নব্বই টাকা লাভ করার ফন্দিটা শিখে ফেললেন, তখন, আট বছর পরে, বেতন আর উপরি রোজগারের চাকরিটায় লাথি মেরে বেরিয়ে এলেন। এক সৈনিক ঠিকেদার মনে করলেন, এ রকম এক চৌকস যুবককে নিজের কাজের অংশীদার করে নেওয়া বেশ লাভজনক। দয়াচাঁদের কাছে ব্যাপারটা দাঁড়ালো এমন, যেন 'না বিইয়ে কানাইয়ের মা।' তাঁর পুঁজি লাগানোর দরকার নেই। কাজ শুধু তাঁর বড় অংশীদারকে ক্রমশ বেশি মুনাফা পাইয়ে দেওয়া আর সেই সঙ্গে নিজেও তার ভাগীদার হওয়া। চার বছরে এত টাকা জমিয়ে ফেললেন যে ঠিকেদারকে তাড়িয়ে দিয়ে নিজেই কারবার শুরু করে দিলেন। সেই সৈন্য শিবিরেই নিজের একটা জেনারেল স্টোর খুললেন। ধার-বাকিতে জিনিসপত্র পেতে কোনো অসুবিধে নেই। স্টোর, ঠিকেদারী দুটোই চলতে লাগল একসঙ্গে, প্রতিযোগিতা রয়েছে, কিন্তু সৈনিক ঠিকেদারটি সেকেলে লোক, আর দয়াচাঁদ জ্ঞানলাভ করেছেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঘনঘটায়। তিনি নতুন ইংরেজ অফিসারদের খুব ভালো করেই চেনেন। পুরনো ঠিকেদারটি প্রাচীনপন্থী, লোকটা নানারকম সংস্কার ও ছুতমার্গের শিকার। কিন্তু দয়াচাঁদের ওসব নেই, যেভাবে দরকার সেই-ভাবেই তিনি প্রভুদের খুশি করতে প্রস্তুত। তাঁর হোয়াইটওয়ে কিংবা এখান-কারই তৈরি আর্মি-নেভির নতুন স্যুট দেখলেই ইংরেজ অফিসারেরা তাঁর খপ্পরে পড়ে যায়। ইংরেজি বোলচালেও তিনি বাবু ইংলিশ নয়, খাঁটি ইংলিশই ব্যবহার করেন। এই দুটি সম্বলই তাঁকে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা দেওয়ার পথে যথেষ্ট। কেরানীগিরির কথা উঠলে দয়াচাঁদ খুব সহজেই লোককে বিশ্বাস করাতে পারতেন যে, দিনকালই আলালের ঘরের দুলালটির সর্বনাশ করেছিল, এক সময় সবচেয়ে নিচের ধাপে তাঁকে জীবন শুরু করতে হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু নিজের অক্লান্ত পরিশ্রম ও অন্যান্য গুণের জন্যই তিনি আবার নিজের পায়ে দাঁড়াবার সুযোগ পেয়েছেন। দয়াচাঁদের গুষ্টির ইতিহাস জানতে যাওয়ার ফুরসৎ নেই কারোর। কে জানে যে শুধু তাঁর বাবা নন, তাঁর সাত পুরুষ গাঁয়ে একটা ছোট্ট দোকান চালিয়ে জীবনপাত করে এসেছেন। প্রকৃতিদেবীও তাঁকে যথেষ্ট দয়া করেছেন, তাঁর গায়ের রঙ অসাধারণ ফরসা, অর্থাৎ ইউরোপে তিনি নিজেকে খুব

সহজেই ইটালিয়ান কিংবা স্পেনের লোক বলে চালিয়ে দিতে পারেন। পরবর্তী-কালে লক্ষ্মীর কৃপা লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে দয়াচাঁদ শুধু টাকাকড়িতে নয়, গায়ে-গতরেও বেশ বড়-সড় হয়ে উঠেছেন, কিন্তু যখন তিনি সাফল্যের ধাপ একটির পর একটি দ্রুত অতিক্রম করছিলেন, তখন তাঁর চেহারা ছিল লম্বা, ছিপছিপে এক স্বাস্থ্যবান যুবক ছিলেন তিনি।

টাকায় টাকা আনে—প্রবচনটি দয়াচাঁদের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ সার্থক হয়ে উঠেছে বলা যায়। নানা লাভের টাকা তাঁর ঘরে আরও টাকা নিয়ে আসছে। দরিদ্র পরিবারে তাঁর জন্ম, কেবল অধ্যবসায়ের জোরেই পড়াশোনা করেছেন, কিন্তু তাঁর স্বভাবে কখনও দারিদ্র্যের ছাপ পড়েনি। সব সময়েই তাঁর দরাজ হাত। কেরানী-গিরির সময়েও হাত দরাজ ছিল। এক বেলা নিজে হয়ত না খেয়ে কাটাতেন, কিন্তু বন্ধু-বান্ধবদের আপ্যায়ন না করে থাকতে পারতেন না। এখন অবশ্য আর সেই নুন আনতে পান্তা ফুরানোর মতো অবস্থা নেই, নিজস্ব ঠিকেদারী আর স্টোর চালিয়ে মাসে হাজার টাকার ওপর আমদানী। সেই একই রকম দু'হাতে খরচও করেন। খুব তাড়াতাড়ি তিনি চালাকপুরের আর্য-সমাজের সভাপতি হয়ে গেলেন। চাঁদা দেওয়ার ব্যাপারে সব সময় সকলের আগে দয়াচাঁদ, আর সেই সঙ্গে, যদি তিনি শহরে থাকেন, তাহলে প্রতি রবিবার সমাজ মন্দিরে উপাসনায় যোগ দেবেনই। এমন লোককে ডিঙিয়ে অন্য কেউ কি ও-পদের যোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে? আর্য-সমাজের মতবাদ জানতে বইপত্র ঘাঁটার দরকার নেই তাঁর। এমনিতে দয়াচাঁদ হিন্দী উর্দু দুটো ভাষাই জানেন, উর্দুতে আর্য-সমাজের যথেষ্ট বইপত্রও রয়েছে, কিন্তু পড়াশোনার ফুরসৎ কোথায়? তবে হ্যাঁ, মাসে চারটে রবিবার সমাজ মন্দিরে কয়েক ঘণ্টা করে ব্যয় করার দরুণ শাস্ত্র ব্যাখ্যা শোনার সুযোগ হয়, আর এইভাবে শুনতে শুনতে তিনি আর্য-সমাজের বহু বিষয়েই ওয়াকিবহাল হয়ে উঠেছেন। পাকা আর্য-সমাজী আর বড় একটা শহরে সমাজের প্রধান হওয়া সত্ত্বেও গোঁড়ামী আর ধর্মান্ধতা তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। মুসলমানদের সঙ্গেও তাঁর বেশ ভালো সম্পর্ক। তাঁর কারবারের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে বহু মুসলমান কর্মচারী। মুসলমানদের জলসা-পরবেও তিনি খুশি হয়ে চাঁদা দেন, খ্রীষ্টানদেরও কোনো চাঁদা-টাদার দরকার হলে সবার আগে সবচেয়ে মোটা রকম চাঁদা আসে দয়াচাঁদের কাছ থেকেই। তিনি এমন তাড়াতাড়ি চালাকপুরের মান্যগণ্য ব্যক্তিদের একজন হয়ে উঠলেন যে, অনেকে ব্যাপারটা বুঝতেও পারল না। মাত্র দশ বছর আগে তো তিনি তিরিশ টাকা মাইনের এক সামান্য কেরানী ছিলেন। ঈর্ষা করার মতো লোকও রয়েছে, কিন্তু তাদের সংখ্যা খুব কম। অবস্থাপন্ন ব্যক্তিদের অধিকাংশই দয়াচাঁদের প্রশংসা করে। নিজস্ব কারবার শুরু করার দশ বছরের মধ্যেই সরকার তাঁকে রায়বাহাদুর খেতাব দিলো। তাঁর রঙ-চেহারা, কুশলতা ও উদারতা দেখে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট রায়বাহাদুর খেতাবের সুপারিশ করতেও সঙ্কোচ বোধ করছিলেন। যদি ব্যাপারটা

তাঁর হাতে থাকত, তাহলে রায়বাহাদুর কেন সরাসরি সি. আই. ই. খেতাব দিয়ে দিতেন। এখন থেকে দয়াচাঁদ রায়বাহাদুর দয়াচাঁদ নামেই পরিচিত হতে লাগলেন

দুই

রায়বাহাদুর ইংরেজের একনিষ্ঠ ভক্ত। সব রায়বাহাদুরের পক্ষেই যেমনটি হওয়া উচিত। হাজার হলেও, ইংরেজদের রায়ে রায় (সায় দেওয়া) দিতে বাহাদুর বলেই না রায়বাহাদুর খেতাবটা দেওয়া হয়। তবু খেতাবের কি এই শেষ? রায়বাহাদুরের মনে সুপ্ত বাসনা ইংরেজ যদি নির্বিবাদে টিকে থাকতে পারে, তাহলে একদিন না একদিন স্যর এবং রাজা খেতাবও বাগিয়ে নেবেন। তখন লবণ সত্যাগ্রহ চলছে, লোকজনকে পেটানো হচ্ছে খুব আর জেলে ঠাসা হচ্ছে। সে সময় নিজের জেলা অফিসারদের কাছে রায়বাহাদুরের একমাত্র রায়, ঐ সব বদমাস লোকগুলোকে ডাণ্ডা মেরে ঠাণ্ডা করা হোক। তাঁর বিশ্বাস —ভারতবর্ষের লোকজনকে মানুষ করে তোলা, দেশে শান্তি ও সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠিত করাটা ইংরেজদের কাজ। কেউ ইংরেজ-রাজত্বির বিরুদ্ধে কথা বললে তাকে দু'চোখে দেখতে পারেন না তিনি। রায়বাহাদুর অনারারী ম্যাজিস্ট্রেটের পদও পাচ্ছিলেন, কিন্তু কাজকর্মের বড্ড চাপ —এই অজুহাতে তিনি সবিনয়ে তা প্রত্যাখ্যান করেন। রায়বাহাদুর ইংরেজের বড় ভক্ত, সুতরাং ইংরেজ-শাসন যারা উচ্ছেদ করতে চায়, তাদের কি তিনি ভালো চোখে দেখতে পারেন? কিন্তু তাঁর উদারতা কোনো এক শ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকেও টাকা দেন তিনি, বিশেষ করে যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্ব রয়েছে কোনো প্রভাবশালী কংগ্রেসী উকিলের হাতে। রায়বাহাদুর ভালো করেই জানেন, লোকের কাছে সোনা থাকা উচিত, আর 'সর্বে গুণাঃ কাঞ্চনমাশ্রয়ন্তি'। কোনো রাজনৈতিক আন্দোলন অত্যন্ত উগ্র হয়ে উঠলে সে সময়টা রায়বাহাদুরের পক্ষে চালাকপুরে বাস করা কঠিন হয়ে পড়ে। কিন্তু, তাঁর কারবার এখন বেশ কয়েকটি শহরে ছড়িয়ে পড়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তিনি খুব টাকা কামালেন, ওড়ালেনও খুব। এখন প্রায় মধ্যবয়স্ক। ব্যবসায়ে যখন এমন সফলতা দেখাতে পেরেছেন, তখন এ-বয়েসে বিয়ে করাটা এমন কি কঠিন? ঠিক এই সময় একটি সুশিক্ষিতা মেয়েকে বিয়ে করার সৌভাগ্য হলো তাঁর। তারপর শুরু হলো তাঁর দ্বিতীয় পুরুষের অগ্রগতি। রায়বাহাদুরের বাড়িঘর একজন আধুনিক ধনকুবেরের মতোই সাজানো-গোছানো। প্রথম মহাযুদ্ধের কালে আর্যসমাজীরা কম-সে-কম মেয়েদের মধ্যে ইংরেজি চাল-চলন ঢুকতে দেওয়ার ঘোর বিরোধী ছিল। রায়বাহাদুরও তাঁর বাড়ির মেয়েদের আর্য-নারী হিসেবে গড়ে তোলার জন্যে তাদের আর্য ভাষা ও সংস্কৃতের মধ্যেই আটকে

রাখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু যেখানে রায়বাহাদুর-পত্নী স্বয়ং ম্যাট্রিক পাস, সেখানে তিনি তাঁর মেয়েদের ওখানেই আটকে রাখবেন কি করে? রায়বাহাদুর ভালো করেই বুঝেছিলেন যে ইংরেজ রাজত্বে সাফল্য অর্জন করতে গেলে ছেলেমেয়ে উভয়কেই ছেলেবেলা থেকে ইংরেজি আদব-কায়দায় রপ্ত করানো দরকার, তাই তখন থেকেই তাঁর বাড়িতে শুরু হয় ইংরেজির দোর্দণ্ড প্রতাপ, তাই দেখে অনেকেই সেটা অনুসরণ করবেন কি-না ভাবছেন। হিরণ্যকশিপুর ঘরেও প্রহ্লাদের জন্ম হতে দেখা গেছে, কিন্তু এ-ব্যাপারে রায়বাহাদুর খুব ভাগ্যবান। তাঁর ছেলেমেয়েরা বাপের মতোই কংগ্রেস আর কংগ্রেসের কার্যকলাপ দু'চোখে দেখতে পারে না।

রায়বাহাদুরের পেল্লাই বৈঠকখানায় উচ্চপদস্থ ইংরেজরা নিমন্ত্রিত হয়ে আসেন, আর তাঁদের পান-ভোজনে আর্য-সমাজ বা হিন্দু ধর্মে গর্হিত বস্তুও চলে, সেগুলো তৈরি করে আনানো হয় ইংরেজ রেস্তোরাঁ থেকে। সেজন্য রায়বাহাদুরকে তাঁর অতি সমর্থক লোকজনেরও ঠাট্টা-মস্করা শুনতে হয় কখনো কখনো। সংসারে সেবা-ধর্ম বড় কঠিন। রায়বাহাদুর যখন শ্বেতাঙ্গ-সেবাকে একান্ত ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছেন, তখন নিজের লোকের কিংবা অপরের ঠাট্টা-মস্করায় তাঁর বিচলিত হলে চলবে কেন?

বড় বড় শিকার ধরার দিকেই সাধারণত রায়বাহাদুরের ঝোঁকটা বেশি। ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করতে চান না তিনি। বহুবার তিনি সর্বস্ব বাজি রেখে কোনো কোনো কারবারে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। তাতে ব্যর্থতার মুখ দেখতে হলে তাঁকে নিঃসন্দেহে কপনি ধারণ করতে হতো। কিন্তু তাঁকে সেরকম দুর্দিনের মুখ দেখতে হবে না, সে বিষয়ে তাঁর গভীর আস্থা রয়েছে, কারণ বহু বিঘ্ননাশক দেবতার পূজা-অর্চনা করে রেখেছেন তিনি। তাঁর অধিকাংশ কারবারই সরকারী ঠিকেদারী, তাতে তিনি কখনো কখনো নিজের সামর্থ্যের বহুগুণ বেশি ঠিকে নিয়ে নেন। ঝুঁকি থাকে, কিন্তু তা কলকাতা-বোম্বাইয়ের ফাটকাবাজীর মতো নয়। রায়বাহাদুর এভাবে এগিয়ে চলেছেন, কিন্তু মাঝে মাঝে তাঁর বড় দুঃখ হয় যে বিদ্রোহী কংগ্রেসীদের বিরুদ্ধে ইংরেজদের যেরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত, সেরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে তারা ইতস্তত করছে। ভারতের অন্যান্য অনেক প্রদেশের (যদিও তাঁর নিজের প্রদেশের নয়) শাসনভার এইসব বিদ্রোহীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। তাতে রায়বাহাদুরের শ্বেতাঙ্গপ্রীতিতে বড় ঘা লেগেছে। প্রথমে তো একজন যথার্থ ভক্তের মতোই তিনি তেলে-বেগুনে জলে উঠেছিলেন, পরে ভাবতে লাগলেন, শেষ পর্যন্ত না আবার 'নাও পর গাড়ি' মেনে নিতে হয়। একটা ঝুড়িতেই সব ডিম রাখতে নেই কথাটা বোধগম্য হলো তাঁর। নিজের প্রদেশে যদিও কংগ্রেসের নয়, একান্ত ইংরেজ-ভক্তদেরই রাজত্ব, তবু রায়বাহাদুর দূরদর্শী, শুধু বর্তমানের দিকেই তাঁর নজর নেই, ভবিষ্যতের কথাও তিনি ভাবেন। ইংরেজদের প্রতি একাগ্র ভক্তির জোরেই তিনি এখনও টাকা-পয়সা কামাতে পারেন, সেই-

ভাবেই চালিয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু ভেতরে ভেতরে বেশ ঘোটানায় পড়ে গেলেন। ইংরেজদের প্রতি রায়বাহাদুরের গভীর আস্থায় চিড় খাওয়ার অন্যতম কারণ হলো, যেখানে সবরকম সামরিক-অসামরিক ঠিকেদারদের মধ্যে এতদিন ধরে হিন্দুদের একাধিপত্য চলে আসছিল, সেখানে ইংরেজ এখন মুসলমানদেরও পিঠ চাপড়াচ্ছে, মুসলমান ঠিকেদাররাও ইদানীং জোর প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিজের রাজ্যে সামনে এগোনোর পথে বাধা দেখা দেওয়ায় আজকাল তিনি প্রতিবেশী রাজ্য-গুলোতেও কারবার বাড়াতে শুরু করেছেন! যুদ্ধ শেষ হতে না হতেই রায়-বাহাদুরের মধ্যাহ্ন-সূর্য দিগন্তের দিকে চলে পড়তে শুরু করল। বেশ কয়েকটি বড় বড় ক্ষতি স্বীকার করতে হলো তাঁকে, কিন্তু তবু, একেবারে বেসামাল হয়ে পড়ার অবস্থা এখনও হয়নি।

তিন

যুদ্ধের পর যতদিন না ইংরেজরা ভারতের শাসনভার ভারতীয়দের হাতে সঁপে দিয়ে চলে গেলো, ততোদিন পর্যন্ত রায়বাহাদুরের এ রকম অবস্থাতেই কাটল। পরিস্থিতি এত দ্রুত বদলে যেতে লাগল যে, রায়বাহাদুরের মতো তীক্ষ্ণ মেধাসম্পন্ন ব্যক্তিও কোনো কিছু ভেবে উঠতে পারছিলেন না। রোজগারপাতির নতুন ধান্দার কথা ভাবছেন, ঠিক এমন সময়, ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট, ইংরেজরা ভারত ছেড়ে স্বদেশে পাড়ি দিলো। আর তারপরই রায়বাহাদুরের নিজের প্রদেশেই জ্বলে উঠল আগুন, পাততাড়ি গুটিয়ে সেখান থেকে কেটে পড়তে হলো তাঁকে। কিন্তু অন্যান্য লোকের মতো তাঁকে কপর্দকহীন অবস্থায় দেশ ছেড়ে পালাতে হয়নি। রাজধানী দিল্লীতেও তিনি কারবার শুরু করে দিয়েছিলেন, মাত্র কিছুদিন আগে মধুপুরীতেও একটা বেশ বড় হোটেল কিনে ফেলেছেন। কেনার সময় টাকা-পয়সার টান পড়ায় ধার করে ইংরেজ মালিককে হোটেলের দাম শোধ করেছেন।

রায়বাহাদুরের মধ্যাহ্ন-সূর্য চলে পড়েছে, সেই সঙ্গে বয়েসও গড়িয়ে গেছে অনেক। নতুন নতুন উপায় উদ্ভাবনের আর সে-ক্ষমতা নেই, সে-সাহসও নেই, কিন্তু যে-বুদ্ধির জোরে তিনি এ রকম জায়গায় এসে পৌঁছতে পেরেছেন, এত বড় তুফানের মধ্যে খেয়া-তরীর মতো সেই বুদ্ধিটুকু এখনও রয়েছে। রায়বাহাদুর মধুপুরীতে বাস করবেন বলে ঠিক করলেন। তাঁর সবচেয়ে বড় কারবার এখানকার সবচেয়ে বড় হোটেলটির মাধ্যমেই, সেজন্যও তাঁকে মধুপুরীতে বসবাস করার কথা বিবেচনা করতে হয়েছিল। মধুপুরীতে আসার সময়েও তার ইংরেজপ্রীতি অতোটা শিথিল হয়ে পড়েনি, কিন্তু চালাকপুরে তাঁর সর্বতোমুখী শ্বেতাঙ্গ-আরাধনার ইতিহাস পেছনেই পড়ে আছে, তাই ঐ জন্যে যে লোকে তাঁকে আঙুল দিয়ে দেখাবে, সে ভয় নেই। মধুপুরীতে তাঁর শ্বেতাঙ্গ-সেবাটা পুরোমাত্রায় তখনও শুরু হয়নি, ঠিক

এমন সময় তাঁর উপাস্য দেবতা পিঠ টান দিলেন। শ্বেতাঙ্গ দেবতাদের প্রতি তাঁর ভক্তি-রসের ধারাটিকে তিনি ঘুরিয়ে দিলেন কংগ্রেসী দেবতাদের দিকে। তাঁর বুদ্ধি যেকথা বলে, তা হলো, যেদিকে সূর্য উঠবে, সেদিকেই মাথা নোয়াবে। কংগ্রেসে সরাসরি ঢুকে পড়তে রায়বাহাদুরের এখনও ইতস্তত ভাবটা রয়েছে। মধুপুরীর কংগ্রেসী পাণ্ডারাও নতুন প্রতিদ্বন্দ্বীকে ভেতরে ঢুকতে দিতে চায় না। রায়বাহাদুরের অতীত ইতিহাস তাদের জানা নেই, কিন্তু তাতে কি? তাঁর বিরুদ্ধে অনর্গল মিথ্যে প্রচার চালানোর ক্ষমতা তাদের আছে। কিন্তু রায়বাহাদুর তো ধরেই নিয়েছেন যে, নতুন সূর্যের একনিষ্ঠ আরাধনা তাঁকে করতেই হবে। মধুপুরীর সবচেয়ে বড় বিলাসবহুল হোটেল তাঁর হাতে তো রয়েছেই।

মধুপুরী ছেড়ে পালানোর সময় ইংরেজরা যখন তাদের বাড়িগুলো জলের দরে বিক্রি করে দিচ্ছিল, তখন বড় বড় শেঠরা সেগুলোর অনেকই কিনে নিয়েছিল। কতোজন তো বাড়ি কেনার টাকাটা তাদের কারখানার শ্রমিক-কল্যাণ ফাণ্ড থেকে মিটিয়ে দিয়েছিল। তাতে এক যাত্রায় দুটি ফল লাভ হয়েছে—শ্রমিক-কল্যাণ ফাণ্ডে যত টাকা ঢালা হয়েছিল, তার ওপর ইন্‌কাম-ট্যাক্স দিতে হয়নি, আর কল্যাণ ফাণ্ড থেকে কেনা বাড়িগুলোতে কালি-ঝুলি মাখা শ্রমিকরা এসে বাস করবে আর মধুপুরীর মজা লুটবে, তার সম্ভাবনাও নেই। তা সে কল্যাণ ফাণ্ড থেকেই বাড়ি কেনা হোক আর সংস্কার করা হোক, সেগুলোতে এখন শেঠ পরিবারের লোকজনেরাই বাস করে। গরিব-গুর্বোদের জন্যেই আইন, বড় লোকেরা আইনের ঊর্ধ্বে থাকে। তা সে নিরেট ধোঁকাবাজিই হোক, আর মজদুরদের হকের পয়সা শেঠদের বিলাসবহুল বাড়ির পেছনে ব্যয় করাই হোক, কিন্তু যখন সেইসব বিলাস-বহুল বাড়িতে আইনের ধারক-বাহক, সরকারের বড় বড় মন্ত্রী স্বয়ং এসে বসবাস করেন, তখন কার এমন বুকের পাটা যে শেঠদের দিকে আঙুল তুলে দেখাবে? শেঠরা শ্রমিক-কল্যাণ ফাণ্ডে লাখ লাখ টাকা এমনি এমনি ঢালে না। যারা চোরা বাজারির কোটি কোটি টাকা আর ইন্‌কাম-ট্যাক্সের মোটা অঙ্ক হজম করে ঢেকুর পর্যন্ত তোলে না, তাদের কাছে এই কয়েক লাখ টাকা কিছুই না। যদিও মধুপুরীর মতো শৈলাবাসে এইসব বাড়ি, যা ইংরেজদের কাছ থেকে কিনতে আর সেগুলো সাজাতে লাখ লাখ টাকা খরচ করা হয়েছে, শ্রমিক-কল্যাণ ফাণ্ড থেকে কেনার সময় যদিও উদ্দেশ্যটা অন্যরকম ছিল, তবুও সেগুলোকে এখন মন্ত্রী এবং বড় বড় আমলাদের গেস্ট-হাউসের কাজে ব্যবহার করাটাই বেশি উপযুক্ত বলে মনে করা হচ্ছে। তবে হ্যাঁ, দেবতারা তো আর সব সময় এসে অধিষ্ঠিত হয়ে থাকতে পারেন না, তাই বাকি সময় শেঠ পরিবারের লোকজনেরাই ওগুলো ব্যবহার করে থাকে।

শেঠদের এইসব গেস্ট-হাউসের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া রায়বাহাদুরের পক্ষে সহজ নয়। রায়বাহাদুরের অবস্থাটা দশ-বিশ লাখের মধ্যেই, সেখানে জগৎশেঠ বছরে

কোটি কোটি টাকা মুনাফা করেন। তিনি তাঁর গেস্ট-হাউসে দেবতাদের যেরকম হাত উপুড় করে খাতির-যত্ন করতে পারেন, অতোটা রায়বাহাদুরের সামর্থ্যে কুলোয় না। কিন্তু রায়বাহাদুরের এমন কিছু ব্যাপার আছে, যা আবার শেঠদের নাগালের বাইরে। মধুপুরীর সবচেয়ে বড় আর সবচেয়ে বিলাসবহুল হোটেলে আধুনিক আরাম-আয়েসের যতরকম ব্যবস্থা এক জায়গায় হাজির করানো সম্ভব, শেঠদের গেস্ট-হাউসে তা কখনোই সম্ভব নয়। তা বুড়ো দেবতারা শেঠদের ঐ সব অতিথি সেবায় সন্তুষ্ট হতে পারেন, কিংবা তার চেয়েও অধিক, মাঝে মাঝে জুটে যাওয়া উপহারে ভুলে যেতে পারেন, কিন্তু দেবকুমার, দেবকন্যা আর দেববধূরা মধুপুরীতে নির্জনবাসের জন্যে আসে না। তাদের এমন জায়গার দরকার, যেখানে নতুন সোসাইটি তাদের পূর্ণ যৌবন ও রূপলাবণ্যে ঝলমল করে উঠবে। মা-বাবা কিংবা শ্বশুর-শাশুড়ীর কংগ্রেসী হওয়ার মানে এই নয় যে, তারা তাদের সাত পুরুষের ভাগ্যকে কংগ্রেসের নামে বন্ধক দিয়ে রেখেছে। আজকাল তো বড় বড় মুখ্য-মন্ত্রীর স্ত্রী-কন্যারা একবারের চুল-ছাঁটা, শ্যাম্পু আর কেশসজ্জার পেছনে শত শত টাকা ঢেলে দেয়। প্রদীপের নিচেই যখন অন্ধকার, তখন নতুন প্রজন্মের গান্ধী-বাদীদের কাছ থেকে আশা করা যায় না যে, তারা রক্তবর্ণ মদিরায় নিজেদের বঞ্চিত করে রাখবে। সংক্ষেপে বলতে গেলে, এইসব দেবকুমার, দেবকন্যাদের যেরকম নাচ-ঘরের, পান-ভোজনের দরকার, যে-ধরনের লোকজনের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ আলাপ-পরিচয় করার ইচ্ছে, রায়বাহাদুরের হোটেলই তাদের সেই সব প্রয়োজন বেশ ভালোভাবে মেটাতে পারে। এই কারণেই রায়বাহাদুর শেঠদের একেবারে পেছনে পড়ে যাননি। কতোবার দেখা গেছে, বুড়ো বাপ-মা শেঠদের গেস্ট-হাউসে উঠেছেন। আর তাঁদের সুপুত্র, সুকন্যারা রায়বাহাদুরের হোটেলে। যদি সেইসব দেবতাদের পুজো করে ওরা কোটি কোটি টাকা কামাতে পারে, তবে রায়বাহাদুরও খালি হাতে যান না। গত ডামাডোলের সময় তাঁকে বড় অসুবিধের দিন কাটাতে হয়েছে। পাওনাদারদের চাপ ছিল, ইন্‌কাম-ট্যাক্সের লোকদের জ্বালাতন ছিল, আবার নিজের রাজ্যে ফেলে-আসা সম্পত্তি সবটাই হাত-ছাড়া হয়ে যায় কি-না, সে-ভয়ও ছিল। কিন্তু রায়বাহাদুর দেবতাদের উপাসনা করে নিজের টলমলে নৌকোটা ফের ঠিক করে নিয়েছেন। আগে রাতের পর রাত ঘুম হতো না তাঁর, সব সময় ভয় করত, কি জানি কখন ডিক্রি জারি হয়, বাড়ির লোকজন সমেত হোটেল থেকে বেরিয়ে গিয়ে পথের ভিখিরী না হতে হয়। এখন তিনি দেবতাদের আশীর্বাদ লাভ করেছেন। সব দেওয়া-থোওয়া করেও এই বিশাল হোটেলটি বর্তমানে তাঁর ঋণমুক্ত সম্পত্তি। হোটেল এবং আরও কিছু সম্পত্তি মিলিয়ে বিশ-পঁচিশ লাখ টাকার নিষ্কণ্টক জায়দাদ তাঁর হাতে।

আগেই বলেছি, রায়বাহাদুর এখন আর যুবক নন। খাওয়া-দাওয়ার ফলে এমনিতে তাঁকে দেখতে প্রৌঢ় বলে মনে হয়, নইলে বার্ধক্যের সীমানাতেই পা

ফেলেছেন তিনি। এই অবস্থায় নিত্য-নতুন পরিকল্পনা খাড়া করার কাজ তাঁর পুত্র-কন্যাদের। শেষ বয়েসের মান-মর্যাদা বজায় রাখতে তিনি যা পেরেছেন তাতেই সন্তুষ্ট। বিশ-পঁচিশ লাখ টাকার নিষ্কণ্টক সম্পত্তি কম নয়। রায়বাহাদুর ভবিষ্যতের চিন্তা-ভাবনা থেকে এখনও মুক্তি পাননি। বরং যৌবনকালে যে সেবাব্রতে দীক্ষা নিয়েছিলেন, এখনও তা বেশ ভালোভাবেই পালন করতে পারেন। মধুপুরীর সবচেয়ে বড় হোটেলটিকে বাদ দিয়ে এ ধরনের উপাসনার যোগ্য মন্দির আর কোথায়? ছোট-বড় যে-কোনো মন্ত্রী মধুপুরীতে আসুন না কেন, তাঁকে আপ্যায়ন করার জন্যে রায়বাহাদুর একটি ভোজের আয়োজন না করে থাকতে পারেন না। এখানে একটা কথা বলা দরকার, ইংরেজরা চলে যাওয়ার পর তাদের দেওয়া রায়বাহাদুর, স্যর ইত্যাদি খেতাবগুলো যখন পরিত্যক্ত হলো, তখনও অনেকদিন পর্যন্ত রায়বাহাদুর অতি কষ্টে বাগানো তাঁর খেতাবটি ত্যাগ করতে চাননি। কিন্তু, আজকাল তো কাগজপত্রে কোথাও ইংরেজদের দেওয়া খেতাব চোখে পড়ে না, আজীবন যাঁদের স্যর নামে ডাকা হয়েছে, তাদেরও আজকাল শুধু মিস্টার বলা হয়, কেবল 'স্টেট্‌স্‌ম্যান'-ই খুব সুপরিচিত হলে প্রবীণ মহাপুরুষদের নামের সঙ্গে 'স্যর' উপাধিটি জুড়ে দেয়। তাহলে দয়াচাঁদ নিজেকে কি করে আর রায়বাহাদুর বানিয়ে রাখার আশা করবেন? এখন তাঁর চাকর বাকরেরা তাঁকে বড় সাহেব বলে, ছোট সাহেব তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রের জন্যে সংরক্ষিত। অন্যান্যরা তাঁকে লালাজী কিংবা অন্য কোনো নামে সম্মান দেখাতে চায়, কিন্তু যদি তাঁর মনের কথা বলতে বলেন, তাহলে বলতে হয়, 'রায়বাহাদুর' নামে তাঁকে সম্বোধন করলে তিনি এখনও যথেষ্ট পুলকিত হন। আজও তিনি বুঝতে পারেন না ইংরেজরা চলে যাওয়াতে 'রায়বাহাদুর'—এই বিশুদ্ধ ভারতীয় শব্দটি বর্জিত হলো কেন!

চার

যদিও রায়বাহাদুর আগেকার মতোই সেবাব্রতে নিষ্ঠাবান, তবুও ইংরেজরা চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সেই একাগ্র ভক্তিও চলে গেছে। যখন তিনি শ্বেতাঙ্গ প্রীতি শুরু করেছিলেন, তখন ভেবেছিলেন, উঁচু জাতের মেয়ের মতো সারা জীবনের জন্যে তাঁর এই একটাই বিয়ে হলো। মীরা যেভাবে বলতেন, 'আমার শুধু কৃষ্ণ গোপাল, অন্য কেহ নয়,' রায়বাহাদুরও তেমনি গদগদ কণ্ঠে গাইতেন, 'আমার শুধু শ্বেতাঙ্গ প্রভু, অন্য কেহ নয়।' শ্বেতাঙ্গ প্রভু মহাপ্রয়াণ করেছেন, কিন্তু রায়বাহাদুর তাঁর সঙ্গে সতী হতে পারেননি। শুধু তাই নয়, তাঁকে আরও অনেক প্রভুর সঙ্গে পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হতে হয়েছে। এই নতুন জীবনে রায়বাহাদুরের মনে কোনো ক্ষোভ নেই, যদিও-বা ছিল, তা অল্প কয়েকদিনের জন্যেই। এখন তাঁর ভক্তি,

ভালোবাসার পাত্র অনেক। কংগ্রেসী মন্ত্রী ও নেতারা তো বটেই, ইংরেজ আমলে যেসব আমলারা উচ্চ পদমর্যাদা ভোগ করত আজও তারা সমান ক্ষমতাশালী, সেইসব আমলারাও তাঁর ভক্তিভাজন। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে তিনি দেবতাদের দেখাদেখি জনতা-জনার্দনের সেবাতেও যথেষ্ট উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। মধুপুরীর হরিজনদের তিনি সবচেয়ে বেশি সমব্যথী। তাদের উপকার করার জন্য যেখানেই ছোটাছুটি করতে হোক, যতবারই টেলিফোনের ডায়াল ঘোরাতে হোক, তিনি তার জন্য সব সময় প্রস্তুত। বড় ছেলেটি হোটেলের কাজকর্ম শিখে নিয়েছে, তাই পুরো সময়টা সেবাব্রতে ব্যয় করতে রায়বাহাদুরের আর কোনো পিছুটান নেই। তাঁর হরিজন প্রেমে মন্ত্রীরাও খুব সন্তুষ্ট, সেজন্য তিনি হরিজনদের কোনো দাবি-দাওয়া নিয়ে গেলে তাঁকে খালি হাতে ফিরতে হয় না। কিন্তু এইটুকুতেই তো রায়বাহাদুর খুশি হতে পারেন না? তিনি মধুপুরীর শ্রমিকদের দুঃখকষ্টও দূর করতে চান। তাঁকে বাদ দিয়ে অন্য কারোর পক্ষে কি শ্রমিকদের নেতৃত্ব লাভ করা সম্ভব? তিনি শ্রমিক সভা সংগঠিত করেছেন, কৃতজ্ঞতা স্বরূপ সভা তাঁকে সভাপতি মনোনীত করেছে। নিজে লক্ষপতি হওয়া সত্ত্বেও যখন তিনি নোংরা ময়লা কোট-পাতলুন গ্রাহ্য না করে শ্রমিকদের সঙ্গে একই আসরে বসতে ইতস্তত করেন না, নিজের অলকাপুরীতুল্য হোটেলে তাদের চা খেতে নেমন্তন্ন করেন, তখন তিনি তো তাদের প্রিয়পাত্র হবেনই। শ্রমিক-নেতাদের জন্য তাঁর বাড়ির দরজা সব সময় অবারিত, সব সময় তারা সেখানে স্বাগত সম্ভাষণ লাভ করে। মধুপুরীর শ্রমিকরাও বলতে গেলে অধিকাংশই পাঁচ মাসের। গ্রীষ্মকাল আর শরৎকালের ছোট-বড় সীজন শেষ হতেই তারা পুনরায় তাদের পাহাড়ী গাঁ-ঘরে ফিরে যায়। এমন শ্রমিকদের সংগঠন তৈরি করা সোজা কাজ নয়। রায়বাহাদুরকে বাহবা দিতে হবে যে তিনি তাদের সংগঠন তৈরি করেছেন, তাদের অসুবিধের কথা ওপর মহলে পৌঁছানোতে সহযোগিতা করেছেন, তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তির ফলে কর্তৃপক্ষ কিছু কিছু ব্যাপার মেনেও নিয়েছেন। বাকি যেটুকু—তা রায়বাহাদুরও চান না, রায়বাহাদুরের কৃপাপাত্র অন্যান্য শ্রমিক-নেতারাও চায় না যে মধুপুরীতে শ্রমিকরাজ কায়েম হোক। আর মধুপুরীতে শ্রমিকরাজ কায়েম হওয়ার স্বপ্ন দেখে, এ রকম যথার্থ শ্রমিক-হিতৈষী যদি মধুপুরীতে না দেখা যায়, তাহলে রায়বাহাদুরের শ্রমিক-নেতা হয়ে যাওয়াতে কোনো অভিযোগ উঠবে কেন? অন্যত্র যেমন, তেমনি মধুপুরীতেও, মাথার ঘাম পায়ে ফেলার মতো লক্ষপতি শ্রমিক-নেতার অভাব নেই।

* * *

রায়বাহাদুর সত্যি-সত্যিই তাঁর ডিমগুলোকে আলাদা আলাদা ঝুড়িতে রেখে দিয়েছেন। একটা ঝুড়ির ডিম যদি খারাপও হয়ে যায়, তাতে খুব বেশি ক্ষতির সম্ভাবনা নেই। কংগ্রেসী দেবতাদের সঙ্গে তাঁর মহরম-মহরম শুরু হয়ে গেছে যখন, তখন স্থানীয় ছোট-বড় নেতারা তাঁর পথ আটকাবে কি করে? যদি বলেন,

খোশামোদ করতে করতে রায়বাহাদুর নিজের মান-মর্যাদা ধুলোয় লুটিয়েছেন, তাহলে দুনিয়াশুদ্ধ লোক জানে, কংগ্রেসীরাও ধোয়া তুলসী পাতা নয়। তারাও তাদের আগেকার মেহনতের দাম পাওনার চেয়ে বেশিই তুলে নিয়েছে, নিচ্ছেও এখনো। পারমিট-কন্ট্রোলের কল্যাণে, তারা নিজেদের শক্তি-সামর্থ্য অনুযায়ী ভাই-ভাইপো-ভাগ্নেসহ সারা জাতি-গুষ্টির চাকরির ব্যবস্থা করে দিয়েছে। কাচের ঘরে বসে অন্যের গায়ে ঢিল ছোঁড়া কি সম্ভব? তার ওপর শাসন-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্যে কংগ্রেস-মহাদেবরা তো ঘোষণাই করে দিয়েছেন, 'অতীতের কথা ভুলে যাও।' আর সেইজন্যেই তো বিয়াল্লিশের আন্দোলনে যেসব অফিসাররা দেশ-প্রেমিকদের খুনে হাত লাল করেছিল, তারা আজ আগের চেয়েও উঁচু উঁচু পদে পৌঁছে গেছে, আগের চেয়েও তাদের মান-সম্মান বেড়েছে। ইংরেজের জুতো চাটতে চাটতে, তাদের আঙুলের ইশারায় দেশ-প্রেমিকদের ওপর অকথ্য অত্যাচার চালাতে চালাতে যাদের মাথার চুল সাদা হয়ে গেছে, তারাই আজ দিল্লীর দেবতাদের সবচেয়ে বেশি অনুগ্রহ-ভাজন, তারাই বস্তুত সরকারী খেয়া-তরী বাইছে। শুধু আমলারাই নয়, পূর্বকালে যাদের দেশদ্রোহী বলা হতো, ইংরেজের সেইসব একনিষ্ঠ ভক্তরাও এখন উঁচু উঁচু পদে সসম্মানে বিরাজ করছে। 'গণিকা গৃধিনী, অজামিলদের' যখন আমাদের মহাপ্রভুরা শুধু প্রশ্রয়ই দেয়নি, নিজেদের পরিবার-পরিজনদের মধ্যে যথেষ্ট উঁচুতে আসন দিয়েছে—কারোর ছেলের সঙ্গে নিজের মেয়ের বিয়ে দিয়েছে, কারোর মেয়েকে বাড়ির বউ করে নিয়ে এসেছে, মানে একসঙ্গে মেয়ে আর ধন-দৌলত উভয়ই—তখন রায়বাহাদুর বেচারী কি এমন দোষ করেছেন? তিনি শ্বেতাঙ্গ-প্রীতি দেখিয়েছেন ঠিক, কিন্তু তা করতে গিয়ে সেরকম আততায়ী হননি কখনও, যেরকম আততায়ী আমলাদের এবং অন্যান্য লোকদের আজকাল উঁচু উঁচু পদে স্বমহিমায় বিরাজমান দেখা যায়।

* * *

মাত্র দু'বছর আগে যদি বলা হতো, রায়বাহাদুর মধুপুরীর কংগ্রেসের সভাপতি, এখানকার সবচেয়ে বড় কংগ্রেসী নেতা হতে চলেছেন, তাহলে কথাটা কেউ বিশ্বাস করত না। কিন্তু কে বলবে যে আমাদের দেশে সর্বত্র কচ্ছপের গতিতে সব কাজ হয়? এটা ঠিক, অফিসে-দপ্তরে ফাইল কচ্ছপের চেয়েও ঢিমে তালে চলে—ইংরেজ আমলে যে-কাজ একজনে ঠিক সময়ে করতে পারত, এখন তার জন্যে পাঁচজন লোক রাখা হয়েছে, তবুও, একটা ফাইলের কিছু অংশ যতক্ষণ না উইপোকায় কাটে, ততোক্ষণ সেটা নড়ে না। একদিকে এমন মন্দগতি দেখা গেলেও অন্য ক্ষেত্রে লোকজনের দ্রুত উন্নতি আমাদের চোখে পড়ে। দু'শো টাকা যার মাইনে, চোখের পলক পড়তে না পড়তে পনেরোশো টাকা মাইনের চেয়ারে গিয়ে বসে পড়ছে। যেসব পরিবারের মধ্যে কোনো বিষয়েই কারোর কোনো প্রতিভা কখনও চোখে পড়েনি, এখন সেইসব পরিবারের প্রায় সবাইকে গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরগুলিতে দেখা যায়। যদি কয়েক

বছরের রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সিভিল-লিস্টে চোখ বুলানো যায়, তাহলে সহজেই প্রতীয়মান হবে যে সরকারের কাজকর্মে সবকিছুই ঢিমে তালে চলে না। তবে বছর দু'য়েকের মধ্যেই রায়বাহাদুর যদি মধুপুরীর নিরঙ্কুশ নেতৃত্ব লাভ করেন, তাতে বিস্মিত হওয়ার কি আছে? ইংরেজ আমলে মধুপুরীতে কংগ্রেসীদের সংখ্যা অতি নগণ্য ছিল। যেখানে ইংরেজদের একটা বড় আস্তানা, যেখানে বছরে চার মাস যথেষ্ট সংখ্যক গোরা সৈন্য এসে ঘাঁটি গেড়ে বসে, যেখানে জীবিকার্জনের সমস্ত পন্থাই সেইসব শৈলবিহারীদের ওপর একান্তভাবে নির্ভরশীল, যারা স্বপ্নেও ইংরেজ-প্রীতিতে বিরূপ হওয়ার কথা ভাবতে পারে না, সেখানে অধিক সংখ্যক দুঃসাহসী কংগ্রেসী জুটবে কি করে? হাত-পা বাঁচিয়ে কিছু কিছু লোক কংগ্রেস সম্পর্কে কথাবার্তা চালাত, আশপাশে কোনো গোরা না থাকলে হয়ত মাথায় গান্ধী টুপিও পরে নিত, খুব একটা মার-ধোর না খেয়ে হয়ত কিছু লোক জেলখানাতেও যেত। ব্যস, ঐ ক'জনই। তারাই কেবল রায়বাহাদুরকে কংগ্রেসের নেতা হওয়ার অযোগ্য বলে মনে করে। কিন্তু মধুপুরীর এইসব কূপমণ্ডুকেরা কংগ্রেসের খোঁজ-খবর যেটুকু রাখে, তার চেয়ে অনেক বেশি খোঁজ-খবর রাখেন রায়বাহাদুর। তিনি মনে করেন, স্থানীয় নেতৃত্বের মূল এখন আর জনসাধারণের মধ্যে নয়, ওপর তলার নেতা আর মন্ত্রীদের অনুগ্রহের মধ্যেই নিহিত এবং তা লাভ করার সুবিধে তাঁরই বেশি। যদি কেউ এক পহর বেলা অব্দি ঘুমিয়ে থাকে, তারপর হঠাৎ জেগে উঠে চোখ কচলে দেখে, 'বুলবুলিতে সব ধান খেয়ে গেছে,' তাহলে সে-দোষটা তার নিজেরই। মধুপুরীতে কংগ্রেসের নেতৃত্বে এখন আর রায়বাহাদুরের কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নেই।

হাজার বছর ধরে মিথিলা (বিদেহ) প্রাচীন বিদ্যার রত্নাগার হয়ে আছে। মিথিলার রাজা জনক হাজারটি গাভী পুরস্কার ঘোষণা করে ব্রহ্মবিদ্যায় পণ্ডিতদের টুর্নামেন্টের আয়োজন করে যে যজ্ঞ শুরু করেছিলেন, আজও তা অবাধে চলে আসছে। সর্বত্রই ব্রাহ্মণেরা সংস্কৃতকে একটা অকেজো বিদ্যা ভেবে প্রায় পুরোপুরি বয়কট করেছেন, তার জায়গায় গ্রহণ করেছেন অর্থকরী বিদ্যা ইংরেজি, কিন্তু মৈথিলী ব্রাহ্মণেরা অনেক কাল পরে, তাও আবার খুব অল্প-স্বল্পই, ইংরেজির দিকে ঝুঁকেছেন। সংস্কৃতের এত স্কুল-পাঠশালা ভারতবর্ষের আর কোনো রাজ্যে বা জেলায় খুঁজে পাওয়া যাবে না, বিভিন্ন সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়ন করে জীবনের অর্ধেকটা কাটিয়ে দেওয়ার মতো এত ছাত্রও দেখা যাবে না কোথাও। দরিদ্র ছাত্র যারা, তারাও সেখানে ছাত্রবৃত্তি পেয়ে অথবা কোনো ধনী ব্যক্তির বাড়িতে মুফতে খেয়ে দেয়ে সংস্কৃত পড়তে পারে। এ-ব্যাপারটা শুধু ঐ সংস্কৃতের বেলাতেই। ইংরেজি পড়ার জন্যে দরিদ্র ছাত্রেরা স্কুলের ফী, বইপত্রের দাম, খাওয়া-থাকার খরচ কোথায় পাবে? মিথিলা এ পর্যন্ত বহু শ্রেষ্ঠ দিগ্‌গজ পণ্ডিত তৈরি করে মণ্ডন মিশ্র, বাচস্পতি মিশ্র, উদয়ন, পার্থসারথী মিশ্র এবং গণেশ উপাধ্যায়ের ঐতিহ্যপূর্ণ পরম্পরাটিকে অক্ষুণ্ণ রেখেছে। আজকাল চাল-গমের দাম চতুর্গুণ বেড়ে গেছে, সেজন্য আগে যে-পাঠশালায় কুড়িজনকে বৃত্তি দেওয়া হতো, এখন সেখানে পাঁচ-জনকে দেওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। বড় বড় জমিদারী উঠে যাওয়াতে এইসব পাঠশালা আর পাঠশালার ছাত্রদের কাছে খারাপই হয়েছে। বহুকাল আগে থেকেই সংস্কৃত পণ্ডিতদের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় বেশি, সেজন্য মিথিলার পণ্ডিতদের সারা উত্তর ভারতে প্রবাস-জীবন যাপন করতে হয়। যেখানে এক একটি গাঁয়ে ডজন ডজন তীর্থ আর আচার্য, সেখানে গাঁয়ে থাকলে কে কাকে অধ্যাপকের কাজ দেবে?

অসহযোগ আন্দোলনের সময়, অন্য রাজ্যের চেয়ে, এমন কি সারা ভারতের তুলনায় বিহারে আগুন জ্বলেছিল সবচেয়ে বেশি। কিন্তু মিথিলার সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা তাতে আদৌ গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেননি। যেখানে বালকদের অল্প বয়স থেকেই পাঁচ শতাব্দী আগেকার শিক্ষা-দীক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে, আর সেই প্রাচীন চিন্তা-ভাবনাতেই গড়ে তোলা হয় তাদের, সেখানে বিচক্ষণ তর্কশাস্ত্রী ও

বুদ্ধিবাদীও যদি কূপমণ্ডূক হয়ে থাকেন, তাহলে তাতে অবাক হওয়ার কি আছে? তাঁরা একটি সংস্কারও ত্যাগ করতে রাজী নন। তাঁদের কেউ অন্য রাজ্যে গেলে সন্দেহ পোষণ করা হয়—নিশ্চয়ই সেখানে কিছু অখাদ্য খেয়েছেন, কিংবা কারোর হাতের জল স্পর্শ করেছেন, তাই দেশে ফিরলেই নিয়ম মাফিক প্রায়শ্চিত্ত করতে বাধ্য হতে হয়, ভালো রোজগারপাতি থেকে পঁচিশ-পঞ্চাশ টাকা স্বজাতিদের জন্যে ভোজ এবং ব্রাহ্মণ-ভোজনে ব্যয় করতে হয়! মিথিলায় পুরনো আহার-বিহার আজও মেনে চলা হয়। 'পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্ষ্যাঃ' মহাবাক্য অনুসরণ করে সেখানকার মহান্ পণ্ডিত ও ধর্মশাস্ত্রীরাও শুধু মাছ-মাংসেই নয়, কচ্ছপ থেকেও নিজেদের বঞ্চিত রাখেন না, যেহেতু কচ্ছপেরও পাঁচটি নখ বিদ্যমান। কিন্তু কচ্ছপের মাংস ও মাছ খাওয়াটাও সাত্ত্বিক পদ্ধতিতে হয়, তাতে পেঁয়াজ-রসুন পড়ে না। খাওয়ার বেলাতেও শুচিতা মেনে চলা হয়, চৌকার বাইরে খাওয়া যেমন নিষিদ্ধ, তেমনি আবার স্বজাতির হাতের রান্না ব্যতীত, অন্য কারোর রান্না হলে তাকে খাদ্য বলে স্বীকার করা হয় না। যখন ভূগোলের জ্ঞানকে সেকালের পাঠ্যপুস্তকের মধ্যেই গণ্ডীবদ্ধ করে রাখা হয়েছে, কারণ আধুনিক ভূগোলের আবিষ্কার তো আর সে-যুগে হয়নি, তাহলে ভারতের মানচিত্রে কোন দেশ কোথায় আছে, তার হদিস পাওয়া যাবে কি করে?

গুরুজী এই মিথিলারই এক রত্ন। তিনি শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করেছেন চিরাচরিত প্রথায়। অক্ষর পরিচয়ের জন্যে কোনো প্রাইমারী স্কুলে যাননি, পুরনো নিয়ম অনুযায়ী গাঁয়েরই এক সংস্কৃত-পণ্ডিতের কাছে তাঁর বর্ণ পরিচয়। যদি দু-তিন বছর কোনো প্রাইমারী পাঠশালায় পড়তেন, তাহলে অন্তত জেলার ভূগোলটা তাঁকে পড়তে হতো, মানচিত্রও দেখতে হতো। শুধু সংস্কৃতই পড়েছেন তিনি। যেখানে বহু শাস্ত্রবিদ আচার্যের সংখ্যা অজস্র, সেখানে পণ্ডিতদের প্রথম সারিতে বসার সুযোগ সকলের বরাতে জোটে না, আর যদিও-বা সে-বরাত হয়, তবু বিপুল পাণ্ডিত্য থাকা সত্ত্বেও তাঁর বাইরে যাওয়া একান্ত দরকার হয়ে পড়ে। মিথিলার কোনো পণ্ডিত কোনো ম্লেচ্ছ দেশে যাওয়া পছন্দ করেন না, কিন্তু পেটের ধান্দায় বাইরে যেতে বাধ্য হতে হয়। যে-দেশে বৈদিক কাল থেকে চলে আসা মৎস্য-মাংসের পবিত্র আহারকে অপবিত্র বলে মনে করা হয়, সেখানে কোনো ধর্মপ্রাণ মৈথিলী পণ্ডিত যেতে রাজী হবেন কেন, বিশেষ করে তিনি যখন জানেন যে সেখানে বছরের পর বছর ঘাস-পাতা খেয়ে কাটিয়েও গাঁয়ে ফিরেই প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। গুরুজীর শাস্ত্র-অধ্যয়ন যখন শেষ হলো, তখন তাঁর বয়স চব্বিশ-পঁচিশ, কাঁধে দায়িত্ব এসেছে, দারিদ্র্যে জর্জরিত তাঁর পরিবারটিকে এবং সেই সঙ্গে নিজেকেও উদ্ধার করতে হবে তাঁকে।

মিথিলার জনক রাজা তাঁর সীতাকে বীরভোগ্যা বলে ঘোষণা করেছিলেন, সম্ভবত সেকালে তা ক্ষত্রিয়দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ব্রাহ্মণেরা যে সব সময়

ধনবান ভোগ্যা মেয়েদেরই বিয়ে করে আসছে —এ অপবাদ খুব কম, এবং তা-ও ইদানীং কালে দেখাদেখি শুরু হয়েছে। দ্বারভাঙ্গা জেলায় সৌরাষ্ট্রে হাজার হাজার আমগাছের সেই বাগানটি এখনও রয়েছে, প্রতি বছর সেখানে পঞ্চাশ হাজার লোকের এক মেলা বসে যায়, আর শুধু বিয়ে ঠিক করার জন্যই সে-মেলা। ঘটকেরা তাদের পাঁজিপুঁথি আর বংশলতিকার খাতা নিয়ে বসে পড়ে। তাদের সাক্ষ্য ছাড়া কারোর বিয়ে হতে পারে না। পাত্র-পাত্রীর পরিচিতির জন্য তারা প্রমাণপত্র হাজির করে, বিয়ে সম্পর্কে মতামত ঘোষণা করে। সারা বছরে মিথিলায় যত ছেলেমেয়ে বিবাহযোগ্য হয়, তাদের সকলের বিয়ের সম্বন্ধ স্থির করা হয় এই বিবাহ-সভায় বা মেলায়। বরকে সশরীরে হাজির হতে হয়, কনের যাওয়ার দরকার হয় না। কনের বয়স দশ বছর কিংবা তার চেয়েও কম হতে পারে, কিন্তু কুড়ি বছরের নিচে সম্ভবত একটাও বর খুঁজে পাওয়া যাবে না। ঐ মিথিলাতেই অন্যান্য উচ্চ সম্প্রদায়ের লোকেরা যেখানে পাত্রের জন্য মোটারকম যৌতুক দাবি করে, সেখানে মৈথিলী ব্রাহ্মণেরা তার মেয়েদের জন্য কন্যা-শুল্ক চায়; সেটা একশো টাকা থেকে হাজার টাকা পর্যন্ত হতে পারে। গুরুজী যদি তাঁর জন্মভূমিতেই থেকে যেতেন, তাহলে হয়ত খেয়ে না-খেয়ে কষ্টে-স্থষ্টে কোনোরকমে জীবনটা কাটিয়ে দিতেন, কিন্তু তাঁর বিয়ে করা সম্ভব হতো না কখনও। অল্প বয়েসী একটি মেয়ের জন্যেও আজকাল পাঁচ-সাতশো টাকা দরকার, অতো টাকা কোথায় পেতেন তিনি? গাঁয়ে বাস করে সৌরাষ্ট্রের বিবাহ-সভায় যাওয়ার সাহসও হতো না তাঁর, আর এক মাস ধরে শ্বশুরবাড়িতে থেকে প্রচুর মাছ-মাংস আর নানারকম সুস্বাদু খাবারের আশাও করতে পারতেন না, বিয়ের সময় মাস খানেক ধরে শ্বশুর বাড়িতে যা সাধারণত এক মৈথিলী ব্রাহ্মণ বরের জোটে।

তখনও গুরুজী তাঁর নাম হয়নি। ও নাম তো জুটেছিল কর্মক্ষেত্রে যাওয়ার তিন দশক পরে। যদিও গুরুজী গাঁয়ের লোকজনের মধ্যে, কূপমণ্ডুক শিরোমণিদের বংশে জন্মেছেন, বড় হয়েছেন। অন্যান্য হাজার হাজার মৈথিলী সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের মতোই তাঁদের গাঁয়েরও কয়েকজন পণ্ডিত জীবিকার জন্য স্বেচ্ছায় প্রবাস-জীবন গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের কাছ থেকে যে-টুকু শুনেছেন, সেটুকুর মধ্যেই গুরুজীর ভূগোল-জ্ঞান সীমাবদ্ধ। পশ্চিম দিকটাকে মৈথিলী ব্রাহ্মণেরা বেশি পছন্দ করেন, কারণ ওদিকটায় তখনও শাস্ত্রের চাহিদা রয়েছে। দক্ষিণে বাংলা ইতিপূর্বেই আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশে মৈথিলী বামুন-ঠাকুরের চাহিদা যদিও যথেষ্ট, কিন্তু পণ্ডিতের চাহিদা নেই, সেজন্যে তাঁদের যাত্রাটা হয় পশ্চিমেই। পশ্চিমে রাজস্থান প্রভৃতি রাজ্যে অনেক রাজাও আছেন, তাঁদের সভায় নিজেদের পাণ্ডিত্য দেখিয়ে বহু মৈথিলী বিদ্বান ব্যক্তি রাজপণ্ডিতের পদ লাভ করেছেন, মান মর্যাদার সঙ্গে সঙ্গে যথেষ্ট ধনোপার্জনও করেছেন তাঁরা। যদিও রাজপণ্ডিত হওয়ার ক্ষমতা সকলের নেই, তবু হওয়ার ইচ্ছেটা সকলেরই আছে। যদি তারও

সম্ভাবনা না থাকে, তবে অন্তত মিথিলার চেয়ে তিন-চার গুণ বেশি বেতনে কোনো সংস্কৃত পাঠশালায় কাজ জুটে যায়। গুরুজীর গাঁয়ের পণ্ডিতেরা বলে দিয়েছেন, পশ্চিমের দেশগুলোতে লোকজন ধর্মশাস্ত্রের মর্যাদা যথাযথ দেয় না, ওদের দেশে মাছ-মাংস খাওয়া মহাপাপ বলে গণ্য করা হয়, সেজন্যে মুনি-ঋষিদের কাল থেকে পবিত্র যে মধুপর্ক, বিনা মাংসে সেই মধুপর্ক তাঁদের বছরের পর বছর খেয়ে কাটাতে হয়েছে। মৎস্য-কচ্ছপ-বরাহ, বিষ্ণুর এই তিন অবতারকে চট করে বর্জন করে শুধু ঘাস-পাতা খাওয়ার দেশে কোনো মৈথিলী পণ্ডিতের যাওয়ার ইচ্ছে হবে কেন? যদি সংস্কৃত পাঠশালায় চাকরি জোটে, তাহলে সেখানেও দিব্যি করে বলতে হয়—আমাদের সাত-পুরুষ কখনও মাছ-মাংস ছোঁয়নি। চুপি চুপি মাছ-মাংস রান্নার কোনো ব্যবস্থা করাও সম্ভব নয়। ঘোর নিরামিষাশী শহরে-বস্তিতেও রান্না করা মাংস কখনো কখনো বেশ সস্তাতেই পাওয়া যায়, কিন্তু চৌকার বাইরে খেতে হলে সে-মাংস অখাদ্য বলেই ধরা হয়।

গুরুজী গ্রামে দেশাচার ও ভূগোল সম্বন্ধে যে বাস্তব জ্ঞান লাভ করেছিলেন তাই থেকেই তিনি বুঝেছিলেন যে, পশ্চিমে বড় কঠোর সাধনায় জীবন কাটাতে হবে। সেটা তাঁকে মেনে নিতেই হলো, কারণ 'পরদেশ কলেস নরেসহুকো'।

দুই

গুরুজী একদিন শুভক্ষণ দেখে তাঁর দ্বারভাঙ্গা জেলার গ্রাম থেকে পশ্চিম দিকে যাত্রা করলেন। রেলগাড়ি রয়েছে, তাই কোনোরকমে কিছু টাকা যোগাড় করলেই কোথাও না কোথাও গিয়ে পৌঁছে যাওয়া যায়, কিন্তু কোথাও গিয়ে পৌঁছলেই কি আর চাকরি জোটে সহজে? গুরুজী সেকেলে রেওয়াজ অনুযায়ী শুধু সংস্কৃতই পড়েছেন। বুদ্ধি-সুদ্ধি যে ভালোই, দেশের বাইরে পা বাড়াতে সাহস করেছেন, এ থেকেই তা অনুমান করা যায়। তাঁর জানা-শোনা বিদ্বান ব্যক্তিরা উত্তর প্রদেশের পশ্চিমী শহরগুলিতে যেখানেই গেছেন, জীবিকার সন্ধানেই গেছেন। তাঁরা এক পাঠশালায় থেকে কিছুদিন পড়ান, তারপর আবার অন্য পাঠশালায়। পাঠশালায় মাইনে খুব কম। স্কুলে সংস্কৃতের মাস্টার মশাইদের মাইনে একটু বেশি, কিন্তু তার জন্যে ইংরেজিতে এক-আধটু দখল থাকা দরকার। গুরুজীর সেটা বুঝতে দেরি হলো না। কোনো একটা পাঠশালায় পড়াতে পড়াতেই তিনি এ-বি-সি-ডি শিখে নিলেন, এক-আধখানা বইও পড়ে ফেললেন। তিনি তো ভাবছিলেন, অমরকোষের মতো কোনো ইংরেজি শব্দকোষ থাকলে ঝাড়া মুখস্ত করে ফেলেন। বহু খোঁজ-খবর করলেন, সবাই একই কথা বলল ইংরেজিতে অমরকোষের মতো কোনও প্রতিশব্দের অভিধান নেই। তখন তাঁর বিশ্বাস দৃঢ়মূল হলো যে বিদ্যার ক্ষেত্রে ইংরেজি অনেক পিছিয়ে আছে। অবশ্য

তাঁকে ভুল বোঝানো হয়েছিল। পদ্যে না হোক, গদ্যে ইংরেজি প্রতিশব্দের অভিধান আছে। তবে হ্যাঁ, অভিধান মুখস্ত করার চল না থাকার জন্ত তার মূল্য কেবল কবি ও বিশেষজ্ঞদের কাছেই, অন্ত লোকের কাছে বর্ণানুক্রমিক অভিধানই বেশী ব্যবহারোপযোগী। গুরুজীকে যারা ইংরেজি শব্দকোষের কথা বলেছিল, তারা শুধু ঐ বর্ণানুক্রমিক অভিধানের কথাই জানে। হেঁকে মুখস্ত করার মহিমা গুরুজী ছোটবেলাতেই উপলব্ধি করেছেন। তিনি বহুবার শুনেছেন, 'মুখস্ত বিদ্যা বহমান জল।' তা অন্যদের কাছে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়া মুখস্ত করাটা বিপজ্জনক হতে পারে, কিন্তু গুরুজী তাঁর আর সব সহপাঠীদের মতোই তাতে জয়লাভ করতে সক্ষম। কেন জানিনে, তাঁর বহুবার মনে হয়েছে—'যদি সারস্বত কিংবা লঘু-কৌমুদীর মতো সূত্রে ইংরেজি ব্যাকরণ থাকত, যা সহজে মুখস্ত করা যায়, আর অমরকোষের মতো পদ্যে প্রতিশব্দের অভিধান, তাহলে এক দেড় বছরই যথেষ্ট ছিল। দুটোকেই কণ্ঠস্থ করে নিয়ে বাজিমাত করে ফেলতাম।' এ রকম ব্যবস্থা না থাকা সত্ত্বেও গুরুজী ভেবে দেখলেন, কোনো ইংরেজি স্কুলে সংস্কৃত পড়ানোর কাজ পেতে হলে এক-আধটু ইংরেজি শিখে নেওয়া খুবই দরকার। কিন্তু এ শহরের হাইস্কুলগুলোতে কম-বেশি ইংরেজি জানা সংস্কৃত পণ্ডিতের অভাব নেই। দু-একজন গুরুজীকে বলল, 'যদি পাহাড়ী এলাকায় চলে যান, তাহলে ঐ ইংরেজি বিদ্যাতেই আপনি কোনো একটা স্কুলে সংস্কৃতের শিক্ষক হয়ে যেতে পারবেন, আর সে-সব স্কুলে এদিকের তুলনায় মাইনেপত্রও ভালো।

যে তরুণ ছেলেটি নিজের গাঁ থেকে বেরিয়ে গিয়ে পশ্চিমের বড় বড় শহরের হাওয়া খেয়ে বেড়িয়েছেন, তাঁর পক্ষে মধুপুরী যাওয়াটা এমন কিছু কঠিন না। একদিন গুরুজী মধুপুরীতে এসে হাজির হলেন।

মিথিলার পাণ্ডিত্যের খ্যাতি সর্বত্রই স্বীকার করা হয়। তাই মধুপুরী আসাতে একটা সুবিধে অবশ্যই ছিল যে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা তাঁর পাণ্ডিত্য মেনে নিতে পারে। যেটুকু ইংরেজি জানেন তিনি তা না জানারই সামিল। তবে মধুপুরীতে ইংরেজি জানা সংস্কৃত পণ্ডিতের বড় অভাব, কারণ লোকে ঠাণ্ডার ভয়ে মধুপুরীতে গিয়ে শিক্ষকতার কাজ করতে ইতস্তত করে। পাহাড়ী লোকের কাছে মধুপুরীর ঠাণ্ডা ঠাণ্ডাই নয়, অথচ আজ থেকে তিরিশ-পঁয়ত্রিশ বছর আগে সেখানে সংস্কৃত পণ্ডিতের সংখ্যা চাহিদার তুলনায় খুব কম ছিল। মধুপুরীতে এসে মৈথিলী যুবকটি খুব তাড়াতাড়ি 'গুরুজী' উপাধি পেয়ে গেলেন। মধুপুরী তখনও সবদিক দিয়ে পুরোপুরি ইংরেজদেরই শহর। সে-সময় গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছে, লোকের মন থেকে ইংরেজের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা কেটে গেছে। কিন্তু মধুপুরীতে—ইংলণ্ড থেকে তুলে আনা এই এক টুকরো ভূমি খণ্ডে—তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি তখনও মধ্যাহ্ন-সূর্যের মতোই প্রখর। গ্রীষ্ম ও বর্ষার পাঁচ-ছ মাস মধুপুরী সম্পূর্ণ ইংরেজদের আবাসভূমি হয়ে ওঠে এমন অনেক পাড়া

আছে, যেখানে এ-সময়টা কালো চামড়ার লোকের চেয়ে সাদা চামড়ার লোকই বেশি দেখা যায়—চাকরিজীবী সরকারী অফিসাররাও আসেন এখানে, আসেন ব্যবসায়ী এবং খৃষ্টান ধর্মপ্রচারকরাও। খৃষ্টানদের সংস্কৃত পড়ানো পাপ, সে-কথা ঠিক, তবে মৈথিলী পণ্ডিতেরা যখন নাস্তিক আর্যসমাজী ও জৈনদের কাছে বিদ্যা বিক্রি করতে পারেন, তখন মধুপুরীর পাদরীরা তো তাদের চেয়ে এক ধাপ নিচেই। অন্যান্য লোকেরা যেখানে চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকা দিয়ে ভাবেন যে কাজের বিনিময়ে খুব বদান্যতা দেখাচ্ছেন, সেখানে পাদরীরা একশো টাকা দিয়েও খুব একটা উপকার করছেন বলে ভাবেন না। গুরুজী প্রথমদিকে এইসব পাদরীদের এবং তাঁদের স্কুলে ছেলেদের পড়ানোর কাজ পেলেন। তিনি মনে মনে ঠিক করলেন মাইনে যখন নেবই, তখন বিদ্যা তো বিক্রি করতেই হবে। এখন শুধু প্রশ্ন, সস্তায় বিক্রি করব, না বেশি দামে? অন্যান্য মৈথিলী পণ্ডিতেরা যেমন বেতনভুক শিক্ষক হয়েও নিজেদের ধর্মীয় আহার-বিহার চাল-চলন ঠিকমতো মেনে চলতে চান, গুরুজীও তাই করেন। সাদা-সিধে এই পণ্ডিতটির প্রতি তাঁর শিষ্যরা খুব সন্তুষ্ট। গুরুজী সত্যি মিথ্যে বোঝেন না, নিজের কাজটি খুব যত্নের সঙ্গে করেন। নিজের যতই দেরি হোক, তাদের নিকট-সম্পর্কের কেউ এলে যথেষ্ট খাতির সম্মান করে বসান তাদের। গুরুজীর যখন এত গুণমুগ্ধ রয়েছে। বিশেষ করে তারা আবার শ্বেতাঙ্গ, তখন সেখানকার হাইস্কুলে সংস্কৃত পড়ানোর কাজ জোটানো এমন কিছু কঠিন নয়। সুপারিশকারীরা তো জানেই যে তাতে তাদের পড়াশোনার কোনো অসুবিধে হবে না, স্কুল ছুটির পর গুরুজী তাদের পড়িয়ে যাবেন। ফলত গুরুজী একটা আধা সরকারী স্কুলের শিক্ষক হয়ে গেলেন।

তিন

দ্বারভাঙ্গার গাঁয়ে গুরুজী যেভাবে জীবন-যাপন করতেন ইউরোপের লোকজন বাস করে এমন এক শহর মধুপুরীতে সেভাবে জীবন-যাপন করা কি সম্ভব! দু-এক বছর তো তিনি ধুতিতেই মধুপুরীর শীতকালটা কাটিয়ে দিতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু বছরে দু-চারবার বরফ পড়ে যেখানে, দু-চার সপ্তাহ যেখানকার তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নিচে নেমে যায়, সেখানে দ্বারভাঙ্গার মৈথিলী ব্রাহ্মণের পোশাক খুব আরামদায়ক হতে পারে না। একটা কি দুটো শীতকালই গুরুজীকে জানিয়ে দিলো যে ধুতি আর মেরজাইয়ের ওপর অতো আগ্রহ দেখানো অর্থহীন। অবশ্য ওগুলো তোরঙ্গে ভরে রাখা দরকার, গাঁয়ে ফেরার সময় কাজে লাগবে। কোট আর পায়জামা পরতে শুরু করলেন তিনি। মোটা পশমের গলাবন্ধ কোট আর পাতলুনের ঢঙের পায়জামা ডিসেম্বরের শুরুতেই যখন তিনি প্রথম পরলেন, তখন নিজের বেকুবির জন্যে আপশোষ করতে লাগলেন—'হায় হায়, দু'বছর ধরে ঠাণ্ডায় খামোখাই

ভুগলাম!' তখন থেকে গুরুজী বরাবর গলাবন্ধ কোট আর পায়জামা পরেন। গরমের সময় ধুতি পরতে পারেন, কিন্তু ধুতিটাকে এখন আর ভুল যাওয়ার মতো সম্ভ্রান্ত পোশাক বলে মনে হয় না তাঁর।

মৈথিলী পণ্ডিতদের নিত্য স্নান আর স্বপাক-ভোজন অত্যাবশ্যক, যদি পুরোপুরি ধর্ম-রক্ষা করতে হয়। ধর্মশাস্ত্রের ঐ সব পুঁথি থেকেই এই কূপমণ্ডুকদের মালুম হয়ে যায় যে ধর্মের বিধি-ব্যবস্থা দেশকালপাত্র-ভেদে আলাদা আলাদা হয়। মধুপুরীর মতো ঠাণ্ডা জায়গায় নিত্য স্নান ধর্মের জন্য আবশ্যক নয়। সমভূমিতে গঙ্গাজলের পবিত্র করার ক্ষমতা যেমন, হিমালয়ের বায়ুরও তেমনি পবিত্র করার ক্ষমতা রয়েছে বলে মুনি-ঋষিরা স্বীকার করেন। যদি স্নানাগার আর গরম জলের ব্যবস্থা থাকে, তাহলে স্নান করতে বেশি কষ্ট হয় না, কিন্তু গুরুজী তো ছ'পয়সা রোজগারের উদ্দেশ্যেই ঘরবাড়ি ছেড়ে এখানে এসেছেন।

মধুপুরী এসে দু'বছর কাটাতেই তিনি এমন টাকা-পয়সা জমিয়ে ফেললেন যে সৌরাষ্ট্রের সভায় গিয়ে তিনি নিজের বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক করলেন। তারপর লাল ধুতি পরে বর সাজলেন, শ্বশুর বাড়িতে মাসখানেক থেকে মধুর আপ্যায়ন, ভালো খাওয়া দাওয়া আর তরুণী ব্রাহ্মণকুমারীদের মধুর আলাপ, ঠাট্টা-তামাসার আনন্দ উপভোগ করলেন। এখন থেকে বছরে একবার করে বাড়ি যাওয়া দরকার হয়ে পড়ল তাঁর। মৈথিলী ব্রাহ্মণদের স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া তখনও নিষিদ্ধ। যদি তিনি স্ত্রীকে সঙ্গে করে নিয়ে আসতে পারতেন, তাহলে খুব আরামে থাকতেন সন্দেহ নেই, রান্না করা খাবার পেতেন, সংসার দেখাশোনা করার ভাবনা থাকত না। কিন্তু সেটা তাঁর ভবিষ্যৎ বংশধরের ভাগ্যে লেখা রয়েছে। তাঁরই বয়সের অপর একজন মৈথিলী কিন্তু ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত, মধুপুরীর অন্য এক পাড়ায় নিজের বাংলোয় থাকে। সিগার ছাড়া তার এক মিনিটও চলে না, খাওয়া-পরার যথেষ্ট স্বাচ্ছন্দ্য। মৈথিলী আচার-ব্যবহার বেশ-ভূষা পিতার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয়েছে। বিলাত থেকেও ঘুরে এসেছে। গুরুজী লক্ষ্য করেছেন, এ রকম খেয়াল-খুশি আচার-ব্যবহার সত্ত্বেও স্বজাতির মধ্যে এখনও তাকে সবচেয়ে কুলীন বলে গণ্য করা হয়, মিথিলায় গেলে সেখানে তার মান-মর্যাদার কোনো অভাব ঘটে না। কিন্তু তাকে অনুসরণ করা গুরুজীর পক্ষে সম্ভব নয়। তিনি জানেন, 'দেবতারাও বলবানের দোষ ধরে না।' গুরুজীকে তাঁর নিজের সীমার ভেতরেই থাকতে হবে।

সমভূমির স্কুলগুলোতে লম্বা ছুটি হয় গ্রীষ্মকালে। কিন্তু মধুপুরীর মতো হিমালয়ের শীত প্রধান শহরগুলোতে শীতকালের সবচেয়ে কঠিন মাস জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী স্কুল বন্ধ থাকে। মধুপুরী থেকে মিথিলা যেতে বেশ খরচ পড়ে, সেটা ঠিক, কিন্তু তখনও রেল-ভাড়া এত বাড়েনি, আর না গিয়েও চলে না। তাই গুরুজী যতদিন যৌবনের চৌহদ্দির মধ্যে ছিলেন, প্রায় প্রতি বছরই ছুটিতে বাড়ি যেতেন। দু-চারটি সন্তান হলে তাঁর এই নিয়মে কিছুটা ভাটা পড়তে লাগল।

ঠাণ্ডা জলে নিত্য স্নান তিনি বহু বছর মেনে চলেছিলেন, পরে আর্থিক অবস্থা যখন একটু ভালো হলো, তখন থেকে গরম জলেই স্নান করেন। নিত্য স্নানের চেয়েও তাঁর কাছে বেশি কষ্টদায়ক, স্বপাক ভোজন। নিজের হাতেই রান্না করতে হতো তাঁকে। মে-জুন বাদে বাকি সময়টা শুধু ধুতি-গামছা পরে কাটানো বেশ কষ্টদায়ক, তার ওপর নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে ধুতি কখনো ওপরে তুলে কখনো নীচে নামিয়ে রান্না-বান্না করা রীতিমতো শাস্তি। এ-অবস্থায় দাঁতের ঠকঠকানিতে অর্ধেক খিদে উড়ে যায়। গুরুজী পুরনো আমলের পুরনো চাল-চলনেরই পণ্ডিত, কিন্তু নিজের আক্কেল একেবারে চিবিয়ে খাননি। মধুপুরীর আবহাওয়ায় একদিকে যখন তাঁর দাঁতে দাঁতে ঠকঠকি শুরু হলো, তখন আর একদিকে তাঁর কিছুটা আক্কেলও গজালো —'কেন এই ঝুট-মুট শাস্তি পোয়াচ্ছ! এর ফলে তোমার জন্যে স্বর্গে ঐ রকম একটা বাংলো রিজার্ভ হয়ে যাবে না, যেরকম মধুপুরীর অন্য পাড়ায় তোমার জাত-ভাইয়ের জন্যে তৈরি হয়েছে। দ্বারভাঙ্গা থেকে তোমার গাঁয়ের লোকেরা রোজ রোজ দেখতে আসছে না যে তারা ফিরে গিয়ে তোমার নামে অপবাদ রটিয়ে দেবে আর তোমাকে জাতিচ্যুত হতে হবে।' দ্বারভাঙ্গার গাঁয়েও এখন গান্ধীর জয়-জয়কার শুরু হয়েছে, শহরে-বস্তিতে যেখানে হিন্দু ভোজনালয়ের কোনো অস্তিত্ব ছিল না, এখন সেখানে মাছ-মাংস-সহ সস্তায় খাবার দেওয়ার মতো হিন্দু হোটেলে ছেয়ে গেছে, গাঁয়ের পণ্ডিতেরাও মাঝে-মধ্যে ঐ সব হোটেলে লোকের চোখ এড়িয়ে খেয়ে আসেন। গুরুজী বুঝে ফেলেছিলেন যে খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে সেকেলে গোঁড়ামি অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলাটা নিছক মূর্খামি। মধুপুরীতে বৈষ্ণব ভোজনালয়ও আছে। সেখানে ব্রাহ্মণের হাতের শুদ্ধ নিরামিষ রান্না এত কম খরচে পাওয়া যেতে পারে যে স্বপাক রান্নায় খরচ পড়ে তার চেয়েও বেশি। গুরুজী এখন থেকে গৌড়-ভোজনালয়-গুলিতেই খেতে শুরু করলেন। ভেবে দেখলেন, সুলভ হলেও মধুপুরীতে থাকার সময় মাছ-মাংস এড়িয়ে চলাই বাঞ্ছনীয়! এই ঘাটতিটুকু তিনি ছুটির দিনগুলিতে গাঁয়ে বেশ ভালোভাবেই মিটিয়ে নেন। মধুপুরীতে যে মহল্লায় তিনি থাকেন, সেটা বেনেদের পাড়া, কট্টর নিরামিষাশী তারা। গুরুজীকে তারাও গুরুজী বলে, সময়ে সময়ে তাঁর কাছ থেকে এটা-ওটা পড়ে নেয়, শুভ দিন-ক্ষণ দেখে নেয়, নিমন্ত্রণে ডেকে নিয়ে গিয়ে দক্ষিণা-সমেত ভোজন করায়। গুরুজী সম্পর্কে তারা যদি জানতে পারে যে তিনি আমিষাশী, তাহলে তৎক্ষণাৎ তাদের ভক্তি-শ্রদ্ধা দূর হয়ে যাবে, সন্দেহ নেই। গৌড়-ভোজনালয়ে ভোজন করাটা বেনেরাও পবিত্র বলে স্বীকার করে। তবু মিথিলায় তাঁর গাঁয়ের লোকেরা যদি ব্যাপারটা আঁচ করতে পারে, তাহলে শুধু গঙ্গার বালি চাটিয়ে আর গঙ্গাজলে স্নান করিয়েই তাঁকে নিষ্কৃতি দেবে না, তার ওপর সঙ্গে একজন সাক্ষী নিয়ে গয়া যেতে বাধ্য করবে তাঁকে। সব জায়গায় সাত পুরুষের উদ্দেশে পিণ্ডি দিয়ে পাণ্ডাদের প্রমাণ-

পত্র এনে দেখাতে হবে। মৈথিলী কবি নাগার্জুনের মতো গুরুজীর প্রতিভা নেই যে গঙ্গা পেরিয়ে সাক্ষীটাকে সঙ্গে নিয়েই পাটনার সিনেমা হলে গিয়ে ঢুকবেন, একটা ভালো ফিল্ম দেখিয়ে কৃতার্থ করে সাক্ষী ভাঙিয়ে নেবেন। বলবেন, 'টাকা-পয়সাগুলো কেন খামোকা পাণ্ডাদের পেছনে আর ঐ সব শ্রাদ্ধ-তর্পণে উড়িয়ে দেবো বলুন তো! আধা-আধি বখরা হয়ে যাক না! যা বেঁচেছে তার অর্ধেক আমার অর্ধেক আপনার। আট আনাতেই পাণ্ডাদের প্রমাণপত্র পাওয়া যায়, ওটা যোগাড় করা আমার কাছে কিছুই না।' প্রত্যেকবার প্রায়শ্চিত্তের পর নাগার্জুন টিকি মুড়িয়ে বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াতেন আর খাদ্যাখাদ্য ভক্ষণ করে বেড়াতেন। কিন্তু গুরুজীর অতোটা হিম্মত নেই। মধুপুরীর গৌড়-ভোজনালয়ে খাওয়া-দাওয়া করে আর উর্ধ্বাঙ্গে অধমাঙ্গে ম্লেচ্ছ পোশাক পরেই সন্তুষ্ট হতে হয় তাঁকে।

মধুপুরীর স্থায়ী বাসিন্দাদের মধ্যে গুরুজীর জানাশোনা লোকের সংখ্যা খুব দ্রুত বেড়ে গেলো। সেকেলে বেনেরা তো তাঁর খাতির সম্মান করতেনই, ইংরেজি স্কুলের সংস্কৃত পণ্ডিত হওয়াতে নব্য শিক্ষিতদের মধ্যেও তিনি যথেষ্ট পরিচিত হয়ে উঠলেন। সকলের সঙ্গেই তাঁর মিষ্টি মধুর অকপট ব্যবহার, প্রচুর বন্ধু বান্ধব বেড়ে যাওয়ার সেটাও একটা কারণ। মধুপুরীর ইউরোপীয় স্কুলের ইউ-রোপীয় শিক্ষকেরাও তাঁর পরিচিত, পাদরীদের কাছেও তাঁর মান-সম্মান। কোনো পার্টি কিংবা ভোজ হলে তিনি অবশ্যই নেমন্তন্ন পাবেন। গুরুজী এসব নেমন্তন্নকে উপেক্ষা করতে চান না, তা সেটা হিন্দুদেরই হোক, কিংবা ম্লেচ্ছ খ্রীষ্টানদেরই হোক। সেখানে গিয়ে তিনি টেবিলের একদিকে বসে পড়েন। গুরুজী নিরামিষাশী, তাতে কারোর আপত্তি করার উপায় নেই। চা, দেশী-বিদেশী নানারকম মিষ্টান্ন, ফলমূল তাঁর পাতেও পড়ে। গৌড়-ভোজনালয়ে ভোজন করে যেভাবে তিনি মিথিলার ধর্মশাস্ত্র অবহেলা করছেন, সেভাবে এখানেও করতে পারেন। কোন মৈথিলী ব্রাহ্মণ দেখতে আসছে এখানে? কিন্তু গুরুজীর বুদ্ধির তালাটা পুরোপুরি খোলেনি। সবাই নানারকম ভালো ভালো খাবার চেটে-পুটে সাফ করে, এমনকি চায়ের পেয়ালাতেও আর হাত ছোঁয়ায় না। তাঁর ছাত্র-শিষ্যরাও এখন অনেকে শিক্ষক হয়েছে। গুরুজীর পাশে বসে তারা, গুরুজী তাঁর প্লেটগুলো আস্তে আস্তে তাদের দিকে ঠেলে দেন। ফলমূলে ছোঁয়াছুঁয়ির কোনো ব্যাপার নেই, কিন্তু গুরুজী ফলটল কদাচিৎ মুখে তোলেন। আর, ওসব বাদ দিলেও, জলের তো একান্ত দরকার, আর সেই জল আসে বেয়ারা-খানসামাদের হাতের ছোঁয়া কাচের গেলাসে। বছরে শতাধিক ভোজে যান তিনি, কিন্তু হাতে কমণ্ডলুটা থাকেই, তুলসীবাবার কথায় তাতে 'এক বিন্দুর বেশি ধরে না।' কিছুকাল তিনি বেনেদের বাড়িতেও খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে বাছ-বিচার করতেন, কিন্তু পরবর্তীকালে জলে রান্না, ঘিয়ে ভাজা সবরকম খাবারই ভক্ষ্য বলে মেনে নিতে শুরু করেন।

চার

গুরুজীর মধুপুরীতে আসা তিরিশ বছরের ওপর হয়ে গেলো। সীজনে মধুপুরীতে শৈলবিহারীদের সংখ্যা সাত-আট গুণ বেড়ে যায়, তাদের মধ্যে অধিকাংশই নতুন নতুন লোক। কিন্তু দোকানদার, স্কুল-শিক্ষক প্রভৃতি স্থায়ী বাসিন্দা, মধুপুরীর সঙ্গে যাদের নিবিড় সম্পর্ক, তারা সবাই গুরুজীর পরিচিত। তাঁর কাছে মধুপুরী এখন নিজের ঘরবাড়ির চেয়েও আপন। এখানে থেকে তিনি প্রতি মাসে এত টাকা রোজগার করেন যে মিথিলার কোনো পণ্ডিতও তা কল্পনা করতে পারেন না। তাছাড়া সমুদ্র-পৃষ্ঠ থেকে ছ'হাজার ফুট উঁচুতে অবস্থিত শহরটির আবহাওয়াও তাঁর খুব পছন্দ। কেবল শীতকালেই এক মাস দেড় মাসের জন্যে বাড়ি যান তিনি। সে সময় গাঁয়ে গরমের ভয় থাকে না, আর সেখানকার যা ঠাণ্ডা, তার চেয়ে অনেক বেশি ঠাণ্ডা মধুপুরীতে গ্রীষ্মকালেও দেখা যায়। গুরুজীর বয়স এখন ছাপান্ন বছর, এর পর স্কুলের চাকরি থেকে অবসর নিতে হবে তাঁকে। গুরুজীর সবচেয়ে ভয় হলো, গ্রীষ্মকালে দ্বারভাঙ্গার গাঁয়ে তিনি লু বরদাস্ত করবেন কি করে! যদিও চব্বিশ-পঁচিশ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি তাঁর গাঁয়ে ঐ লু সয়ে এসেছেন, কিন্তু তখন মধুপুরীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়নি। তার ওপরে আরও আছে, গাঁয়ে ফিরে আবার নতুন করে কোনো রোজগার-পাতির ব্যবস্থা করা যে সম্ভব নয়, সেটাও জানেন তিনি। আধা সরকারী স্কুলে পেন্সন নেই, প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের সামান্য টাকা পাওয়া যায়, কিন্তু তাতে আর কদিন চলবে? অসুবিধে হবে, কিন্তু তাই বলে গাঁয়ে ফিরে না খেয়ে মরতে হবে না তাঁকে। কারণ মধুপুরীর রোজ-গারের টাকায় কয়েক বিঘে জমি কিনে ফেলেছেন ইতিমধ্যেই। যদি নিজে জোত-জমি দেখাশোনা করেন, তাহলে তো কবীর সাহেবের উক্তি, 'কহেন কবীর, কিছু উদ্যোগ নিন, নিজে খান অপরকেও দিন'—সুভাষিতটি চরিতার্থ হতে পারে। এ পর্যন্ত তিনি নিজের জমি-জমা বর্গায় দিয়ে আসছেন, তাতে ঘরের খরচপত্রের জন্য সারা বছরের চাল তো জোটেই, যা বাড়তি হয়, বিক্রী করে কিছু টাকাও আসে। কিন্তু এখন গাঁয়ের চাষীরাও শ্লোগান দিতে শিখেছে। গুরুজীর ভয়, এমন মেহনত করে কেনা জমিগুলো আবার চাষাদের হাতে না চলে যায়। রাগ হয়, কিন্তু কুয়োর সব জলেই যখন ভাঙ্ পড়েছে, তখন রাগ করে আর লাভ কি? দুনিয়ার হাওয়াই বিগড়ে গেছে। গুরুজী আজও মধুপুরীতে কোনো নেমন্তন্নে গিয়ে গলা ভেজাবার জন্যেও এক ফোঁটা জল খান না, আর তাঁরই ভাইপো কি-না এখন লাল ঝাণ্ডা নিয়ে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাপ দাদাদের দেখিয়ে দেখিয়ে নিচু জাতের লোকের সঙ্গে বসে ভাত খায় আর চ্যালেঞ্জ জানায়, 'এসো, আমায় জাত থেকে বের করে দাও দেখি!' তাকে প্রায়শ্চিত্ত

করার আদেশ দেবে, এমন বুকের পাটা নেই কারোর। সমস্ত উন্নাসিক পণ্ডিতের ছেলেকেই ডিম খাইয়ে ছেড়েছে সে। এইসব দেখেশুনে গুরুজী মাঝে মধ্যে বিরক্তি প্রকাশ করেন, কখনো বলেন, 'যা হবে হোক গে, আমি নিজে তো ধর্মকর্ম মেনে চলেছি!' আবার কখনো বলেন, 'জলের মাছ তেষ্টায় থাকার মতো আমি বেকুবি করলাম না তো?' তাঁর বুঝতে বাকি নেই যে তাঁর চোখের সামনে দেখতে দেখতে কলিযুগ গোটা পৃথিবীটাকে পায়ের তলায় চেপে ধরেছে, পূর্বপুরুষের কথা মেনে চলার কেউ নেই এখন। জীবনের এক প্রান্তে বাস করে তার সীমা অতিক্রম করার সাহস তাঁর নেই, প্রয়োজনও বোধ করেন না। তাঁর পরবর্তী বংশ নিজেদের কাজ করে চলেছে, আর এটাও ঠিক যে এখন তাঁর পৌত্র যদি মধুপুরীর কোনো ভোজসভায় নিমন্ত্রিত হয়ে যায়, তাহলে গ্রাস না তুলে সেখান থেকে উঠবে না, আর সেই পৌত্রের হাতের পিণ্ডদানই তাঁকে স্বর্গে গিয়ে গ্রহণ করতে হবে।

এ-ব্যাপারে গুরুজী খুব একটা ভাবনা-চিন্তা করেন না, কারণ তিনি জানেন: ব্যাধিটা শুধু একটা ঘরেরই নয়, বরং তা মহামারী হয়ে এসেছে। আসল চিন্তার কারণ হলো, স্কুল থেকে বিদায় নিতে হবে। বলে-কয়ে আরও দু'বছর তিনি শিক্ষকতা করার সুযোগ পেলেন। এই সময়টার মধ্যে প্রাণপণ চেষ্টা চালালেন অন্য কোথাও একটা শিক্ষকতার কাজ জুটিয়ে নিতে। উদ্দেশ্য, একটা কাজ পেয়ে গেলে বাকি সময়টা মধুপুরীতে কাটিয়ে দেবেন। কিন্তু ইংরেজরা চলে যাওয়ার পর মধুপুরীতে সংস্কৃতের কদর বাড়েনি, বরং কমছে। তার চেয়ে ইংরেজির কদরই বাড়ছে। আজও বিলাতী ধাঁচে চালানো ছোট-বড় ছেলেদের কনভেন্ট আর স্কুলগুলোতে নতুন প্রবেশার্থীদের জায়গা পেতে বড় কষ্ট হয়। আজও মধুপুরীর রাস্তায় আগের চেয়েও বেশি ইংরেজিতে কথাবার্তা চলে। গুরুজী যদি ইংরেজি জানতেন, তাহলে সম্ভবত এখানেই কিছু টিউশনী জুটে যেত কিংবা ঐ ধরনের অন্য কোনো কাজ।

স্কুল থেকে অবসর নেওয়ার পরও গুরুজী বেশ কয়েক মাস মধুপুরীতেই চেষ্টা চরিত্র চালালেন। এদিক-ওদিক দৌড়-ঝাঁপ করেও কোনো ফল হলো না। মধুপুরীতে বসে বসে প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের টাকা খরচ করাটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়, সেটা তিনি ভালোভাবেই জানেন। মধুপুরীর পথে-ঘাটে গুরুজীর সৌম্য মূর্তি চিরকালের জন্য অদৃশ্য হয়ে যাবে, তাঁর হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুদের কেউ তা চায় না। পণ্ডিতগিরি পুরোহিতগিরির দিকে কোনোদিনই তিনি বিশেষ মনোযোগ দেননি। কেবল পণ্ডিতজী, গুরুজী সম্বোধন পেতে যেটুকু দরকার, শুধু সেইটুকুই করতেন। অবশেষে মধুপুরী ছাড়তেই হলো তাঁকে। মধুপুরীতে যখন তিনি প্রথম পা দেন, তখন বয়স খুবই অল্প ছিল, দীর্ঘ ভবিষ্যৎ ছিল সামনে, যদিও সে-ভবিষ্যতের কোনো রূপরেখা গড়ে ওঠেনি। এখন আর ভবিষ্যৎ দীর্ঘ হওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু যতক্ষণ

জীবন, ততোক্ষণ ভবিষ্যতের প্রতি অনুরাগ অক্ষুণ্ণ তো রাখতেই হবে। চলে যাওয়ার সময় তাঁর চোখের সামনে মধুপুরী তার সমস্ত বৈশিষ্ট্য নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তিরিশটিরও বেশি গ্রীষ্মকাল বর্ষাকাল কত পরিতৃপ্তির সঙ্গে কাটিয়েছেন এখানে! কখনও ঘাম ঝরেনি, পাখা নাড়ারও দরকার হয়নি। মধুপুরীতে তাঁর কত অগণিত বন্ধু-বান্ধব আর জানাশোনা লোক। এদের বদলে তিনি এখন গাঁয়ের সেইসব লোককেই পাবেন, যাদের মধ্যে পারস্পরিক সহানুভূতি কম, ঈর্ষাটাই বেশি।

গুরুজী একদিন মধুপুরী থেকে চলে গেলেন। তাঁর অনুরক্তরা খুব সহৃদয়তার সঙ্গে বিদায় জানালো তাঁকে।

ইংরেজরা মধুপুরীকে একটা বিনোদন-নগরী হিসেবে তৈরি করেছিল আর বহুদিন ধরে তা একমাত্র তাদেরই বিনোদন কেন্দ্র ছিল। আগে সামন্ত শ্রেণী অর্থাৎ রাজা-মহারাজা-তালুকদারেরাও 'গ্রীষ্মকালে চ শীতল' কথাটার খ্যাতি শুনে এদিকেই দৌড় দিতেন। প্রথমত ওঁদের সংখ্যা কম ছিল, দ্বিতীয়ত ইংরেজদের বর্ণবৈষম্য মনোভাবের দরুণ খুব গা বাঁচিয়ে সাধারণ জায়গাগুলোতেই থাকতে হতো ওঁদের। তখনও ওঁদের অন্দরমহলে সাতটি তালা লাগানো হতো, তাই এখানে যাঁরা নিজেদের রানী বা বেগমকে সঙ্গে নিয়ে আসতেন, তাঁদেরও সাত তালার ব্যবস্থা করতে হতো। বিংশ শতাব্দী শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মধুপুরীর যৌবনকাল শেষ হতে শুরু করে। ঠিক তখন থেকেই অন্দরমহলে একটু একটু করে আধুনিকতার ছাপ পড়তে লাগে। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় মধুপুরী প্রায় বার্ধক্যে উপনীত হলো। তখন থেকেই অন্দরমহলের সাত তালা ভেঙে পড়তে লাগল। অন্দরমহলের দরজা তো আগেই ভেঙেছিল, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ার সময়। মহাযুদ্ধের পর ইংরেজরা পোঁটলা-পুঁটলি বেঁধে চম্পট দিলো। এখন মধুপুরী আমাদের সামন্তদের কাছে মুক্ত ভোগ-বিলাসের জায়গা। বহু অন্দরমহল শতাব্দীর অন্ধকার ভেদ করে আলোর জগতে এসে পড়ল। এখনও যাঁদের অন্তঃপুরে কিছুটা মানামানি রয়েছে, তাঁদের অন্তঃপুরবাসিনীরাও মধুপুরীতে এসে অনেকটা স্বচ্ছন্দবিহারিণী হয়ে উঠেছে। একটি ঘটনার উল্লেখ করলে কথাটা বুঝতে সুবিধে হবে। একদিন রাজস্থানের এক ঠাকুরানী তাঁর বৌমা আর মেয়ের সঙ্গে ঘোমটা না দিয়েই ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, এমনকি তাঁর গঙ্গা-যমুনি ধাঁচে বাঁধা চুল আঁচল দিয়েও ঢাকেননি। হঠাৎ তাঁর এক আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা হতেই তিনি তাড়াহুড়ো করে আঁচলে মাথা ঢাকলেন। আজন্মবন্দিনীদের যখন এই অবস্থা, তখন বিশ-পঁচিশ বছর আগে অন্তঃপুরে যাদের জন্ম, তাদের সম্বন্ধে আর কি বলা যায়! কিন্তু এই আলোর ঝলমলানি দু-চার দিনের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ালো। যদিও সেই অন্ধকার অমানিশা পুনরায় নেমে আসেনি, কিন্তু সামন্তদের কাছে এই স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুর পরোয়ানা এসে হাজির হলো —জমিদারী তালুকদারী উঠে গেলো, মাপা জোখা টাকা-পয়সা বেহিসেবী খরচ করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ালো।

অন্দরমহলে আধুনিকতা একই আকারে একই মাত্রায় প্রবেশ করেনি। এই

শতাব্দীর গোড়ায় কিছু কিছু অন্দরমহলের দরজা একেবারে উন্মুক্ত হয়ে গিয়েছিল, অন্যগুলোতে এক-আধটু আলো ঢুকছিল ফাঁক-ফোকর দিয়ে, ফলে অন্তঃপুর-বাসিনীদের বিকাশও সমান হয়নি। তবুও তাদের একটা সুবিধা অবশ্যই ছিল, বিবাহ সম্বন্ধটা ছিল রাজাদের আপসের ব্যাপার, কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে রাজপুত রাজারা, যাঁদের বেশ ভালো সংখ্যক জমিদারী তালুকদারী ছিল—তাঁরা জাত-পাতের ব্যাপারে খুব উদারতা দেখাতে থাকেন। ধর্মশাস্ত্রে সর্বথা-নিষিদ্ধ সমুদ্র-যাত্রা রাজপুতেরাই সর্বাগ্রে শুরু করেন। তাঁদের মধ্যে যিনি একশো বছর আগে বিলাত গিয়েছিলেন, তিনি হাত ধোওয়ার জন্যে সঙ্গে করে শুধু গঙ্গাজলই নিয়ে যাননি, ভারতের মাটিও নিয়ে গিয়েছিলেন। বর্তমান শতাব্দীর প্রথম পাদের শেষ দিকেও তো মালব্যজী এ রকম নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়েছিলেন, আর তিলকের মতো রাষ্ট্রনেতা, তিনিও বিলাত থেকে ফিরে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেছিলেন। কিন্তু রাজপুত রাজারা মন থেকে ওসব চিন্তা-ভাবনা খুব শীগগিরই দূর করে দিলেন। রাজস্থানী রাজপুত রাজা কাঁচা-ফলার পাকা-ফলার এবং অন্যান্য পানভোজনেও ছুতের কথা ভাবেন না, রান্নাবান্নাতেও ছোঁয়াছুঁয়ি মানেন না। তাঁদের প্রাসাদে এক ফার্লং দূরে তৈরী করা সবরকম খাবার, তা কাঁচা ফলারই হোক আর পাকা ফলারই হোক, জুতো পায়ে চাকরেরা বরাবর বয়ে নিয়ে আসে, আর খাওয়ার সময় একই পঙ্‌ক্তিতে বসে স্বজাতি মুসলমানরাও খেতে পারে। তবে হ্যাঁ, জাতের বাঁধন অবশ্যই আছে, বিয়ের সময় বংশ দেখা হয়, খাঁটি রাজপুতের সঙ্গেই বিয়ের সম্পর্ক স্থাপন করা হয়। কিন্তু হাজার দেড়-হাজার বছর পরে ইতিহাসের আবার পুনরাবৃত্তি ঘটল, টাকা এবং তলোয়ারের জোরে আগেও জাতে ওঠা এবং জাত থেকে বের করে দেওয়ার ঘটনা ঘটত, এখন আবার সেই রকম শুরু হলো। আমাদের চোখের সামনে ত্রিবাঙ্কুর, কোচিন, পুদ্দুকোট্টের মতো কয়েকটি জায়গার রাজা বাদে বাকি সমস্ত জমিদারীর মালিকই বিবাহ-সূত্রে একজন আরেকজনের সঙ্গে সম্পর্ক পাতিয়ে নিয়েছেন। হঠাৎ লোকে চোখ মেলে চেয়ে দেখে বিস্মিত হলো যে কালকের কুমোর, পশুপালক, কুর্মী, জাঠ, শুঁড়ি এবং অন্য জাতের রাজারা কি করে রাতারাতি রাজপুত হয়ে গেলেন? কিন্তু যাঁদের বাড়িতে সূর্যবংশ, চন্দ্রবংশ কিংবা অগ্নিবংশের রাজকন্যারা এসেছে, তাঁরা নিজেদের রাজপুত ছাড়া আর কি বলতে পারেন? অন্তঃপুরে বিবাহ-সম্পর্কের যথেষ্ট প্রভাব পড়তে লাগল। যে রাজকন্যা অন্তঃপুরের চার দেওয়ালের মধ্যে কখনও আবদ্ধ ছিল না, বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ি এসে সে কি পর্দা মেনে চলতে পারে? তার ওপর জেনে-শুনেই বিয়ে দেওয়া হয়েছে, রাজকুমারও নাবালক না, তার নব-পরিণীতা বধূও নাবালিকা নয়। প্রথম প্রথম যখন কোনো রানীকে লাজুক লাজুক চোখে শাড়ি পরা অবস্থায় বাইরে দেখা যেত, মুখে ঘোমটা নেই, শুধু মাথায় আঁচলখানি টেনে দেওয়া, তখন লোকে অবাক হয়ে দেখত। কিন্তু মধুপুরীতে সেটা কিছুই

না, এখানে ওটাকেও সেকেলে বলা হয়। মাথায় দীর্ঘ চুল রাখা কোনো রাজকুমারীকে আজকাল কেউ পছন্দ করে না, সবারই চুল ছাঁটা। কিন্তু আগেই বলেছি, আধুনিকতার প্রভাব সকলের ওপর সমান নয়। এমন রানী আছে, যে পাতলুন পরে ঘুরে বেড়ায়, চুল ছাঁটে, স্বামী এবং ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সে কেবল ইংরেজিতেই কথা বলে, চাকর-বাকরদের সঙ্গে হিন্দীতে, আর উচ্চারণে ও ব্যাকরণে ইংরেজ মেমদেরও কান কাটে! তবুও তার সিঁথির সিঁদুর চলে আসে নাকের ওপর পর্যন্ত, নাকে নাকছাবি পরে, শাশুড়ীর পায়ে পা লাগলে দেখা যায়, সেকালের বউদের সঙ্গে তার কোনো তফাত নেই, আবার শাশুড়ী আধশোয়া হয়ে বসে থাকলে তাঁর পা টিপে দিয়েও আসে, মন্দিরে-দেবস্থানে দারুণ ভক্তিভরে দণ্ডবৎ প্রণাম করে। এমন রানী বা রাজকন্যাদের আপনি কি করে খাঁটি আধুনিকা বলতে পারেন?

যাদের বংশে আধুনিকতার তৃতীয় পুরুষ চলছে, সেখানে আরও কিছু বৈশিষ্ট্য চোখে পড়বে। হয়ত দু'জন রাজকুমারীই চুল ছেঁটে পাতলুন পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কিন্তু দু'জনকে একসঙ্গে দেখলে তফাতটা পরিষ্কার বোঝা যায়। পুরোপুরি আধুনিক তরুণীর নাকে ফুটো থাকবে না, নাকছাবি পরার প্রয়োজনীয়তা বোধ করে না সে। তার কপালে কিংবা সিঁথিতে সিঁদুরও চোখে পড়বে না। চিত্রতারকাদের ধন্যবাদ দেওয়া উচিত যে তাদের উদ্ভাবিত ফ্যাশনের কল্যাণে এইসব সর্বাধুনিকা রানীদের কপালেও একটা ছোট্ট টিপ কখনো কখনো চোখে পড়ে যায়। যেহেতু ছোটবেলা থেকে দুধ-চোষার সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য অর্থাৎ আধুনিক সভ্যতার চর্চা করেছে, তাই তাদের কোনোকিছুই কৃত্রিম বলে মনে হয় না, তাদের পরনে কোট পাতলুন কামীজ দেখলেই তা পরিষ্কার বোঝা যায়। অবশ্য তার মানে এই নয় যে তারা নিজেদের সাজসজ্জায় কৃত্রিমতা আড়াল করতে পারে।

সীজনে মধুপুরীতে সর্বাধুনিক রাজকন্যাদের যথেষ্ট চোখে পড়ে। সন্ধ্যেবেলা হোটেল-রেস্তোরাঁর নাচ-ঘরে তাদের বল ড্যান্স করতে দেখা যাবে। কোনো বড় কর্মচারী কিংবা মন্ত্রীর শুভাগমন হলে সেখানে তারা অবশ্যই গিয়ে হাজির হবে। বংশমর্যাদার কথা চিন্তা করে তাদের সামনের সারিতে স্থান দেওয়া হয়। আগে যেমন তারা অন্তঃপুরের অন্ধকারে নিতান্ত উপেক্ষিত হয়ে থাকত, এখন তেমনি তাদের উদ্দীপ্ত উদ্ভাসিত দেখায়।

মীনাক্ষী এই রকমই এক সর্বাধুনিকা রাজকন্যা, তাকে মধুপুরীতে শুধু গ্রীষ্মকালের সীজনেই নয়, পরেও তাকে দেখতে পাওয়া যাবে। রোদ্দুর হলে তাকে দেখা যাবে উর্দি পরা রিকশাওয়ালার রিকশায়, নইলে মধুপুরীর সদর রাস্তায় সে পায়ে হেঁটেই ঘুরে বেড়ায়। মীনাক্ষী নামটি তার অনুপযুক্ত নয়, বরং বিগত হাজার বছরে হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত, আসাম থেকে রাজস্থান পর্যন্ত, এই বিপুল বিস্তৃত মহাদেশে যদি কারোর নাম হিসেবে 'মীনাক্ষী' শব্দটি সার্থকরূপে

প্রয়োগ করতে হয়, তাহলে সেটা ওরই নাম হিসাবে। অতো বড় বড় চোখ দেখার জন্যে আপনাকে জৈনদের হাতে-লেখা পুঁথির পাতা ওল্টাতে হবে, না তো এমন কোনো দেবতাকে খুঁজতে হবে, যার মুখখানার চেয়েও বড় বড় চোখ ওপর থেকে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। সত্যি বলতে, জ্যান্ত, চলে ফিরে বেড়ানো একটা মানুষের মুখে ওপর থেকে বড় বড় চোখ বসিয়ে দেওয়া অসম্ভব, কিন্তু অসম্ভব ব্যাপারও মীনাক্ষীর কাছে সম্ভব হয়ে উঠেছে। চোখ দুটোর ঠিক সমান সমান ভুরু নেই, সেজন্য তাকে বরাবর কালো পেন্সিলে লম্বা রেখা টানতে হয়। অত্যাধুনিকা হওয়া সত্বেও সে সবসময় পুরনো সাজগোজের জিনিসগুলো বয়কট করতে চায় না। সুর্মার বদলে ঘন কালো কাজলই তার বেশি পছন্দ, আর তা লাগানোর সময় চোখের কোণ থেকে কানের দিকে এক আঙুল দেড় আঙুল বেশিই টেনে দেয়। চোখ বড় করতে এর চেয়ে ভালো উপায় আর কিছু হতে পারে না, অন্য কিছুর দরকারও নেই, তবে ভুরু দুটোকে অবশ্যই বাড়িয়ে দিতে হয়। প্রকটিত সাদা অক্ষিগোলকে কালো মণি দুটো অদ্ভুত দেখায়। নকল চুলের মতো যদি নকল চোখ লাগানো যেত, তাহলে মীনাক্ষীর চোখ দুটো লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা মূল্যের নয়, তার চেয়ে অনেক বেশি মূল্যবান হয়ে উঠত। কপালে টিপ পরে, তা যে কোনো রঙেরই হোক না কেন, মীনাক্ষী নিজের কপালটিকে কখনও কলঙ্কিত করে না। তার চুল ছাঁটা, কোঁকড়ানো, আর সবসময়েই তা খোলা থাকে। তার মাকেও মেয়ের বেশ ভূষায় মাঝে-মধ্যেই দেখা যায়। লোকে অনেক সময় ভুল করে বসে, ভাবে, হয়ত ছোট-বড় দুটি বোন। কিন্তু তার মানে এই নয় যে মায়ের চোখ দুটো মীনাক্ষীর মতো। যখন প্রথম বংশেই চুল ছেঁটে পাতলুন পরে আধুনিকা সেজে গেছে, তখন পরবর্তী বংশধরদের বেলা আর কি বলার আছে?

মীনাক্ষীর চোখের দিকে তাকানোর পর তার নখের ডগাগুলোর দিকে তাকালে ব্রহ্মার বুদ্ধির ওপর মনে সংশয় জাগে। চোখ দুটো দেওয়ার বেলা যখন এত উদারতা দেখিয়েছেন, তখন আর সব ব্যাপারে এত কার্পণ্য দেখিয়ে নিজের নিচু মনের পরিচয় দিয়েছেন কেন? চোখের সঙ্গে মুখের গড়নটার আদৌ সামঞ্জস্য নেই। মুখখানি লম্বা, মাংসহীন, খসখসে। বেচারী মীনাক্ষী বারবার রুজ লাগিয়ে গাল দুটো লাল করে রাখে, গলাতেও লাগায়। মুখখানা তো হর-হামেশা সতর্কভাবে পাউডারে ঢেকে রাখে। অবশ্য আয়নায় দেখে সে ভালোভাবেই বুঝতে পারে যে ব্রহ্মার সৃষ্টিছাড়া কর্মটাকে কোনোমতেই ঢাকা সম্ভব নয়। তাই হয়ত তিক্ত-বিরক্ত হয়ে নিজের ঠোঁট দুটো নিয়ে পড়ে। সত্যিই, কোনো তরুণী সম্বন্ধে যদি বলা হয় যে সে মণ মণ লিপস্টিক ঠোঁটে লাগায়, তবে সে নিশ্চয়ই মীনাক্ষী। তার ছোট করে ছাঁটা কালো চুল অতি-সুন্দরী যে-কোনো চিত্র-তারকার চুলের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে, কিন্তু মুখের দিকে তাকালেই মনটা খারাপ হয়ে যায়। কিন্তু ব্রহ্মার কাজের ওপর হাত দেওয়া কি সম্ভব? চোখ দুটি বাদ

দিলে মীনাক্ষীর সারা শরীরটাই যেন তার সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। কাঠের হাত-পা যেন ওর দেহে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। সেরা পাতলুন আর জাঁকালো কোট দিয়েও ওগুলোকে ঢাকা সম্ভব নয়। মীনাক্ষীর লাল রঙ খুব পছন্দ, শুধু ঠোঁটের লালিমাতেই সেটা মালুম হয় না, গায়ের লাল কোট দেখলেও সেটা টের পাওয়া যায়। কখনো কখনো খেলোয়াড়দের কোটও পরে সে, অবশ্য কোনো বিশেষ খেলায় তার শখ আছে কি-না, বলা কঠিন। যদি খুব কনকনে শীত না পড়ে, তাহলে মীনাক্ষী শুধু জামা-পাতলুন পরেই ঘুরে বেড়ায়। অনেক সময় ভুল করে তাকে বেশ সুন্দরী বলে ভ্রম হয়, যদি না তার মুখের দিকে চোখ পড়ে। আর বলা বাহুল্য, মুখের ওপর চোখ পড়লেও যদি কেউ তার বড় বড় চোখ দুটিই শুধু দেখে, তাহলে সে তার প্রশংসায় কালিদাস থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত সমস্ত মহাকবির লেখা হাজার হাজার পঙ্‌ক্তি আবৃত্তি করার আনন্দ উপভোগ করতে পারে। হাত-পায়ের অনুকরণ করেছে তার সারা দেহ-কাঠামোটি, গায়ে মাংস খুবই কম, আর চর্বি তো এক ফোঁটাও নেই। এ রকম দেহ-কাঠামোর জন্যে চেহারাটা লম্বা দেখায়, খুব মানানসই নয় সেটা। হাঁটা-চলায় সে না গজেন্দ্রগামিনী, না হংসগামিনী। কথাবার্তায় সে ছোটবেলা থেকেই ইংরেজ আয়া এবং অন্যান্য শিক্ষিকাদের নির্দেশে নাকে উচ্চারণ করাটা বেশ ভালো রপ্ত করে নিয়েছে, কিন্তু তাতে খুব একটা স্বর মাধুর্য আসেনি।

বিংশ শতাব্দীতে মীনাক্ষীর মতো মেয়ের কপালে প্রেম জুটবে না, সেটা খুব অন্যায়। যদি এমন অমূল্য চোখের খদ্দের না জন্মায়, তাহলে তার চেয়ে বেশি পুরুষের অকৃতজ্ঞতা আর কি হতে পারে? রাজবংশগুলির কি কোনো কবি-হৃদয় অথবা কবিতা-পাগল রাজকুমারের জন্ম দেওয়ার ক্ষমতা নেই? সেকালে রাজারা এক-একটি স্তবক আর এক-একটি শ্লোকের জন্য লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দিতেন, অর্ধেক রাজ্যপাট পারিতোষিক দেওয়ার কথাও শোনা যায়, অথচ যেখানে মীনাক্ষীর চোখ সত্যি-সত্যিই মীনের চোখের মতো—তাও আবার মীনের মধ্যে শিঙি, রুই, চিতলের মতো সাধারণ মাছ নয়, ঠিক যেন শফরীর চোখ, সেই চোখের জন্য জান দিয়ে দেওয়ার মতো কাউকে যদি ব্রহ্মা সৃষ্টি না করে থাকেন, তবে তাতে তিনি তাঁর পাষাণ-হৃদয়েরই পরিচয় দিয়েছেন। যদি মৃগ ও কমলকে লজ্জা দেওয়ার মতো সেই চক্ষু দুটি অন্তঃপুরেই লুকানো থাকত, কোনো রাজকুমারের চোখে না পড়ত, তাহলে মীনাক্ষীর ক্ষেত্রে এ রকম ঘটনা ঘটলে অবশ্য কাউকে দোষ দেওয়া যেত না। কিন্তু মধুপুরীর প্রধান সড়কে মীনের মতো ঐ চোখ দুটি বছরে ছ'মাস ঘুরে বেড়ায়। সকলেই সেই অসাধারণ চোখ দুটি থেকে নিজেদের চোখ বাঁচিয়ে তাকে দেখতে চায়, মনে মনে অতৃপ্তই থাকে। রাজকুমারী মীনাক্ষী তার বংশের উপযুক্ত কুমারকেই বরণ করতে পারে, সাধারণ বাবু বা শেঠ সম্প্রদায়ের তরুণের পক্ষে তার হাতের দিকে হাত বাড়ানো অসম্ভব। গত দশ বছর ধরে, যতদিন

মীনাক্ষী মধুপুরীতে প্রতি বছর যাওয়া-আসা করছে, মধুপুরীর সড়কে কয়েক হাজার কুমারও যাতায়াত করেছে। অথচ —সংসার বড় নিষ্ঠুর। আর এখন তো সেই সময়ও কাছিয়ে আসছে, যখন বিগতবসন্তে বুলবুলের গানও থেমে যাবে। প্রাচীন অন্তঃপুরের কুমারীদের ভাগ্যকে এখন ঈর্ষা করে মীনাক্ষী, তাদের অন্তত এ রকম নিঃসঙ্গ জীবন কাটাতে হতো না। পতিদেবতা ঘরে আসার পরই নবপরিণীতা বধূর মুখ দেখার সুযোগ পেত, বিয়ের আগে কনে দেখতে আসা মেয়েদের কিছু উৎকোচ-উপহার দিয়ে সার্টিফিকেট আদায় করে নেওয়াটা কঠিন ছিল না। আর যদি কোনো শেখানো-পড়ানো দাসী মীনাক্ষীর চোখের প্রশংসা করতে গিয়ে বিহারীর কয়েকটি দোহা আওড়াত, তাহলে তা মিথ্যে কথা বলে কেউ অভিযোগ করতে পারত না। রুজ, লিপস্টিক, পাউডার, কলপ যৌবনের আয়ুষ্কালকে আর কয়েকদিন বাড়াতে পারে মাত্র, তবে আসল বসন্তেই যখন ভ্রমর এলো না, তখন নকল বসন্তে আসার কি সম্ভাবনা থাকতে পারে?

মধুপুরী এখন আর শ্বেতাঙ্গদের নেই, শুধু কর্তৃত্বের দিক দিয়েই নয়, প্রভাবের কথা বিবেচনা করলেও। দেশে এখানে-ওখানে ইংরেজ এবং অন্যান্য ইউরোপীয় মিশনারী কম-বেশি থেকে গেছে, তাদের কিছু কিছু লোক গ্রীষ্মকালে মধুপুরীতে চলে আসে। ভারতীয় ভাষা শেখানোর কেন্দ্রীয় স্কুল একটাই, সেজন্য সেখানে তাদের সংখ্যা দু-তিনশোতে গিয়ে দাঁড়ায়। তাদের মধ্যে কিছু কিছু মহিলাও থাকে। কিন্তু ইউরোপের ফেলনা পুরুষগুলো যেমন মিশনারী হয়ে আর সব দেশের মতো ভারতেও যীশুখ্রীষ্টের ঝাণ্ডা ওড়াতে আসে, তেমনি সেখানকার ফেলনা মেয়েগুলোও এ-লাইনে পা বাড়ায়। সুন্দরী তো নয়ই, কুরূপার প্রতিযোগিতা হলে এদের ভেতর থেকেই বিশ্বকুরূপা পাওয়া যেতে পারে। এই যদি অবস্থা হয়, তাহলে তাদের পক্ষে মধুপুরীতে ফ্যাশনের ডিকটেটর হওয়া কি সম্ভব? অন্য শ্বেতাঙ্গিনীরা দিল্লীর দূতাবাসের, কিন্তু তাদের সংখ্যা নিতান্তই কম। এক প্রান্তে হোটেলে থাকে তারা। তবে হ্যাঁ, তাদের মধ্যে সুন্দরী নেই, একথা বলা যায় না। তাই মধুপুরীর রূপের হাটে এখন কেবল এ-দেশী মহিলাদেরই রমরমা, তাদের জন্য প্রত্যেক দেশপ্রেমিকেরই উচিত গর্ব বোধ করা। অন্তত এই একটি ক্ষেত্রে, তা নিজেদের দেশের মধ্যেই হোক না কেন, তবু তো আমাদের মহিলাদেরই নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অনেকে এটাকে 'দেশী চিড়িয়া মারাঠী বোল' কিংবা 'দিশী বোতলে বিলিতি মদ' বলে উপহাস করবে, কিন্তু তুলসীবাবার আমলেও ছিদ্রান্বেষী কপটাচারীর অভাব ছিল না।

মধুপুরীর রূপের হাটে এ-দেশী রূপসীদের প্রাধান্য, তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত তারা। ক্রমানুসারে বলতে হলে, প্রথম শ্রেণীটি হলো রাজরানী ও রাজকন্যারা, তাদের মধ্যে পড়ে মীনাক্ষী এবং তার চেয়েও সৌভাগ্যশালিনী ভূতপূর্ব অন্তঃপুরিকা বা তাদের সন্তানেরা। দ্বিতীয় শ্রেণীটি হলো আমলাদের ঘরে লালিত

পালিত প্রজাপতিরা, আধুনিকতায় তারা সামন্তপত্নী ও সামন্তকন্যাদের চেয়েও বেশি প্রৌঢ়, বোধ হয় সে-কথা উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। তৃতীয় শ্রেণীটি হলো শেঠানী ও শেঠকন্যারা। এদের বাদ দিলে বাকি থাকে খুব সামান্য বাবু গৃহিণী এবং অন্যান্যরা, তাদের আমি ঐ তিনটির মধ্যেই বলুন আর তেরোটির মধ্যেই বলুন, কোথাও রাখতে পারিনি।

ফ্যাশনের বাজারে রূপের কর্তৃত্ব নেই, সেখানেও লক্ষ্মীরই জয়-জয়কার। লক্ষ্মী মানে সৌন্দর্য-লক্ষ্মী নয়, ধন-লক্ষ্মী। ফ্যাশনের জগৎ সবচেয়ে বেশি ব্যয়বহুল, সেজন্য সেখানে একমাত্র লক্ষ্মীরই আধিপত্য, তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। 'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী' কথাটা প্রাচীন যুগেও বলা হতো, কিন্তু তখন অন্তরের অন্তস্তল থেকে ওকথা উচ্চারিত হতো না। সামন্তদের হাতে শাসনব্যবস্থা ছিল, তলোয়ারের জোরে মহাশেঠেরও কোষাগার মুহূর্তে লুণ্ঠন করে সমস্ত টাকাকড়ি নিজেদের বাড়িতে তোলার ক্ষমতা ছিল তাদের। সেজন্য তখন লক্ষ্মীর প্রভু একমাত্র শেঠেরা ছিল না। আর আজকাল, যখন দেশের শাসনব্যবস্থাও পরিচালিত হচ্ছে শেঠেদের কল্যাণের জন্যে, তখন তাদের স্থান একটু অন্যরকম তো হয়েছেই, সেরকম স্থান ইতিহাসে আর কখনও দেখা যায়নি। শাসন-যন্ত্রের প্রকৃত নিয়ামক তারাই। তাদের বাড়িতে বাড়িতে ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী আর চোরাবাজারের চেহারায় সত্যি-সত্যিই কল্পবৃক্ষ গজিয়েছে, সোনার টাঁকশাল তৈরি হয়েছে। তাদের সম্পত্তির সীমা-পরিসীমা নেই। আজ কোনো শেঠকে লক্ষপতি কেন, কোটিপতি বলাটাও অপমানজনক। এই শেঠ-শ্রেণীই মধুপুরীর সবচেয়ে নতুন রঙরুট। সংখ্যার দিক দিয়ে এখনও তারা সামন্ত আর আমলাদের সমান নয়, কিন্তু ইংরেজদের বড় বড় বাড়িগুলো তাদের হাতে, সেগুলোতে দশ-বিশ জন করে চাকর-বেয়ারা নিয়ে বাস করার হিম্মত রাখে তারাই। যদিও শেঠ তরুণ-তরুণীদের ভেতর আধুনিকতার বিস্তার ঘটছে, কিন্তু তা খুব দ্রুতবেগে নয়। তাদের তরুণেরা বাড়ির অনেক কিছু খুব সঙ্কোচের সঙ্গে মধুপুরীতে নিয়ে আসে, প্যান্টের ওপর গলাবন্ধ কোট পরে বেড়ায়। তাদের মধ্যে যারা মধুপুরীর জন্য খাস করে হোয়াইট্‌ওয়ে-ল্যাড্‌লাক স্যুট কিনে নিয়ে আসে, তারাও ভুলে যায় যে কোট-প্যান্ট পরে হাঁটার ঢঙ্‌টা অন্য রকম। এমনভাবে হাঁটে তারা, দেখে মনে হয়, তাদের বাপ-ঠাকুর্দার মতো ধুতি-পাঞ্জাবি পরে হাঁটছে। কথাবার্তাতেও আধুনিকতার ছাপ খুব কম দেখা যায়। ওরা এটা বোঝে না যে, মধুপুরীর এই একমাত্র প্রধান সড়কটিতে শুধু ইংরেজি কথাবার্তাই চলে। অন্তত আধুনিক বেশভূষায় সজ্জিত যেসব নর-নারী, তাদের ক্ষেত্রে তো সঙ্গী-সাথীদের সঙ্গে ইংরেজি ছাড়া অন্য কোনো ভাষায় কথা বলাটা একেবারেই নিষিদ্ধ। এইসব শেঠ পুত্রদের পকেট গরম ঠিকই, কিন্তু তাদের চোখ মেলে দেখার ক্ষমতাটা এখনও জোটেনি। তারা নিজেদের মধ্যে কখনো কখনো মারোয়াড়ী কথা বলে ফেলে, কিংবা মুখ দিয়ে ভুল-ভাল হিন্দি বেরিয়ে যায়, আর তাই শুনে

আধুনিক মেয়ে-পুরুষেরা মুচকি হেসে চেয়ে চেয়ে দেখে তাদের এবং নিজেদের মধ্যে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করতে করতে চলে যায়। ওরা এখনও নিজেদের ভুল-ত্রুটি বুঝতে পারে না, কিন্তু টীকা-টিপ্পনিগুলো তো মাঝে-মধ্যে কানে এসে পৌঁছে যায়ই।

পঞ্চাশ পুরুষ আগে অন্তঃপুরগুলি দেশের সর্বাধিক সুন্দরীর সংগ্রহশালাই ছিল না, সেগুলিকে সুন্দরীদের নার্সারীও বলা যায়। সেখানেই অনিন্দ্যসুন্দরীদের জন্ম হতো, এক কালে তাদের স্বয়ম্বর সভায় পারিতোষিক হিসেবে রাখা হতো। সম্ভবত স্বয়ম্বর প্রথা উঠে যাওয়ার জন্যই অন্তঃপুরগুলি সুন্দরীদের নার্সারী হওয়ার বিশেষ মর্যাদাটি হারিয়েছে। ঐ অন্তঃপুরেই ছেলেরাও জন্মাচ্ছে, জন্মাচ্ছে মেয়েরাও। ছেলেদের মধ্যে যদি আপনি কুশ্রীর সংখ্যা বেশি দেখতে পান, তাহলে মেয়েদের মধ্যেও রূপসীর সংখ্যা এমন কিছু বেশি দেখতে পাবেন না! যে সময় সারা দেশের রূপরাশি প্রাসাদের অভ্যন্তরে নিয়ে আসা হতো, আমাদের মুনি-ঋষিরা বিধান দিয়েছিলেন 'স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি,' সে সময় বস্তুত রূপের হাটে অন্তঃপুরেরই একাধিপত্য ছিল। এখন আর কি আছে? তবুও, শেঠানী ও শেঠকন্যাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এখনও সামন্ত শ্রেণী অনেক আগে, মধুপুরীতে সেটা সহজেই বোঝা যায়।

এই দুটি শ্রেণী ব্যতীত তৃতীয় শ্রেণীটি হলো আমলাদের। বুদ্ধিজীবী শিক্ষিত শ্রেণীরাও যেহেতু একই অস্থি-মাংসের, সেহেতু তাদেরও আমরা এই শ্রেণীতেই রাখতে পারি। কিন্তু এটা পরিষ্কার যে, গত তিন দশক ধরে স্বয়ম্বর প্রথা অনুসারে সুন্দরীদের বণ্টন হয়েছে শুধু আমলাদের মধ্যে, সমস্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে নয়। আই. সি. এস. জামাই পাওয়ার জন্যে অনেক মেয়ের বাপই এমন তপস্যা করেন, যেন রাজর্ষি, ভগীরথ। নিজের সমস্ত কিছু দিয়ে তিনি তাঁর মেয়েটিকে সুশিক্ষিত করে তোলেন, আধুনিক সমাজের চাল-চলন শেখান, বুঝে-সমঝে চলার জন্যে মেয়েকে তালিম দেন, বিলাত-ফেরত জামাইয়ের সকল ইচ্ছে পূরণ করার জন্যে মেয়েকে সর্বগুণে অলঙ্কৃত করে তুলতে এতটুকু ত্রুটি রাখেন না। প্রাচীন স্বয়ম্বর প্রথা আর এই স্বয়ম্বর-প্রথার মধ্যে পার্থক্য শুধু এইটুকুই, আগে যেখানে নির্বাচনের অধিকার ছিল কনের, এখন সেখানে বরের। ইংরেজ আমলে বছরে পঁচিশ থেকে পঞ্চাশ জন আই. সি. এস. হতো, আর তাদের জন্যে হাজার নবশিক্ষিতা সুন্দরী বরণমালা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত। এক বছর ব্যর্থ হলেও তারা এবং তাদের অভিভাবকেরা হতাশ হতেন না। বরণমালা শুকিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত তারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রতীক্ষা করত। এভাবেই সৌন্দর্য-নির্বাচনের বিষয়টি সামন্ত আর শেঠদের মধ্যে নয়, আমলা শ্রেণীর মধ্যেই চলে এসেছে, এটা একেবারে স্পষ্ট। মধুপুরীতে শেঠ ও সামন্ত শ্রেণীর স্ত্রী-কন্যারা আমলাদের স্ত্রী-কন্যাদের কাছে সূর্যের সামনে প্রদীপের মতোই নিষ্প্রভ। কিছু কিছু সামন্ত এখনও যথেষ্ট টাকাকড়ি খরচ করতে পারেন। আর শেঠকন্যাদের ব্যাপারে তো কিছুই বলার নেই। সেকেলে শেঠেরা তো তাঁদের পুত্র-কন্যাদের খরচের বহর দেখলে হার্টফেল করবেন,

কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয়, তাঁরা মধুপুরীতে কখনও পা দেন না। চোরাবাজারী কারবার যদি বুড়োদের খরচপত্র দেখানোর ব্যাপারে চৌকস করে তোলার বিদ্যা শিখিয়ে থাকে, তাহলে যুবকেরাই বা তা থেকে পিছিয়ে থাকবে কেন! বৃদ্ধ বা প্রৌঢ় শেঠকে নিজেদের খরচপত্রের লিখিত হিসেব দিতে তরুণ শেঠ বাধ্যও নয়। এই শ্রেণীটির মধ্যেও একান্নবর্তী পরিবার দ্রুত গতিতে ভেঙে পড়ছে, ইতিমধ্যেই ভেঙে পড়েছে বলা যায়।

শেঠ স্ত্রী-কন্যাদের জাতীয় বেশভূষা যেমন উঠে গেছে, তেমনি তাদের লজ্জা-সঙ্কোচের বালাই-ও শেষ হয়ে গেছে —অবশ্য কখনও তা খারাপ অর্থে নয়। খাঁচায় বন্দী অন্তঃপুরবাসিনীরা যেমন নিজেদের মুক্ত করেছে, ঠিক তেমনি শেঠ-পরিবারেরাও সামনে এগিয়ে চলেছে। বয়সের অনুপাতে তাদের ওপরেও আধুনিকতার প্রভাবের তারতম্য দৃষ্টিগোচর হয়। বেশি বয়সের শেঠানী শাড়ি আর হাই-হীল জুতো পরেও এমনভাবে চলেন যেন ঢলঢলে ঘাগরা-চুনরী পরে হাঁটছেন। আজকালকার চিত্রতারকাদের অনুকরণে অল্প-স্বল্প কিন্তু বেশ দামী গয়নায় সেজে-গুজে বেরোনো সত্ত্বেও তাঁদের দেখে মনে হয়, হয়ত এখনও মাঝে-মধ্যে মাথায় হাত দিয়ে বোর খোঁজেন। প্রাচীন প্রভাব এখনও শেকড়সুদ্ধ উঠে যায়নি। কিন্তু তাই বলে এটুকুও তাদের কাছে খুব কম নয়। কারণ, ওপারের দিকে চেয়ে থাকা বুড়িরাও মিহি চুনরীতে পেট পর্যন্ত লম্বা ঘোমটা টেনে দিয়ে আর তলপেট খোলা রেখে ঘর থেকে বেরোত, এরা অন্তত তাদের সেইসব শাশুড়ীদের মতো ও রকম সাজ-পোশাকে বেরোয় না, তাতে তারা নিজেদের বিরক্ত ও আড়ষ্ট বোধ করে। তাদের স্বামীরাই যদি কোট-প্যাণ্ট পরা সত্ত্বেও হংসগমন ভঙ্গিটি আয়ত্ত করতে না পারে —তাহলে ওদের কি দোষ? কিন্তু তার মানে এই নয় যে লঙ্কায় বিভীষণ বিভীষণ-পত্নীরা নেই। আমলা-গৃহিণীদের মতোই নিজের মেয়েদের সঙ্গে রাজস্থানী বা হিন্দীতে নয়, ইংরেজিতেই কথাবার্তা চালাচ্ছে, এ রকম অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধা শেঠানীও চোখে পড়ে। 'পিতা রক্ষতি কৌমারে, ভর্তা রক্ষতি যৌবনে। পুত্রস্তু স্থাবিরে ভাবে ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি।' —এই ঋষিবাক্য অগ্রাহ্য করে এখন শেঠ-পত্নীদেরও তো একা-একা বিমানে চড়ে আকাশে বিচরণ করতে দেখা যায়। আর খুব তরুণী শেঠজী যারা, তারা তো আজকাল সামন্ত-পত্নী ও আমলা-গৃহিণীদেরই অনুসরণ করছে। এই দুটি শ্রেণীই তাদের সামনে আদর্শ। মধুপুরীতে এখনও এদের মধ্যে অনেককেই শিক্ষানবিশি করতে দেখা যায়, কিন্তু এগোনোর পথে কেউ কেউ যথেষ্ট সফল হয়েছে। ইদানীং শেঠপুত্র ও শেঠকন্যারা তো ইউরোপীয় ধাঁচের স্কুলে শিক্ষা-দীক্ষা নিতে শুরু করেছে। সমুদ্র-যাত্রায় ধর্ম নাশ হয় —একথা আজ তাদের কাছে হাস্যকর। টিকিধারী শেঠের পুত্ররাও আজকাল হুট-হাট করে ইউরোপ আমেরিকা পাড়ি দিচ্ছে। স্ত্রী মারা যাওয়ার পর শোকার্ত বহু শেঠ ইউরোপীয় শেঠদের অনুকরণে একপত্নীব্রত পালন করে চলেছেন। তরুণ শেঠরা আজ

বিলাত-ফেরত আমলাদের চেয়ে কোনো অংশে কম পাশ্চাত্ত্য প্রভাব সমাজে নিয়ে আসছে না।

সামন্ত, আমলা আর শেঠ—এই তিন শ্রেণী একই নৌকোয়। তাদের পরস্পরের জীবনযাত্রা খুব কাছাকাছি, প্রায় সমান হতে চলেছে। কিন্তু ভারতের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের কথা মনে করুন। এক নৌকোয় বসে থাকা সত্ত্বেও জাত-পাতের কড়াকড়ি তাদের এক হওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করছে। ইউরোপেও এক সময় রাজবংশ সামন্তবংশের সঙ্গে রক্ত-সংমিশ্রণ হতে দিত না, আর এই দুই শ্রেণীই ধনাঢ্য শেঠ-বেনেদের মাছি-পড়া দুধ বলে মনে করত। কিন্তু এখন সেখানে ঐক্য দেখা যায়। লক্ষীমন্তরা সবাই এক জাতি। আমাদের দেশেও এই মৃত গোঁড়ামি আর কদ্দিন চলবে? এই শতাব্দীর প্রথমার্ধেই ভারতের সমস্ত দেশীয় রাজা যেমন এক রাজপুত সম্প্রদায়ের মধ্যে মিশে গেছে, তেমনি ঐ তিনটি শ্রেণীও যে একদিন মিশে এক হয়ে যাবে, সেদিনের আর খুব বেশি দেরী নেই। লক্ষীর বর-পুত্রদের এবং স্থিতাবস্থা রক্ষাকারীদের বিরুদ্ধে আর একটি নতুন শ্রেণীরও উদ্ভব হচ্ছে, তাদের কণ্ঠস্বর ধীরে ধীরে উচ্চগ্রামে উঠছে, কিন্তু তাদের জন্য ভারতের প্রাচীনপন্থীদের আশঙ্কার কোনো কারণ নেই। সম্ভবত মীনাক্ষী আশায় আশায় সেই সময়েরই প্রতীক্ষা করছে।

কিন্তু কবে আসবে সম্ভাবিত সেই যুগ? ততোদিনে যদি দেখা যায়, 'বুলবুলিতে সব ধান খেয়ে ফেলেছে', কিংবা 'ফসল শুকিয়ে যাওয়ার পর বর্ষা নেমেছে,' তাহলে তখন সেই যুগ এলেই বা কি লাভ? তার থেকে মীনাক্ষী কি প্রত্যাশা করতে পারে? আজ তো তার জগৎ অন্নহীন বস্ত্রহীন যাই হোক না কেন, সামন্ত শ্রেণীর মধ্যেই সীমিত। সর্বাধুনিকা হওয়া সত্ত্বেও শেঠ ও আমলাদের বিস্তৃত জগতে পা দিতে পারে না সে। মনে মনে শুধু এটুকুই ভাবতে পারে যে তার শ্রেণীর অন্যান্য তরুণীরা এগিয়ে গিয়ে অন্য যুগটাকে দ্রুত নিয়ে আসুক। নিজের এগোনোর হিম্মত নেই বলে সে আধুনিকতার ওপর বাজি ধরছে, তাতে সন্দেহ নেই। মীনাক্ষীর এই করুণ ও দোটানা অবস্থা দেখে কালিম্পং জেলের ওয়ার্ডার বালিয়া জেলার তিওয়ারীকে মনে পড়ে। পঞ্চাশ বছরে পা দিয়েছে সে, অথচ এখনও অবিবাহিত। কখনও বিয়ে হবে, এই আশাটুকুও করতে পারে না সে। বড় করুণ কণ্ঠে বেচারী বলে, 'না-হয় বিধবা-বিবাহ চালু হলো, কিন্তু···তিওয়ারীর ভাগ্যে কচুপোড়া।' যদি তিওয়ারীকে কোনো ব্রাহ্মণ বালবিধবার পাণি গ্রহণ করতে বলা হয়, তাহলে মীনাক্ষীর মতো তারও আগে পা বাড়াতে ভয় হবে। তার মনের ইচ্ছে আগে অন্য কেউ পথ তৈরি করুক, তখন সে-পথে পা দেবো আমি।

গোলু

—রাম রাম বাবুজী।

—রাম রাম গোলু। আমি জবাব দিলাম। মধুপুরীতে গোলুর শ্রেণীভুক্ত লোকেরা নিজেদের মধ্যে পরস্পরকে রাম রাম বলেই সম্বোধন করে থাকে, নইলে অপেক্ষাকৃত উচ্চশ্রেণীর লোকজনকে তারা সম্বোধন করে শেঠজী বলে। কিন্তু গোলু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রাম রাম বলে। এটাকে বার্ধক্যেরই দোষ বলা যেতে পারে। যদিও গোলুর বয়স পঞ্চাশ ছাড়ায়নি, তবু তাকে দেখায় ঠিক বৃদ্ধের মতো। শীতকাল। শৈলবিহারীরা অক্টোবরের দ্বিতীয় সীজনটাও শেষ করে বাড়ি চলে গেছে। প্রথম সীজনের এক-ষষ্ঠাংশেরও কম লোক আসে দ্বিতীয় সীজনে। কিন্তু তবুও তারই ফলে নিবন্ত প্রদীপের শিখার মতো মধুপুরীতে আর একবার জীবনের চাঞ্চল্য ফিরে আসে —শ্রমিকেরা কাজ পায়, বেনে-দোকানীদের জিনিসপত্র কিছু কিছু বেচা-কেনা হয়। কিন্তু নভেম্বরের মাঝামাঝি হতে না হতে এখানে শুধু তারাই পড়ে থাকে, যাদের ঠাঁই-ঠিকানা নেই আর কোথাও। আমিও তাদের মধ্যে একজন। আর গোলুও। সম্ভবত সেজন্যেই আমাদের দু'জনের মধ্যে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। সেদিন সে সন্ধ্যের পর ঘণ্টা খানেক ধরে সড়কের ধারে শুকনো কাঠ-কুটো জড়ো করছিল। চাঁদনি রাত, কিন্তু গাছপালার ছায়া পড়েছে সেখানে। আঙুলের মতো পাতলা ছোট ছোট পাঁচ-ছ'খানা কাঠ কুড়িয়ে আলোর খুঁটির কাছে রেখেছে। দিনে বেশ সহজেই ভালো ভালো কাঠ পাওয়া যায়, কিন্তু তার কাছে দিনটা শুধু কাজকর্মের জন্যেই। যখন কাজকর্ম থাকে না, তখন দিনের বেলাতে কাঠ-কুটো যোগাড় করে নেয় সে। মধুপুরীর ঘন বসতির আশপাশে জঙ্গল খুব কমই অবশিষ্ট আছে, সেখান থেকে কাঠ-কুটো যোগাড় করা সহজ নয়। তাছাড়া, গোলুকে তো এই বিনোদন-নগরীর এক পাড়া থেকে আরেক পাড়া রোজ কম-সে-কম দু'বার চক্কর দিতে হয়। শীতকালে যদি দু'চক্কর দেওয়ার মতো কাজ জুটে যায়, তাহলে তো নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করে সে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দোকানদারেদের মালপত্র বয়। অন্য কুলি যেখানে এক টাকা নেয়, গোলু সেখানে বারো আনাতেই রাজী। তাই মাল বওয়ার থাকলে দোকানদারেরা সর্বাগ্রে তাকেই ডাকে। মধুপুরীতে আমাদের পাড়ায় গোলুকে প্রায়ই দেখা যায়। এখানকার দোকানদাররা শৈলবিহারীদের ওপর কম নির্ভর করে, বেশি নির্ভর করে আশপাশের পাহাড়ী

গ্রামগুলোর ওপর। তাই তাদের কাজ-কারবার বারোমাসই কিছু-না-কিছু চলে। আর গোলু তাদের বাঁধা মুটে।

গোলু যদিও দিনের বেলা এদিকটায় বরাবর যাওয়া-আসা করে, কিন্তু সে থাকে এখান থেকে মাইল দু'য়েক দূরে মধুপুরীর কেন্দ্রস্থলে, নিজস্ব লোকজনের সঙ্গে। তার জাত-ভাইয়েরাও তার মতোই খাটা-খাটনি করে। গোলুর চোখ দুটো একবার সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, ডাক্তার অপারেশন করে খানিকটা ঠিক করে দিয়েছেন। তবুও তাকে বেশ পুরু কাচের চশমা পরতে হয়। কাঠ-কুটো জড়ো করার সময়েও তার চোখে সেই চশমা রয়েছে। খুব হাড় জিরজিরে চেহারা, হাড়ের ওপর মাংস নেই বললেই চলে। ভর দেওয়ার জন্যে তার হাতে একটা মোটা লাঠি থাকে সব সময়। সে যে মোট বয়, তা বোধ হয় এক মণের চেয়ে কম হয় না কখনও। কম হলে, হয় দোকানদার তাকে অর্ধেক মজুরি দেয়, নইলে তাকে দিয়ে আদৌ বওয়ায় না। তার ফরসা চেহারা এখন তামাটে হয়ে গেছে। মাঝারি গড়ন তার, পাহাড়ী এলাকায় সাধারণত যেমন হয়ে থাকে। নিজের এই শরীর সম্বল করে পিঠে এক মণ বোঝা নিয়ে সে যে জোরে হাঁটতে পারে না, সেটা স্বাভাবিক। দু'মাইল যাওয়া দু'মাইল আসা, এটা তো তাকে আকছার করতেই হয়, কখনো কখনো এদিক থেকে মধুপুরীর শেষ বাজারের শেষ প্রান্তেও বোঝা নিয়ে যেতে হয়। তখন চার মাইল আসা চার মাইল হাঁটার দরকার পড়ে। আট মাইলের কমে সম্ভবত খুব কমই তাকে যাওয়া-আসা করতে হয়। আবার মাঝে মধ্যে এমন মালও জুটে যায় যে বারো মাইল বা তার চেয়েও বেশি পাড়ি দিতে হয়। সে মাপা-জোখা চালে হাঁটে, তাকে মন্দগতি বলা যায় না। তার জিরিয়ে নেওয়ার কিছু কিছু বাঁধা জায়গা আছে। বস্তুত তার হাঁটা ও বসা দেখে মালুম হবে না যে একটা লোক কোথাও যাচ্ছে। যন্ত্রের মতো কাজকর্ম তার। রাস্তায় কোনো জানা-শোনা লোক দেখলেই রাম রাম জানিয়ে দেয়, আর নয় তো পা দিয়ে রাস্তা মাপে, জিরিয়ে নেওয়ার জায়গা এলে একটু বসে দম নিয়ে নেয়—ব্যস, শুধু এরই পুনরাবৃত্তি। গোলুকে দেখে ভারবাহী পশুর কথা মনে পড়ে। তফাত কেবল এইটুকুই, পশু নিজের ইচ্ছেয় এ রকম কিছু করতে পারে না, গোলু সবকিছু করে নিজের ইচ্ছেতেই। তাকে বেঁচে থাকতে হবে, আর বেঁচে থাকার জন্যে খাবার দরকার। সাড়ে ছ'হাজার ফুট উচ্চতায় মধুপুরীতে শীতকালে তুষারপাত হয়। তা শীত হোক গ্রীষ্ম হোক, বসন্ত কিংবা বর্ষাই হোক, গোলুর কাছে সব সমান। গা-গতর ঢাকার যথেষ্ট কাপড় না থাকলে এখানে মানুষ এক দিনেই টেঁসে যায়। শীত ঠেকাবার জন্যে গোলু কিরকম কাপড় পরে, পাঠক নিজেই হয়ত তা জানেন। পুরনো কাপড়ের ফেরীওয়ালার কাছ থেকে কয়েক বছর আগে সে পুরনো পশমের কোট আর পায়জামা কিনেছিল, বছরে বছরে তাতে যথেষ্ট তালি লাগানো হয়েছে। কাচার জন্যে গোলু তা ধোপাকে দেবে, সে-সম্ভাবনা নেই। সে নিজেও কখনও

তা জলে চুবিয়েছে কি-না সন্দেহ। পায়ে পরার জন্য মোটরের টায়ারের এক জোড়া জুতোও সে ফেরীওয়ালার কাছ থেকে কিনেছে। মাথায় একটা গোল টুপি অবশ্যই থাকে, তবে সেটা টেকো মাথার চাঁদি ঢাকার কাজে হয়ত এক-আধটু লাগতে পারে —কিন্তু গোলু টেকো-মাথা নয়।

গোলু কেন এভাবে সারাদিন পশুর মতো জীবন কাটায়? খচ্চরও হয়ত দিনে এক নাগাড়ে অতো ঘণ্টা কাজ করতে চাইবে না। এ-কাজ সে যুবা বয়স থেকেই করে আসছে। আগে সম্ভবত অন্য দিকেও আকর্ষণ ছিল, এখন আর নেই। পাহাড়ের লোকেরা প্রচণ্ড খাটা-খাটনিতে নাজেহাল হয়ে যায়, আর তাই সস্তা মদে গলা ভিজিয়ে দুঃখ-গ্লানি ভুলবার চেষ্টা করে। আমি কিন্তু কখনও গোলুকে মদ খাওয়া অবস্থায় দেখিনি। মধুপুরীর এ মহল্লায় মদ খুব সস্তায় বিক্রী হয়। সে-মদ আইনসম্মত নয়। আশপাশের এলাকায় পাহাড়ী আদিবাসীরা বাস করে, অনাদি কাল থেকে তারা ঘরে ঘরে চাল ইত্যাদি পচিয়ে মদ তৈরি করে আসছে। সম্ভবত সরকার তাদের এ-হক ছিনিয়ে নিতে চায় না। আর ছিনিয়ে নিতে চাইলেও যে পারবে, সে-আশা কম। কারণ ওদের শতকরা একশো জনই তাদের এই সনাতন হক ছেড়ে দিতে প্রস্তুত নয়। সস্তা মদ যারা খেতে চায়, তারা ঐ সব পাড়ায় গিয়ে হাজির হয়। আর যাদের ষাট টাকা বোতল খাওয়ার ইচ্ছে, তাদের জন্যে শীতকালে দোকানপাট কমে গেলেও শহরের কেন্দ্রস্থলে বরাবর দোকান খোলা থাকে।

গোলুর এই জীবন কবে শেষ হবে, কেউ বলতে পারে না। তুষারপাতের রাতে ঠাণ্ডা লেগে নিশ্চয়ই তার বুক ব্যথা করে, কিন্তু সে-ব্যথা গ্রাহ্য করলে সে তার জীবন-তরী বাইবে কি করে? গোলুকে দেখে শৈলবিহারীদের মধ্যে বোধ হয় একজনের মনেও এ-প্রশ্নটি জাগবে না যে লোকটা মানুষ হওয়া সত্ত্বেও তাকে এ রকম জীবন কাটাতে হচ্ছে কেন? যারা তাকে জানে, তাদের মধ্যে খুব কম লোকের মনেই এ-প্রশ্ন জাগে, যাকে করুণার ঈষৎ রূপ বলা যেতে পারে। সম্ভবত গোলুর মতো কত জনকেই তো তারা প্রতিদিন দেখছে! কিন্তু কথাটা ভুল। মধুপুরীতে গোলুর মতো জীবন কাটাতে আমি কাউকে দেখিনি। অন্য কেউ যদি তার মতো থেকেও থাকে, তাহলে পৃথিবীতে নিশ্চয়ই সে একা নয়, তার স্ত্রী-পুত্র কন্যা আছে, কিংবা তাকে সাহায্য করার অন্য কোনো লোক অবশ্যই রয়েছে।

দুই

তখন বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিক। ঐ সময় ভারতের বহু অংশের জনসংখ্যা বর্তমান জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশও ছিল না, অর্থাৎ খাওয়ার লোক এক-তৃতীয়াংশ কম ছিল। আজকালকার বৃদ্ধদের কথা যদি বিশ্বাস করতে হয়, তাহলে সত্যযুগ

তখনও পৃথিবীর বুক থেকে পুরোপুরি উঠে যায়নি। এটা তো ঠিক, সে-সময় কেদারখণ্ডের পাহাড়ী লোকেরা চুরি করতে জানত না, মিথ্যে কথা বলতে শেখেনি। বেড়াতে আসা লোকেরা ওদের সরলতা দেখে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হতো। তখনকার বৃদ্ধেরা তাঁদের সত্যযুগকে নিজেদের শৈশবকালে টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতেন। বলতেন, টাকায় কুড়ি সের গম ছিল, দেড় সের ঘি ছিল, এখনকার মতো খাওয়া-পরার জন্যে এত ভাবতে হতো না। তা তখন টাকায় এক মণ দু'মণ করেই গম বিক্রী হোক না কেন, যেখানে বছরে মাত্র কয়েক মাসই লোকের কাজ জুটত, সেখানে খাবার জিনিসপত্র সস্তা হলেও তাদের পক্ষে কেনা সম্ভব হতো কি করে? যাই হোক, ঠিক এই সময়েই কেদারখণ্ডের এক উঁচু পাহাড়ী গাঁয়ে গোলুর জন্ম। বাপ বয়সের দিক দিয়ে যুবক ছিল, তার প্রথম স্ত্রীও ছিল যুবতী, আর গোলু সম্ভবত তাদের প্রথম সন্তান। প্রথম না হলেও মায়ের জীবিত সন্তান বলতে সে-ই একা। ভারতের অন্যান্য রাজ্যের মতোই এখানেও প্রত্যেকটি ছেলে-মেয়ে বেঁচে থাকার জন্যে জন্মায় না। অনিশ্চিত জীবন তাদের। কেউ জন্মানোর সঙ্গে সঙ্গেই মরে, কেউ বা কয়েক মাস অথবা কয়েক বছর পরে কৈশোরেই ফুটতে না ফুটতেই ঝরে যায়। অর্ধেকও পূর্ণ যৌবনে পৌঁছয় না। অর্ধ শতাব্দী অতিক্রম করার মতো লোক তো অতি বিরল। কিন্তু একটি শিশুর জন্ম, তা সে প্রাসাদেই হোক কিংবা কুঁড়েঘরে, মা-বাপের হৃদয় অবশ্যই আনন্দে নেচে ওঠে। গোলুর বাপ একা, না তার আর কোনো ভাই ছিল, সেটা বলা দুষ্কর। যদি কোনো ভাই থেকে থাকে, তবে সে নিশ্চয়ই পৃথক ছিল। গোলুর বাপের কুঁড়েঘর ছিল না, পাথরের দেওয়াল আর অনেকগুলো কাঠ পেতে ছাদ দেওয়া একটা ছোট্ট বাড়ি ছিল। একতলা বাড়ি থেকে সেটা বেশি উঁচু নয়, কেননা, হাজার হাজার বছরের অভিজ্ঞতায় মানুষ শিখে ফেলেছে, কিরকম আব-হাওয়ায় কিরকম বাড়ি তৈরি করতে হবে। গাঁয়ে কখনো কখনো বরফও পড়ে, না পড়লেও শীতকালে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা হয়, সেজন্যে সেখানে প্রচুর হাওয়া-বাতাস খেলে এ রকম উঁচু বাড়ি এবং ঘরে জানালা লাগানো পছন্দ করে না কেউ। গোলুর বাপের বাড়িতে সাধারণ রেওয়াজ অনুযায়ী নিচের তলাটা ছিল গরু-ছাগলের জন্যে, ওপরের তলাটা মানুষের জন্যে। দু'তলাতেই দুটি করে ঘর ছিল, সেগুলোর দৈর্ঘ্য-প্রস্থ এমন যে মানুষ পা মেলে শুলে দেওয়ালে মাথা ও পায়ের ছোঁয়া লাগত।

যদি গোলুর বাপের বাড়িটি নিচে নদীর ধারে হতো তাহলে বাড়ির কাছেই ধানের ক্ষেত থাকত। কিন্তু এখানে উঁচু জায়গায় গাঁয়ের কাছে যেসব জমি সেগুলো বিশেষ সুবিধের নয়। অর্থাৎ পাথরের চাঙড় দিয়ে নিচের দিকে উঁচু আল বেঁধে জমিতে মাটি ভরে সমতল করা হয়। এগুলোকে ক্ষেত না বলে বেশ চওড়া সিঁড়ি বলা যেতে পারে। কিন্তু, এই সিঁড়ি খুব অল্পই ছিল গোলুর বাপের। গাঁয়ের ওপরের দিকটায় খিল জমি ছিল —অর্থাৎ জঙ্গল কেটে জমি সাফ-সুতরো

করা হয়েছিল, আল দেওয়া হয়নি। বর্ষায় রামভরসা সেখানে একটু খোঁড়াখুঁড়ি করে বীজ ছড়িয়ে দিত, আর কপালে যেটুকু থাকার কথা, সেটুকু পেত। এই রকমই কিছু জমি ছিল গোলুর বাপের। শৈশব সকলের কাছেই বড় মধুর। তার মানে এই নয় যে, সে-সময়ে প্রত্যেকটি শিশুই খাওয়া-পরার ব্যাপারে নিশ্চিত থাকে। বাপ-মা নিজে না খেয়ে ছেলেপিলেকে সুখে রাখতে চায়। শৈশবের নিশ্চিন্ততা বস্তুত শিশুর মনের ভেতরেই গড়ে ওঠে। তারপর যেমন যেমন বুদ্ধি বাড়ে, তেমনি তেমনি তার চারপাশের পরিস্থিতি তাকে বাস্তবতা উপলব্ধি করতে শেখায়। গোলু আর পাঁচটা গরিব শিশুর মতোই শৈশব থেকে কৈশোরে পা দিলো। ছাগলের মতো দুধ দেয়, এমন দু-তিনটি গরু ছিল তাদের বাড়িতে। দু-তিনটি ছাগলও। বলদ রাখার মতো জোত-জমি ছিল না, সেজন্য লোকের কাছে চেয়ে-চিন্তে কাজ হাসিল করে নেওয়াটাই পছন্দ ছিল গোলুর বাপের, নাহলে স্বামী-স্ত্রী দু'জনে মিলে পাহাড়ী এলাকার ছোট ছোট কোদাল দিয়েই চাষাবাদ সেরে নিতো। কোমরে কপনি জড়াবার বয়স হয়নি, তখন থেকেই গোলু ছাগল গরু চরাতে যেত জঙ্গলে। ছাগল-গরু চরানোর চেয়েও বেশি ঝোঁক ছিল খেলা-ধুলোর দিকে। গাঁয়ের আর পাঁচটা ছেলের মতোই সে-ও গাঁ ছাড়িয়ে অনেক ওপরে তখনও এক-আধটু টিকে থাকা জঙ্গলে চলে যেত। সঙ্গে নিয়ে যেত ভাজা গম বা রুটি। ছাগল-গরুর সঙ্গেই সন্ধ্যেবেলা বাড়ি ফিরত। নদী বেশ দূরে। গোলুদের গাঁয়ে বারোমাসই কিছু-না-কিছু ঠাণ্ডা থাকেই। লোকে ঝরনার জল খেত, জল বরাবরই ঠাণ্ডা। কিন্তু নাওয়াটাকে সেখানে বাবুগিরি বলে মনে করা হয়, তাই গোলুও ছোট থেকেই ওসবের ধার ধারেনি। গরিবদের পরার কাপড় চোপড় বলতে মোটা খোসা, আর সেই খোসাও কালে-কস্মিনেও কাচা হয়ে ওঠে না। তাতে কাঁথায় যদি উকুন-ছারপোকায় পাকাপাকি বাসা বাঁধে, তাতে অবাক হওয়ার কি আছে? সব সময় খাই-খাই করে ওগুলো, কাছে পেলেই হলো।

গোলু চোদ্দ-পনেরো বছরের হয়ে উঠল। ওর বাপ-মা যেসব কাজ করে, এখন গোলুও তা করে। কোদালে জমি কোপানো, ফসল দেখাশোনা, জঙ্গল থেকে পিঠে করে কাঠ বয়ে আনা, জমিতে সার দেওয়া, কারোর বাড়ি থেকে পশম কিনে তকলিতে সুতো কাটা, এইসব। আজ গোলুকে দেখে কেউ ভাবতেই পারবে না যে ও এক সময় গানও গাইত। তার গানের সুর অনেক দূরে পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হতো। ছেলে-ছোকরাদের সঙ্গে গানে গানে পাল্লা দিত সে। গোলুর কণ্ঠস্বর খুব মধুর ছিল, তা অবশ্য বলা যায় না। তবে, এমনিতেই পাহাড়ী ছেলে ছোকরাদের গলা একটু মিষ্টিই হয়। গাঁয়ের পাল-পার্বণে নাচতও সে। যদিও সে জাতে রাজপুত, কিন্তু পাহাড়ী গরিব রাজপুতেরা এমন অনেক কিছু করতে সক্ষম, দেশে যার চল নেই।

রাজপুত কেন, ব্রাহ্মণও এখানে বিধবা-বিবাহ করতে পারে। আবার স্ত্রীর পছন্দ

না হলে স্বামীকে ছেড়ে অন্যের ঘর করতে পারে সে, অবশ্য আগেকার স্বামীর বিয়ের খরচপত্র দিতে হবে নতুন স্বামীকে।

ফসলের সময় গোলুদের ঘরে পেট ভরে খাবার জুটত, বাকি সময় আধপেটা খেতে পেলেই নিজেদের সৌভাগ্য মনে করত সবাই। কখনো কখনো এক পক্ষকাল ধরেও এমন দুর্দিন চলত যে তখন খাবার বলতে জঙ্গল থেকে তুলে আনা শাকপাতা, ফলমূলই সম্বল হয়ে দাঁড়াত। কিন্তু বসন্তকালে যখন কায়ফল পেকে টুকটুকে হয়ে ওঠে, তখন শিশু-যুবক সবাই 'কায়ফল পাকৃয়ো' গান গাইতে গাইতে নাচতে শুরু করে। তারা জানেই না যে ঐ বড় বড় গোল গোল আর অল্প একটু শাঁসওয়ালা ফলগুলোতে ভিটামিন আর তামা ঠেসে ভরে দেওয়া আছে, স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই উপকারী জিনিস। তারা শুধু এটুকুই জানে যে পেট ভরতে সময় লাগে বটে, তবু ইচ্ছে করলে কায়ফলের রস খেয়ে পেট ভরানো যায়। নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগ জীবন কাটাতে কাটাতে গোলু তার কৈশোরের শেষ সীমায় এসে উপনীত হলো, চিন্তা-ভাবনা দ্রুত পায়ে এগিয়ে এলো তার দিকে। গোলুর কাছে মা-বাপের ধমক-ধামক চড়-চাপড় তুচ্ছ ব্যাপার। কিন্তু যৌবনে পা দেওয়ার পর এখন আর আগেকার মতো ওসব বরদাস্ত করতে রাজী নয় সে। মা তো কত বছর থেকে, বলতে গেলে কোনোদিনই ওর গায়ে হাত তোলেনি।

তিন

গোলু যখন সতেরো বছরের, তখন তার মা মারা যায়। শেষ সন্তানটি জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই টেঁসে যায়, সেই সঙ্গে মা-কেও জলদি যাওয়ার জন্যে নেমন্তন্ন দিয়ে যায়। বাপ তখনও জোয়ান। ঘরে রান্নাবান্নার কোনো লোক নেই, সেজন্যও তার বিয়ে করা দরকার। তথাপি বিয়ের জন্য খুব একটা তাড়াহুড়ো দেখালো যে তা নয়, কারণ টাকা-পয়সার মামলা। পাহাড়ী এলাকায় সাধারণত বর পছন্দ করে বিয়ে হবে, এমন কেউ আশা করে না, বরং টাকা দিয়ে মেয়ে কিনতে হয়। গোলুর মা-কে কেনার জন্যও ওর বাপের সবচেয়ে ভালো জমিখানা বিক্রী হয়ে গিয়েছিল। আপাতত বিয়ের ভাবনাটা মুলতবি রাখার সেটাও একটা কারণ। রীতিমতো লড়াইয়ের জীবন তার, অবশ্য ছেলে রোজগারের উপযুক্ত হয়ে উঠেছে। কেদার-বদরী যাত্রার কয়েক মাস পাহাড়ী লোকেরা পিঠে করে তীর্থযাত্রীদের কিংবা তাদের মালপত্র বওয়ার কাজ করে। কিন্তু আশপাশের সমস্ত গাঁয়ের লোকই একাজে নেমে পড়ে, তাই দরকারের চেয়ে লোকের সংখ্যা বেশি হয়, ফলে মজুরি কমে যায়। তাছাড়া তীর্থযাত্রীদের সবাই খুব বড়লোকের বাড়ি থেকে আসে না, তাই অনেকেই খরচের ব্যাপারে বেশ কার্পণ্য দেখায়। মধুপুরীর মতো শৈলাবাসে কুলি-মজুরের কাজ যথেষ্ট পাওয়া যায়, গোলুদের গাঁয়ের দু-তিনজন ইতিপূর্বেই

মধুপুরী এসেছিল খাটতে। গোলুও ভাগ্যপরীক্ষা করতে চাইল। বাপ খুব খুশি হয়ে একদিন তাকে বিদায় দিলো। সেদিন থেকে শুরু হলো তার এই জীবন, আজও একইভাবে তা চলে আসছে। মধুপুরীতে আসার পর তার মালুম হলো, যেসব কথা সে এতদিন শুনে এসেছে, সবটা সেই রকমই নয়। এদিকের পাহাড়ী লোক আর নেপালের পাহাড়ী লোক —এই উভয়ের মধ্যে প্রতিযোগিতা রয়েছে। নেপালীরা দ্বিগুণ বোঝা বইতে পারে, সেজন্যে তাদের অপেক্ষাকৃত কম মজুরি নিলেও পোষায়। কিন্তু আজ থেকে তিরিশ বছর আগে গোলু যখন প্রথম মধুপুরীতে এসেছিল, তখন মোট বওয়ার কাজে নেপালীদের আজকালকার মতো এ রকম একাধিপত্য কায়েম হয়নি।

মধুপুরীতে এসে কিছুদিন তাকে বসে বসে কাটাতে হয়, ঘর থেকে বেঁধে আনা আটার রুটি খায় নুন মাখিয়ে। তারপর মোট বওয়ার কিছু কিছু কাজ জোটে। অবশেষে রিকশার ঘোড়া হতে হলো তাকে। বাঁধা মজুরি বলে রিকশা-টানা এদিকের পাহাড়ী লোকের কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে, যেমন মোট বওয়া নেপালীদের কাজ। ছ'জন লোক মিলে একখানা রিকশা ভাড়ায় নিলো তারা, সেটা নিয়ে রিকশা-স্ট্যাণ্ডে যাত্রীদের প্রতীক্ষা করে।

তখনও মোটর গাড়ি খুব কম চোখে পড়ত। সে-সময় মধুপুরী বেড়াতে আসা লোক সাধারণ লোকের পর্যায়ে পড়ত না —ইংরেজ সাহেবদের পরেই একটা বড় সংখ্যা ছিল রাজা-নবাবের, তারপর স্থান ছিল বড় বড় ভারতীয় অফিসারদের। ঠিক ঐ জন্যেই মধুপুরী পাহাড়ের নিচে যথেষ্ট গাড়ি দেখা যেত। মধুপুরী পর্যন্ত মোটরের রাস্তা তৈরি হতে তখনও বছর দশেক দেরী ছিল, নইলে তাঁরা গাড়ি নিয়ে এখানেই এসে হাজির হতেন। এরই ফলস্বরূপ, নিচে থেকে ওপরে বয়ে আনার জন্যে রিকশাওয়ালাদের সওয়ারী জুটত। রিকশাওয়ালারা প্রথমে চেষ্টা করত যাতে ইংরেজ যাত্রী পাওয়া যায়। তারা না চাইতেই খুশি হয়ে ভালো মজুরি দিয়ে দিত। রাজা-মহারাজাদের ভৃত্যরা মজুরি থেকে একটা অংশ নিজেদের জন্যে কেটে রাখার চেষ্টা করত, তবুও অন্যান্যদের চেয়ে তাঁদের পছন্দ করত রিকশাওয়ালারা। বাবু ব্যবসায়ীদের সওয়ারী পাওয়াটা তাদের কাছে কপাল মন্দ হওয়ার সামিল। পাহাড়ে, তা সে মোট বওয়াই হোক কিংবা রিকশা-টানা, চড়াই ভাঙতে মানুষের প্রাণ বেরিয়ে যায়। কিন্তু যে রিকশায় চড়ে যায়, সে ওটাকে খেলা ভাবে, আবার অনেকে তো প্রায় মুফতে যেতে পারলে খুশি হয়। আজকালও সচরাচর দেখা যায়, লোকে ভাড়া ঠিক-ঠাক না করেই রিকশায় উঠে বসে যায় —ভাবখানা এই রকম, যেন ভাড়া ঠিক করার দরকারই নেই, কারণ সব জায়গার ভাড়াই শহরের কর্তৃপক্ষ বেঁধে দিয়েছে। গন্তব্যস্থলে পৌঁছে রিকশাওয়ালা দর অনুযায়ী ভাড়া চায়, তাতে তাকে দাঁত-মুখ খিঁচুনি খেতে হয়, আবার বাজে লোক হলে গালি-গালাজ দিতেও কুণ্ঠিত হয় না। সেজন্য তারা কখনও টুঁ শব্দটিও করে না, যাকে অনেকে

তাদের নিরীহ স্বভাব বলে থাকে, কিন্তু সেটাকে তাদের নিতান্ত ভদ্রতাই বলা যেতে পারে।

প্রথম সীজনেই গোলু রিকশাওয়ালা হয়ে গেলো —রিকশার মালিক নয়, বরং বলা যায়, রিকশা-টানা ঘোড়া। পয়সা পায়, কিন্তু খরচ করার সময় তাকে বরাবর খেয়াল রাখতে হয়, সীজনের পর বাড়ি ফিরতে হবে, কিছু টাকা-পয়সা সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। সেজন্যে খাওয়া-দাওয়া খুব সংক্ষেপে চালায়। মধুপুরীর প্রথম সীজনটাই (মে-জুন) প্রধান, তার অর্ধেকটাই তাকে প্রায় বেকার অবস্থায় কাটাতে হয়েছে। বর্ষার দিনে কখনো যাত্রী পায়, কখনো পায় না। নভেম্বরের শুরুতে যখন গোলু তার অন্যান্য সঙ্গী-সাথীদের মতো গাঁয়ের পথ ধরল, তখন সে দেখল, চল্লিশ টাকা জমাতে পেরেছে সে। এছাড়া নিজের জন্যে আর তার বাপের জন্যে কিছু কাপড়-চোপড়ও কিনেছে। খাটিয়ে ছেলে গরিব বাপ পছন্দই করে। বাপ তাকে বড় আদর-অপ্যায়ন করল। শীতকাল কাটিয়ে সে ফের মধুপুরী আসবে বলে ঠিক করল। বাপ যখন বলল যে শুধু ঘর-গেরস্থালি দেখাশোনা করার জন্যেই নয়, চাষবাসের কাজে এক-আধটু সাহায্য করার জন্যেও ঘরে মেয়েছেলের দরকার, তখন বাপের কথায় সম্মতি জানালে গোলু। সে ভাবল সম্ভবত বিয়ের ব্যাপারেই কথাবার্তা চলছে। কথাটা তার মনে ধরবে না কেন? বাপের কথায় রাজী হয়ে সে মধুপুরী এলো। পরের বছর পুরো একশো টাকা জমিয়ে বাড়ি ফিরল সে। খুব খুশি, হাতে শুধু এতগুলো টাকা দেখেই নয়, খুব তাড়াতাড়ি তার বিয়ে হয়ে যাবে এই ভেবে।

চার

বিয়ে হলো। কিন্তু গোলুর নয়, তার বাপের। সৎমা রোজগেরে গোলুর সঙ্গে মন-কষাকষি চায় না, আর বাপও তাই। কিন্তু গোলু মুখ ভার করে থাকে। বাপের ভয় হলো, ছেলে আবার বেহাত না হয়ে যায়, তাই সে ছেলের বিয়ের কথাবার্তা চালাতে শুরু করল। মধুপুরীতে পুরো দশ সীজন কাটানোর পর গোলুরও বিয়ে হয়ে গেলো। অনেক আগেই তার বিয়ে হয়ে যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু বাপের অতো তাড়াহুড়ো ছিল না, সাদাসিধে গোলুকে আশায় আশায় রাখাটা ভালো বলে ভেবেছিল সে। গোলু বলদের মতো খেটে একটি একটি করে পয়সা কামিয়ে বাড়ি নিয়ে যেত, আর বাপ তা উড়িয়ে দেওয়ার জন্যেই বসে থাকত। সে নিজের স্ত্রীর জন্যে গয়না গড়ালো, বৌমাকেও ঐ রকমই কিছু চাঁদির গয়না গড়িয়ে দিলো, মেয়ের বাপকেও দিতে হলো কিছু। তার চেয়েও বেশি খাওয়া-দাওয়াতে ওড়ালো। শুধু তাই নয়, বিয়ের অজুহাতে গোলুর মাথায় হাজার টাকার দেনাও চাপিয়ে দিলো। সব পাহাড়ী মজুরের মতোই গোলুও তার বউকে মধুপুরীতে

আনতে চাইল না। ইংরেজ আমলে শৈলবিহারীরা যেখানে একটু অন্যভাবে, আনন্দে-হাসিতে সময় কাটাতে মধুপুরী আসে, সেখানে এই মধুপুরীতেই কয়েক শো গোরা সৈন্য থাকে, আর তার ফলে দিন-দুপুরেই মেয়েদের ইজ্জত নষ্ট হয়। এমন অবস্থায় কোন মজুর তার বউকে সঙ্গে করে নিয়ে আসতে চাইবে?

গোলুর দুটি সৎ-ভাই হয়েছে, তারাও বড় হচ্ছে। বাড়ির লোকজনের ভরণ পোষণের দায়ভার সবচেয়ে বেশি গোলুর ওপর। তবে হ্যাঁ, ঘরে দুটি স্ত্রীলোক হওয়ার ফলে চাষবাসের কাজ একটু তাড়াতাড়িই সমাধা হচ্ছে। ছাগলও বেড়েছে, গরুও পাঁচটায় এসে দাঁড়িয়েছে। ঐ ঘরে আর বেশি গরু-ছাগল পোষা সম্ভব নয়, নইলে আরও বাড়ানো যেত। যদি ধার-দেনা না থাকত, তাহলে এতেই সচ্ছলভাবে সংসার চলে যেত, সন্দেহ নেই। কিন্তু মহাজনের সুদ বাড়ছে, ধার-দেনার চিন্তাটা বাপের চেয়ে গোলুরই বেশি। সমস্ত জমিজমাই যদি বিক্রী হয়ে যায়, তাহলে সীজনের পর সে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? গোলু সেই আগেকার মতোই প্রতি বছর মধুপুরী আসে, পুরনো হওয়ার ফলে নিজেদের রিকশার ছ'জন মজুরের সে-ই সর্দার। ওকে জিজ্ঞেস করুন, ও বলবে, বরাতের জোর, কিন্তু বস্তুত সেটা তার চটপটে আর মিশুকে স্বভাবের জন্যেই, আর ঐ কারণেই তার রিকশার খদ্দের সবচেয়ে বেশি, বছরে বছরে সে বেশি পয়সা জমিয়ে বাড়ি ফেরে। সমস্ত ধার দেনা মিটিয়ে ফেলতে চাইলে এত সময় লাগবে না, কিন্তু বাপ-মায়ের নানা ফর-মায়েশ তাকে পূরণ করতে হয়, বউয়ের জন্যে দু-একখানা কাপড় নিয়ে যেতে হয়, সেই সঙ্গে বাপ ওদিকে এখান-ওখান থেকে দেদার ধার-কর্জ করে টাকা ওড়ায়। সমস্ত ধার শোধ করতে করতে মহাযুদ্ধ শেষ হয়ে এলো, ঠিক এই সময় বাপও চোখ বুজল।

গোলু এখন তার ঘরের মোড়ল, খাওয়ার নয়, রোজগারের। সেজন্যে ঘরে তার কথাই বেশি খাটে। সে যে-বয়েসে প্রথম মধুপুরী এসেছিল, তার সৎ-ভাই দুটি এখন সেই বয়েসে এসে পৌঁছেছে। গোলু সুদিনের প্রত্যাশা করতে লাগল মনে মনে। রিকশা-টানার অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে তার বুকে আর ফুসফুসে দোষ দাঁড়িয়েছিল। আর এ রকম খাটা-খাটুনির জন্যে যৌবনেও তার গায়ে-গতরে বিশেষ মাস লাগেনি। চোখে কম দেখতে শুরু করল সে, কিন্তু চোখের দৃষ্টিশক্তি একেবারে চলে যাবে, সে-ভয় করেনি। লড়াইয়ের পর দু-তিন বছর পর্যন্ত সে কোনোরকমে মধুপুরী আসতে থাকল, তারপর চোখের দৃষ্টি প্রায় একেবারেই নষ্ট হলো, গাঁয়ে বসে থাকতে বাধ্য হলো সে। কিন্তু বসে বসে খাওয়া নিষ্কর্মা লোকের বোঝা গরিবের সংসারে কতদিন কে সহ্য করবে? ঘরে তার মান-সম্মান কমতে লাগল, তারপর তাকে অবহেলা করতে লাগল সবাই, অবশেষে চারদিক থেকে কথা শোনানো শুরু হলো তাকে। গোলু তাতে অভ্যস্ত নয়।

যখন সে খবর পেলো মধুপুরীতে প্রতি বছর একজন চোখের ডাক্তার আসেন,

তখন সে গাঁয়ের একটা লোককে, যে-মধুপুরী আসা-যাওয়া করে, তাকে খুব কাকুতি মিনতি করে ধরল সঙ্গে নিয়ে আসার জন্য। লোকে বোঝালো, চোখের রোশনি একবার চলে গেলে আর ফিরে আসে না। কিন্তু মানুষ তো জন্মগত আশাবাদী। সে পরের বছরই একজনের হাত ধরে, হাতে লাঠি নিয়ে, দুর্গম কঠিন পাহাড়ী রাস্তা পেরিয়ে মধুপুরীতে এসে হাজির হলো। ডাক্তার বললেন, এখন একটা চোখ অপারেশন করা যেতে পারে, অন্যটা এখনও অপারেশন করার উপযুক্ত হয়নি। গোলু খুব খুশি হলো। একটা চোখেও যদি দেখতে পায়, তাহলে সে তার জীবনতরীটাকে ঘূর্ণাবর্ত থেকে বের করে নিয়ে যেতে সক্ষম হবে। অপারেশন হলো, চোখে পটি বেঁধে দেওয়া হলো, তিন হপ্তা দেখে ডাক্তার তার চোখে একটা খুব পুরু কাঁচের চশমা পরিয়ে দিলেন। ডাক্তার তাকে আরও কিছুদিন বিশ্রাম নিতে বলেছিলেন, কিন্তু গোলু এক হপ্তা পরেই চোখে চশমা পরে কাজকর্ম শুরু করে দিলো। এটা তো সত্য, বেঁচে থাকতে হলে খাবারের ব্যবস্থা করতেই হয়। অন্য ধরনের মজুরের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করতে হবে তাকে। আস্তে আস্তে হেঁটে রিকশা টানা চলে না। যদিও ঐ ভাবে রিকশা টানলে পিঠে চাবুক পড়বে না ঠিক, কিন্তু কথার চাবুক তার চেয়েও দুঃসহ। তাছাড়া, তাড়াতাড়ি খেপ পৌঁছে দিয়ে অন্য যাত্রী ধরার তাড়াটাও বেশি থাকে। গোলুর মতো সঙ্গী রিকশাওয়ালাদের কে আর পছন্দ করবে?

গোলুকে এখন রিকশা ছেড়ে মোট বওয়ার কাজে নামতে হলো। ওর স্বভাব চরিত্র সম্বন্ধে পরিচিত হতে দেরী হলো না লোকের। মালপত্রও জুটতে লাগল। দু'বছর পর গোলু অন্য চোখটাও অপারেশন করিয়ে নিলো, কিন্তু সেটাতে আগের চেয়ে বেশি দৃষ্টিশক্তি ফিরে এলো না। রিকশা টানার কাজে ফিরে যাওয়া চির-কালের জন্যেই বন্ধ হয়ে গেলো তার। মোটা লাঠি হাতে পিঠে বোঝা নিয়ে সে মধুপুরীর পথে পথে ঘুরে বেড়ায়। প্রথম বছরটা তো সে কষ্টে-সৃষ্টে কোনোরকমে শুধু পেটের খাবারটাই জোটাতে পারল। সে-বছর শীতকালেও সে বাড়ি ফিরে যেতে পারল না। পরের বছর পুরো সীজন কাটিয়ে বাড়ি ফিরল সে। গিয়ে দেখে, তার বউ এখন সৎ-ভাইয়ের হয়ে গেছে। গোলুর দুঃখের সীমা-পরিসীমা রইল না। সে বলদের মতো খেটে হাড়-মাস কালী করে বাপকে টাকা দিয়েছে, বাপের বিয়ে দিয়েছে, সমস্ত ধার-দেনা শোধ করেছে, গোটা পরিবারটিকে পালন করেছে। অথচ সে অন্ধ আর অকালে বুড়ো হয়ে গেছে দেখে বউটা তাকে ছেড়ে ঠাকুরপোর দিকে ঢলে পড়েছে! গোলু বকাবকি করল, কিন্তু শীগ্‌গিরই বুঝতে পারল যে তাতে কোনো ফল নেই। খামোকা ছোট ভাইয়ের হাতে পিটুনি খেয়ে কি লাভ? আগের মতো আর সে কোনোদিন রোজগারপাতি করতে পারবে না, এটা তো জানা কথা। ইংরেজ ভারত ছেড়ে চলে যাওয়ার পর মধুপুরীর অবস্থা দিন কে-দিন পড়ে যাচ্ছে। শরীর-স্বাস্থ্য ভালো থাকলেও আগেকার মতো রোজগার-

পাতি করা সম্ভব হতো না। আগের মতো টাকা কামিয়ে বাড়ি ফিরতে পারলে হয়ত ঘরে খাতির-সম্মান আবার বাড়ত। হয়ত বউটাও আবার তার কাছে ফিরে আসত। কিন্তু আর কখনও মধুপুরীর সেই সুদিনের আশা নেই, গোলুরও নেই।

বড় কষ্টে শীতকালটা গাঁয়ে কাটিয়ে সীজনের সময় সে ফের মধুপুরী চলে এলো —চিরকালের জন্য। এখন তার আর অন্য কোথাও ঠাঁই নেই। কাজকর্ম করতে করতে সে ধীরে ধীরে মধুপুরীতে বারোমাস কাটাবার মতো জায়গা করে নিলো। মজুরি না কমালে তার পক্ষে মোট পাওয়া সম্ভব নয়, তাই সে নিজের মজুরিও কমালো। পুরু কাচের চশমা লাগালে এক-আধটু দেখতে পায় সে, অতএব, তার জীবনের অনিশ্চিত কাল যতদিন না শেষ হয়, ততোদিনের জন্য সে এই নতুন জীবন শুরু করল।

ডাক্তার বলে দিয়েছিলেন, ধোঁয়া থেকে চোখ বাঁচানো দরকার, নইলে চির-কালের মতো চোখের মাথা খেতে হবে। গোলু ভালো করেই জানে, চোখের মতো মূল্যবান আর কিছু নেই, সেজন্য সে ডাক্তারের কথাটা খুব মনে রাখে। যদি তার বউ থাকত, তাহলে সে এ-সময় এখানকার রেওয়াজ অগ্রাহ্য করে তার বউকে মধুপুরীতে এনে রাখত। এখন তাকে রুটির জন্যে অপরের ওপর নির্ভর করতে হয়। গরিব লোক যতই কষ্টে পড়ে, ততোই লোকের ভাব-ভালোবাসা জোটে তার। গোলুর সঙ্গী এক মজুর নিজের সঙ্গে তারও রুটি তৈরি করে দেয়। আটা এবং অন্যান্য জিনিস গোলু তো দেয়ই, সেই সঙ্গে জ্বালানীর কাঠ-কুটো যোগাড় করে আনার কাজের দায়িত্বটাও নিজে হাতে নিয়ে নিয়েছে সে। দিনের বেলা যদি সময় পেয়ে যায়, (তার মানে কিছু মজুরি থেকে বঞ্চিত হওয়া আর কি) —তাহলে সে এ-দিকের জঙ্গল থেকে মোটামোটা শুকনো কাঠ যোগাড় করতে লেগে যায়। সেদিনও জ্বালানী নিয়ে যাওয়ার দরকার ছিল, তাই সন্ধ্যে-বেলা ঘণ্টা খানেক ধরে সড়কের ধারে আঙুলের মতো সরু সরু কাঠ-কুটো যোগাড় করার চেষ্টা করছিল সে।

রূপী

এ রকম জীবন-যাপনের জন্যে তার জন্ম হয়নি। কয়েকবারই সে এই পঙ্কিল জলা-ভূমি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছে। মধুপুরী সওয়া শো বছরের পুরাতন বিনোদন-নগরী। তার আগে লোকে এখানকার ঘন জঙ্গলে পশু চরিয়ে বেড়াত। এখন মধুপুরীর চৌহদ্দির বাইরে ছোট ছোট গাঁয়ে বাস করে তারা। সব ব্যাপারেই তারা অনেক পিছিয়ে আছে, কিন্তু তাদের এই পিছিয়ে থাকাটা সব ক্ষেত্রেই খারাপ নয়। মধুপুরীতে জনবসতি গড়ে ওঠার আগে তারা ছিল এক নম্বরের ইমানদার এবং এখনও অন্যান্যদের চেয়ে বেশি। ওদের মধ্যে ব্যভিচার নেই। তবে হ্যাঁ, একটা পুরনো প্রথা ওদের মধ্যে চলে আসছে, অন্যান্য জায়গায় তা হাজার বছর আগেই উঠে গেছে। অতিথি-সেবা ওদের কাছে পরম ধর্ম। আর অতিথি-সৎকার শুধু পান-ভোজনেই নয়, এমন কি অতিথির পরিচর্যার জন্যে নিজেদের স্ত্রীকেও এগিয়ে দিত ওরা। কিন্তু যখন ওরা বুঝতে পারল যে বাইরে থেকে আসা অতিথিরা এরূপ সেবার অপব্যবহার করে, তখন থেকে ওরা সাবধান হয়ে গেছে। দারিদ্র্য কোথায় নেই! কিন্তু ওদের মধ্যে সচ্ছল অবস্থার লোকের সংখ্যা খুব কম। এখানকার যুবতী মেয়েরা দেখতে-শুনতে বেশ ভালোই, সেটাও ওদের কাছে লোকসানের সওদা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখানে মধুপুরী গড়ে উঠে এখানকার তরুণীদের জীবন নিয়ে খেলা শুরু করেছে।

ওর মা যখন যুবতী ছিল, তখন সে তার পাড়া-পড়শীর মেয়েদের সঙ্গে মধুপুরীর মেলা-উৎসবে আসত। তারপর কি করে যেন এক দেশী সৈনিকের সঙ্গে তার ভাগ্য জড়িয়ে পড়ল। দু'জনেই স্বামী-স্ত্রীর মতো বাস করত। একটি মেয়ে হলো তাদের। রঙে চেহারায় মায়ের চেয়েও বেশি সুন্দরী সে। তার নাম রাখা হলো রূপী। সে ছোটবেলা থেকেই শহরের জীবনের সঙ্গে পরিচিত। বাপ তার মেয়ের জন্যে নানারকম জল্পনা-কল্পনা করত। কিন্তু, বহু বাপের মতো তারও ভাবনা ভাবনাই থেকে গেলো, চার বছরের মেয়েকে রেখে এ-জগৎ ছেড়ে চলে গেলো সে। মা যুবতী। পরিস্থিতির চাপে সে যা-ই করুক না কেন, স্বভাবের দিক দিয়ে খারাপ ছিল না। যুবতী স্ত্রীকে অসহায় অবস্থায় ফেলে রেখে চলে গেলে তার কাছে পৃথিবী খাঁ খাঁ করতে থাকে। সৈনিক স্বামীর শহরেই তাকে রাখার মতো হয়ত কেউ জুটে যেত, কিন্তু হয় সে কাউকে বিশ্বাস করতে

পারেনি, আর না হয় এই স্বচ্ছন্দ পাহাড়ী জীবনটাকেই তার ভালো লেগেছিল। আবার সে মধুপুরী ফিরে এলো, আর এক রোগা পাঁজলা চৌকিদারের সঙ্গে নিজের জীবনের গাঁটছড়া বাঁধল। স্বামীরা দু'ভাই। এখনও এ-অঞ্চলে পাণ্ডব বিবাহের প্রথা চালু আছে, লোকেরা বাইরের লোকের কাছে সেটা চেপে রাখার চেষ্টা করে। ওরা ছোট স্বামীকে দেওর বলে পরিচয় দেয়। জ্যেষ্ঠ মারা গেলে তখন তার নামেই ডাকা হয় দেওরকে।

উচ্ছে আর নিমপাতার ঘণ্ট—গাঁয়ের জীবনকে শহুরে জীবনে পরিবর্তিত করলেও এ আপ্তবাক্য প্রযোজ্য নয়, সেটা ঠিক; কিন্তু পাহাড়ী গাঁয়ের সাদাসিধে জীবনের ওপর যখন শহুরে জীবন তার রঙ ছড়িয়ে দেয়, তখন তা অত্যন্ত বাড়াবাড়ি পর্যায়ে গিয়ে ঠেকে। তা গাঁয়ে থাকার সময় এক-আধটু ইচ্ছে মতো বেচালে চললেও সমাজের বিধি-নিষেধ থাকে মাথার ওপর, জাত গোষ্ঠীর রায় মেনে চলতে হয়। কোনো একটি মেয়ে তার পুরুষকে ছেড়ে অন্য কাউকে বিয়ে করলে সমাজের চোখে তা গর্হিত নয়, সেক্ষেত্রে দ্বিতীয় ব্যক্তিকে শুধু মেয়েটির আগের স্বামীর বিয়ের খরচপত্র বাবদ টাকা পয়সা দিয়ে দিতে হয়। কিন্তু, সেপাইয়ের বউ যখন মধুপুরীর মতো একটা বিনোদন-নগরীতে এসে বসবাস করতে শুরু করল, তখন সেখানকার আকর্ষণ আর প্রলোভন তাকে হাতছানি দিতে লাগল। চৌকিদারের মাইনেটাই বা আর কত? তার ওপর তার আরও তিন-চারটি ছেলেপিলেও হয়েছে। সাত-আট জন লোকের খরচ চালানো কঠিন, তা বাড়িসুদ্ধ লোক সবাই মিলে যতই মেহনত করুক। ওরা পাশের জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে এনে বিক্রী করে। বাড়িতে শাক-সব্জী লাগানোর বেশ খানিকটা জায়গা আছে, কিন্তু জলের বড় অভাব, সেজন্য জায়গাটুকু সদ্ব্যবহার করা যায় না। মধুপুরীতে দুধেরও খুব চাহিদা, আর সব রকম কড়াকড়ি থাকা সত্ত্বেও তাতে জল ঢালা বন্ধ করা সম্ভব হয়নি। কোনো কোনো চৌকিদার গরু পোষে, কিছু ছাগলও রাখে কারণ কসাইরা ছাগলের দাম বেশ ভালোই দেয়। কিন্তু চৌকিদারটি বাড়িতে কখনও ছাগল-গরু পোষেনি। সম্ভবত শহরের উপকণ্ঠে জঙ্গলের মাঝখানে বাড়ি হওয়ার জন্যে নেকড়ের ভয় সব সময়, তাই সে বাড়িতে গরু-ছাগল পোষাটা পছন্দ করে না, কিংবা হয়ত গরু-ছাগল কেনার মতো টাকাকড়িও জোটাতে পারে না। তবে একদিকে শহরের উপকণ্ঠে, আর একদিকে শহরের বাইরের গাঁগুলোর কাছাকাছি থাকার দরুণ তার একটা বিশেষ সুবিধে রয়েছে, গাঁয়ের তৈরি সস্তা মদ নিয়ে এসে দ্বিগুণ দামে এখানকার লোকদের খাওয়ায়। সেকালে আশপাশের গাঁগুলো ব্রিটিশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত ছিল না, দেশীয় রাজ্যের মধ্যেই পড়ত ওগুলো, সেজন্য এই অনুন্নত অঞ্চলে মদ তৈরি করাতে কোনো বাধা-নিষেধ ছিল না। বাধা-নিষেধ এখনও নেই, কারণ আইন-কানুনের কড়াকড়ি করতে চাইলে গাঁ-কে-গাঁ নিয়ে গিয়ে জেলে পুরতে হবে, গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের

ঢেউ এসে পড়বে সামনে, আর তার ফলে হাজার হাজার কয়েদীর ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা সরকারের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু মধুপুরীর কোনো বাড়িতে এসব চালানো সহজ নয়। মাঝে-মধ্যে পুলিশ এসে তল্লাসী চালায়। অবশ্য চৌকিদার খুব হুঁশিয়ার, পুলিশের অনেকের জন্যেই সে সস্তা মদের দানসত্র খুলে রেখেছে চব্বিশ ঘণ্টা। মোট কথা, পরিবারটির জীবিকার এটিই প্রধান-উপায়।

ছেলেপিলেরা সেয়ানা হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে যখন খাওয়া-পরার চাহিদাটাও বাড়তে লাগল, তখন 'বুভুক্ষিতঃ কিং ন করোতি পাপং' কথাটার তাৎপর্য এই পরিবারটির ক্ষেত্রে দেখা দিলো। নিজেদের সামাজিক প্রথা অনুযায়ী স্বজাতির কারোর সঙ্গে বড় মেয়েটির বিয়ে দিলে কিছু টাকা-পয়সা হাতে আসতে পারত, কিন্তু সে টাকা পয়সার পরিমাণটা খুব কম। দু-এক মাসেই শেষ হয়ে যেত। মা'র তো শহরের হাওয়া লেগেছে আগেই। তার দুই স্বামীই শহরের বাসিন্দা হওয়াতে অনেক কিছুই জানত তারা। টাকা-পয়সা নিয়ে মেয়ের বিয়ে দেওয়াও তো পক্ষান্তরে মেয়েকে বিক্রী করা। একবার বিক্রী করলে কম পয়সা, আর রোজ রোজ বিক্রী করলে বেশি পয়সা, অর্থাৎ স্থায়ী আমদানি যদি শুরু হয়, তাহলে তার চেয়ে উত্তম আর কি হতে পারে? মেয়েটি চৌকিদারের নয়, তার ভাইয়েরও নয়। হলেও যে অন্য কিছু ভাবত তারা, সে-সম্ভাবনা কম। সদ্য যৌবনে পা দিয়ে মদ খেতে যারা বাড়িতে আসত, তারা মেয়েটির গায়ে-গতরে হাত তো দিতই। মা মধুবালাও সম্ভবত মেয়ের সে-পথ তৈরি করে দিয়েছিল। কিন্তু এ-বাড়িতে যেমন একচেটিয়া মদের খদ্দের পাওয়া সম্ভব, সেরকম রূপের খদ্দের পাওয়া সম্ভব নয়। মাঝে-মধ্যে কতই-বা আর রোজগার হয়? মা শুধু পরামর্শই দিলো না, বরং একদিন মেয়েকে সঙ্গে করে দেশের এক শহরে গিয়ে হাজির হলো। বেশ্যাবৃত্তি তো বর্তমান নাগরিক সভ্যতার এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, নগরের অস্তিত্ব দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারও অস্তিত্ব দৃষ্টিগোচর হয়ে আসছে। বৃত্তিটা কয়েক প্রকারে চলে। কিছু কিছু বারবণিতা নাচ-গানের পেশাও চালায়, অনেকে ওসব শিল্পকলার ধারও ধারে না, তারা কেবল নিজেদের দেহ দান করে, আবার তার জন্যে প্রকাশ্য বাজারে গিয়েও বসে। আর এক ধরনের বেশ্যাবৃত্তিও রয়েছে। দেহ বিক্রী করা যাদের পেশা এবং যাদের পেশা নয়, এই দুই শ্রেণীর মেয়েরাই এক সঙ্গে জোট বেঁধে কারবার চালায়, তাকে বলে 'চাকলা' (বেশ্যাবাড়ি)। মা যদি একেবারেই চাকলা না চিনত, তাহলে হঠাৎ করে মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে গিয়ে হাজির হয়ে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব হতো না।

অন্য কোনো ভালো উদ্দেশ্য মনে রেখেই তার নামটি রাখা হয়েছিল, কিন্তু আজ সে যে জীবন-যাপন করছে, তাতে নামটা বদলানো ঠিক নয় —যেহেতু রূপকে জীবিকা হিসেবে যারা গ্রহণ করে, আমরা তাদের রূপোপজীবিনী বলি। মা যদি গোড়াতেই তাকে এ-পথের জন্যে তৈরি করে না রাখত, তাহলে প্রথম প্রথম চাকলায় জীবন শুরু করাটা তার পক্ষে অসুবিধেজনক হতো। ঠাণ্ডা পাহাড়ী এলাকার মেয়ে সে, দেশের শহরে চার-পাঁচ মাসের বেশি সেরকম অনুকূল আবহাওয়া থাকে না। প্রথম শীতকালটা ঐভাবেই সে চাকলায় কাটালো। চাকলার দালাল মেয়ে-মানুষটি তার ঘরের দেখাশোনা করে, খদ্দের এনে দেয়, খাবার-দাবার ইত্যাদি দরকারী জিনিসপত্র যোগাড়-যন্ত্র করে দিয়ে সাহায্য করে। সে কি মুফতে করে এসব ? তার জন্যে রূপীকে তার দেহ বিক্রী করা টাকার একটা মোটা অংশ দিতে হয়। তা সত্ত্বেও প্রথম শীতকালে সে নিজের জন্যে কিছু কাপড়-চোপড় আর গয়নাপাতি তৈরি করায়, মা আর ভাইদের জন্যেও কিছু কিছু কেনে, আর নগদ একশো টাকা নিয়ে মধুপুরী ফিরে আসে।

এখন সে গ্রীষ্ম আর বর্ষায় মধুপুরীতে এবং শীত ও বসন্তে দেশের কোনো শহরে যাতায়াত করে। শিক্ষিতা নয় সে, শিক্ষিত সমাজে মানুষও হয়নি, সেজন্য উচ্চ আদর্শ কি, সে সম্বন্ধে কোনো টুকরো-টাকরা কথাও তার কানে এসে পৌঁছয়নি। কিন্তু পেশার দিক দিয়ে জঙ্গলের স্তূপে পড়ে থাকা সত্ত্বেও সে স্বার্থপরতায় ডুবিয়ে দেয়নি নিজেকে। সে বোঝে, তাদের নিরন্ন পরিবারটিকে সাহায্য করা তার কর্তব্য। কর্তব্য কথাটিও তার চিন্তা-চেতনার বাইরের শব্দ। সোজা কথায়, না খেতে পাওয়া, ছেড়া-খোঁড়া কাপড়-চোপড় পরা তার পরিবারের লোকজনকে দেখে সে মনে মনে বড় বেদনা বোধ করে, আর সে তার মনের সেই বেদনা দূর করে এইভাবে পরিবারটিকে সাহায্য করে।

তিন

সময় কাটতে কাটতে বছর গড়িয়ে যায়। চোদ্দ-পনেরো বছর বয়সে সে এই জীবন শুরু করেছিল। আগের চেয়ে তার বুদ্ধি আরও বেশি পরিপক্ক হয়েছে। আঙুল ধরে হাঁটা ছেলের মতো সে প্রথম প্রথম মা'র আঙুল ধরে হাঁটা ছাড়া আর কিছু জানত না। এখন নিজেও কিছু কিছু ভাবতে শুরু করেছে। সে যা সাহায্য করে, তাতে তাদের পরিবারের অবস্থার পরিবর্তন হয়নি। ঘরে মদ-মাংস খাওয়ার পরিমাণ আরও বেড়ে যায়, কয়েকদিনেই টাকা পয়সা খরচ হয়ে যায়। খদ্দের না জুটলে আবার না খেয়ে দিন কাটাতে হয়। ধোসা কাপড়-চোপড় অল্প কয়েকদিনের জন্যে গা থেকে নামে। কাপড়ের দোকান থেকে সুতি কিংবা পশমী কোট আসে। কিন্তু কয়েকদিন পরেই আবার তা বিক্রী হয়ে যায়। ঘরের এক

কোণে ফেলে রাখা ধোলা কাপড়-চোপড় আবার পরতে শুরু করে। রূপী ধোলা কাপড়-চোপড় পরে চলা-ফেরা করতে পারে না, আর তাতে খদ্দেরই বা জুটবে কোত্থেকে? তার শরীর স্বাস্থ্যও ভালো রাখা দরকার, তাতে পরিবারের লোক জনকে যদি না খেয়ে থাকতে হয় থাকবে, কিন্তু তার না খেয়ে থাকা চলে না।

সব ধর্মেই বেশ্যাবৃত্তিকে পাপ বলা হয়েছে, তার জন্য নরকে কঠোর শাস্তি ভোগের চিত্রও অঙ্কন করা হয়েছে। কিন্তু হাজার বছর ধরে নরকের ভয় দেখানো সত্ত্বেও বেশ্যাবৃত্তি কম হওয়ার বদলে বেড়েই চলেছে। ওপারের দণ্ডের কথা এখানে কেউ ভ্রূক্ষেপ করে না, তাই ধীরে ধীরে সেটা বরদাস্ত করা প্রকৃতিরও অসহ্য হয়ে উঠল, আর এই জন্মেই সকলের চোখের সামনে কঠোর দণ্ড দিতে শুরু করল। পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়তে লাগল রতিজ ব্যাধি (গনোরিয়া এবং সিফিলিস)। এমন কোন দেশ আছে যেখানে ধনসম্পদের যথেষ্ট প্রাচুর্য, অথচ এই ব্যাধি দুটি ধনসম্পদের সহযাত্রী হিসেবে সে দেশে প্রবেশ করেনি! শহর আর স্বাস্থ্যনিবাস-গুলিতে তো এগুলোর প্রকোপ আরও বেশি। ঠাণ্ডা পার্বত্যাঞ্চল বেছে বেছে ইংরেজরা যেখানেই ছাউনী গেড়েছে, সেখানেই চতুর্দিকে দশ মাইল জুড়ে লোকে এই ব্যাধিতে ত্রাহি ত্রাহি করতে লেগেছে। এই ব্যাধির প্রকোপ কতখানি, যদি জানতে হয়, তাহলে কোনো গাঁয়ে গিয়ে নিঃসন্তান পরিবারের সংখ্যা কত, জিজ্ঞেস করুন। গনোরিয়া মানুষকে নিঃসন্তান করে দেয়। মানুষ নিঃসন্তান হওয়ার ফলে গ্রামের অর্ধেক ঘরবাড়িই পতিত হয়ে গেছে, হিমালয়ের কাছাকাছি এ রকম বহু গ্রাম দেখতে পাওয়া যাবে। এ-রোগের অব্যর্থ ওষুধ পেনিসিলিন, কিন্তু একবার সেরে উঠেও তো রেহাই নেই, যদি তা সমাজে ব্যাপক হারে ছড়িয়ে পড়ে, আর এরূপ রোগাক্রান্ত স্ত্রী-পুরুষের সংসর্গ অবাধে চলতে থাকে। সিফিলিস তার চেয়েও ভয়ঙ্কর। কারণ এ-রোগ শুধু মানুষকে নিঃসন্তানই করে না, কুষ্ঠ ব্যাধিরও জন্ম দেয়। রূপী যে জীবন গ্রহণ করেছে, তাতে সে এই ভয়ঙ্কর ব্যাধির হাত থেকে বাঁচবে কি করে? তিন বছরও কাটল না, সে সিফিলিসের শিকার হলো। ব্যাপারী যখন দোকান খুলে বসে, তখন কোনো খদ্দেরকে সে কি নিজের মালপত্র বিক্রী না করে থাকতে পারে? আজ থেকে দেড় হাজার বছর আগে শূদ্রক তাঁর 'মৃচ্ছকটিক' নাটকে লিখেছেন:

> 'বাপ্যাং স্নাতি বিচক্ষণো দ্বিজবরঃ মূর্খোপি বর্ণাধমঃ,
> ফুল্লাং নাম্যতি বায়সোপি বিহগো যা নামিতা বর্হিণা।
> ব্রহ্মক্ষত্রবিশঃ তরন্তি চ যথা নাবা তথৈবেতরে,
> সা বাপীব লতেব নৌরিব জনং বেশ্যাসি সর্বং ভজ॥'

এভাবেই পুষ্করিণী, লতা আর নৌকোর মতো বেশ্যাকেও কারোর সঙ্গে বৈষম্য না করেই প্রত্যেকের সেবা করে যাওয়ার জন্য তখনকার মতো আজও প্রস্তুত থাকতে হয়। রূপীর ব্যাধি খুব মারাত্মক হয়ে উঠেছিল, যা হয়ে গিয়েছিল একেবারে,

চলা-ফেরাও কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মধুপুরীর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো তাকে। চিকিৎসা চলতে লাগল, কিন্তু রোজ সাত টাকা করে দেওয়া তার পক্ষে বেশি দিন সম্ভব হলো না। ঘা তখনও পুরোপুরি সারেনি, তবু সে চলে এলো সেখান থেকে। গাঁয়ে তখনও সৎ-বাপ বেঁচে ছিল, কিছু জমিজমাও ছিল তার, আর ছিল একটা ভাঙা-চোরা বাড়ি। সেখানেই পাঠিয়ে দেওয়া হলো রূপীকে। তার কাছে এ জীবন বড় কঠিন বলে মনে হতে থাকে। সামান্য এই অসুখের মৃত্যুর করাল গ্রাস সে যেন চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পায়। ব্যাধি কুষ্ঠে পরিণত হলে ঐ মৃত্যুর চেয়েও যে তা কত ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে, সেটা বোধ হয় তার ধারণা ছিল না। যতদিন ব্যাধি গোপন থাকে, ততোদিন খদ্দের আসে। লোকের কাছে জানাজানি হয়ে গেলে তখন আর কে আসবে ? সাধ করে কেউ কি আর নিজের গলায় ফাঁসির দড়ি পরতে চায় ? যদি তাকে কারবার তুলে দিতে হয়, তাহলে এক মুঠো অন্নের জন্যে কি তাকে হা পিত্যেশ করে ঘুরে বেড়াতে হবে না ! ঋষিকেশ প্রভৃতি জায়গায় শত শত কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্ত মেয়েদের দেখেনি সে, দেখলে বুঝতে পারত, রূপের পশরা খুলে বসার ফলেই মৃত্যুর চেয়েও নিকৃষ্ট জীবন-যাপন করতে হচ্ছে তাদের, কড়া রোদ্দুরে রাস্তার ধারে বসে ভিক্ষে করতে হচ্ছে।

যাই হোক, বিপদের কথা এক-আধটু আঁচ করতে পারল সে। অসুখ না হলেও, এটা তো সে বুঝতেই পেরেছিল যে রূপ-যৌবন আজীবন থাকে না, যৌবন কখন মেঘের ছায়ার মতো টুক করে সরে যায়, মালুমও হয় না। এখন তার একমাত্র চিন্তা, কি করে এই জীবন থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়। সুস্থ হয়ে উঠলে তাকে আবার দেশের শহরে চাকলায় অর্ধেকটা সময় কাটাতে হবে, বাকি অর্ধেকটা সময় কাটাতে হবে মা'র কাছে মধুপুরীতে। কিন্তু চাকলায় ঢোকার পথটা যত সহজ, সেখান থেকে বেরিয়ে আসার পথ খুঁজে পাওয়া ততো সহজ নয়। আগে তার চোখে মুখে হাসি ঝিলিক মারত, এখন তা পরিষ্কার লোক দেখানো হাসি বলে মনে হয়—কখনো কখনো যদি মুখে হাসি ফোটেও, তবুও তা নিতান্তই কৃত্রিম দেখায়। রূপী অবশ্যই রূপোপজীবিনী, কিন্তু সে নির্লজ্জ নয়। শাস্ত্রে 'সলজ্জা গণিকা নষ্টা' বলা হয়েছে। হয়ত তার কিছু প্রভাব তার বৃত্তির ওপর পড়ে থাকতে পারে। সে যথার্থই রূপসী ছিল, রূপ আর যৌবন একসঙ্গে মিলে প্রচণ্ড আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল সে।

চার

অন্ধকারেই সে খুব হাত-পা ছুঁড়ল। যে খদ্দেরটাই তার কাছে আসে, সে-ই তার নিখাদ ভালোবাসা দেখাতে নিজেকে যেন তার কাছে উৎসর্গ করে দিতে চায়।

কিন্তু শত শত লোকের মুখে একই কথা শুনতে শুনতে পুরুষের ওপর বিশ্বাসই হারিয়ে ফেলল সে। ব্যাধিটা শুধু একবার নয়, আরও একবার আক্রমণ করল তাকে। এই দ্বিতীয়বারে ওষুধপত্রেও কোনো ফল হলো না। এবার সে যৌনব্যাধি অবাধে ছড়াতে শুরু করল, তবুও গুড়ে পড়া দুর্দশাগ্রস্ত মাছির মতো পুরুষেরও তো অভাব নেই। কিছু কিছু লোক তার বাঁধা খদ্দের হয়ে দাঁড়িয়েছে, কিছু লোক মাঝে-সাঝে আসে। চাকলা থাকে শহরের এক কোণে অন্ধকারে, সেখানে ভয়-ভীতিও থাকে যথেষ্ট, সেজন্য খদ্দেরদের লুকিয়ে-চুরিয়ে আসতে হয়। অথচ, মধুপুরীতে থাকার সময় রূপীর কারবার চলে খোলাখুলি। পুলিস খুব দূরে থাকে না, আইনের বাধাও রয়েছে, কিন্তু তার বাড়িতে সস্তা মদ যেভাবে বরাবর বিক্রী হয়, সেইভাবে সস্তা রূপের পশরাও। মধুপুরীতে খুব উঁচুতলার লোকেরা সস্ত্রীক আসে। ছোট-খাটো কাজ-কারবার করে যারা, তা তারা পাহাড়ীই হোক আর দেশীই হোক, সবাই একা একা আসে। রূপী তার দাম খুব চড়িয়ে রাখেনি, তার খদ্দেরের অভাব না হওয়ার সেটাও একটা কারণ। গত ছ-সাত বছরে তাকে বেশ কয়েকবার কয়েকমাস করে গ্রামে গিয়ে কাটাতে হয়েছে কারণটা আর কিছুই নয়, রোগটা তাকে কারবার চালানোর মতো অবস্থায় রাখেনি।

রূপীর বয়স এখন পঁচিশ ছাড়িয়ে গেছে। এদিকে পাকিস্তান তৈরি হওয়ার পর পাঞ্জাব থেকে বহু সাধারণ লোক মধুপুরীতে পালিয়ে আসছে রোজগারের ধান্দায় কিংবা বেড়াতে। তাদের অনেকে তার বাঁধা খদ্দের হয়ে দাঁড়িয়েছে, কেউ কেউ বিয়ের প্রলোভনও দিতে শুরু করেছে। মেয়েমানুষের যেখানে অভাব, সেখানে তাদের দাম বেড়ে যায়। এক তরুণ দর্জি তার কাছে নিয়মিত যাওয়া-আসা করতে লেগেছে। সে প্রথম যখন বিয়ের প্রস্তাব দেয়, তখন রূপী তার অমত জানায়নি ঠিক, তবে বিশ্বাসও করতে পারেনি। এখন বড় উদ্বেগ দেখা দিয়েছে তার। ব্যাধির ভয় তো রয়েছেই, তার চেয়েও বেশি, যৌবন চলে যাওয়ার ভয়ে সে সদা শঙ্কিত। সেবার গ্রীষ্মকালে দর্জি তার কাছে ঘনঘন আসতে শুরু করল, আর সেই শীতকালেই তাকে সঙ্গে করে শহরে নিয়ে যাওয়ার জন্যে এক পায়ে খাড়া হলো।

যেসব শহরের চাকলায় রূপী তার কারবার চালিয়েছে, সেইসব শহরেরই একটাতে গিয়ে উঠল সে। দর্জি তাকে বড় আদর-যত্নে রাখল। তার বাড়ির লোকজন এক-আধটু মামুলী ধরনের আপত্তি জানালো, কিন্তু তারা তো জানেই যে স্বজাতির ঘরের মেয়ে পাওয়া তাদের সাধ্যায়ত্ত নয়, তাই শেষ পর্যন্ত মৌন সম্মতি জানালো তারাও। রূপীর মাকে কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে সে খুব দেমাকের সঙ্গে জবাব দেয় —'শ্বশুরবাড়ি গেছে।'

শীতকাল কাটিয়ে গ্রীষ্মকালে সে আবার মধুপুরী ফিরে এলো। সেবার দর্জি সঙ্গে এলো না, কারণ নীচে তার দোকানটা বেশ ভালো চলতে শুরু করেছে। আবার

এদিকে মধুপুরীতে দরকারের চেয়ে বেশি দর্জি এসে কারবার ফেঁদেছে। দর্জি রূপীকে কিরকম যত্নে রেখেছিল, সেটা তাকে দেখলেই বোঝা যায়। গাল দুটো আবার লালচে হয়ে উঠেছে, গায়ে-গতরে মাস লেগেছে, চোখ দুটো কোটরে ঢুকে গিয়েছিল, আবার তা ডগমগে ঝকঝকে হয়ে উঠেছে। ভালো কাপড়ের সালোয়ার দোপাট্টা বানিয়ে দিয়েছে দর্জি। একটা চমৎকার ওভারকোটে তার দেহের শোভা বাড়িয়েছে। দর্জি ভেবেছিল, ঠাণ্ডা জায়গার মেয়ে হঠাৎ করে নীচের গরম সহ্য করতে পারবে না, তাই খরচপত্র দিয়ে তাকে মধুপুরী পাঠিয়ে দিয়েছে।

কিন্তু, মধুপুরীতে এসে তাকে তো বাস করতে হবে তার সেই পরিবারের মধ্যেই, সেই মধুশালাতেই উঠতে বসতে হবে, যেখানে তার মা মধুবালা সেজে রয়েছে। মদ আর রূপ, এই দুটি বস্তুর খদ্দের সেখানে বরাবরই আসে। হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা মা-র পছন্দ হবে কেন? আগেকার অনেক নেওটা খদ্দের রূপীর রূপের এই নতুন চমক দেখে কি আর চুপ করে বসে থাকতে পারে? সে মনে মনে ভাবে, এখানে আসা ভুল হয়েছে। কিন্তু ব্যাপারটা যখন পুরোপুরি মাথায় ঢুকল তার, তখন নীচে লু বইছে। খবরের কাগজ পড়তে পারলে দেখতে পেত যে ১১২° থেকে ১১৪° তাপমাত্রা সেখানে। এ রকম লু-তে গিয়ে কোনো পাহাড়ী লোক বাঁচতে পারে না, সে-কথা জানা থাকা সত্ত্বেও সে তার দর্জি স্বামীকে চিঠি লিখল তাকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। তবু এ রকম বিপদ মাথায় নিয়ে থাকতে চায় না সে। রূপী বড় কষ্টে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখল মাস খানেক। এই এক মাসের মধ্যেও তাকে কোনো-না-কোনো অজুহাতে যখন-তখন মা আর সৎ-বাপের বকুনি খেতে হলো। শেষ পর্যন্ত সবাই মিলে আবার সেই অন্ধকার গর্তে ঠেলে দিলো তাকে।

গ্রীষ্ম কাটল, বর্ষা শুরু হলো। আড়াই মাস তিন মাস আসা হয়ে গেলো তার। বেশ দেরীতেই, শেষের দিকে, তার হাত-পা ভারী বোধ হতে লাগল। তার ইচ্ছে এবং তার চেয়েও বেশি ইচ্ছে তার মায়ের যে দর্জি তাড়াতাড়ি এসে তাকে নিয়ে যাক। দর্জির চিঠিপত্র প্রায়ই আসে, মাঝে মাঝে সে তার অন্তরের ভালোবাসা জানাতে গিয়ে চিঠিতে সিনেমার গানের দু-একটা লাইনও জুড়ে দেয়। হঠাৎ একদিন সে চিঠিতে লিখে জানালো—তোমাকে নিয়ে আসাটা আমার মা বাপের পছন্দ নয়। রূপীর পায়ের তলা থেকে যেন মাটি সরে গেলো। এখন কি করা যায়? মা-র সামনে সে সব সময় জড়োসড়ো হয়ে থাকত, কিন্তু এখন সে তার মা-কে প্রায়ই খুব কথা শোনায়—'আমি এই পাঁক থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলাম, নিজের লোভের জন্যে তুমিই আমাকে আবার এই খানা-ডোবায় ঠেলে দিলে।' এমন সময় দর্জির সেই প্রত্যাখ্যানসূচক চিঠি এলো। চিঠিখানা পড়িয়ে যখন সে সব কথা শুনল, তখন আর নিজেকে সামলাতে পারল না, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করল সে।

তার মা-র মধুশালা যদিও আইনের চোখে একটা গোপন জায়গা, কিন্তু ভেতরের লোকেরা তার খোঁজ-খবর বেশ ভালোই রাখে। রূপীর 'শ্বশুরবাড়ি' থেকে ফেরার কথা যেমন তার পুরনো মধুমক্ষিকারা জানত, তেমনি তাদের চার-পাশে ওড়াউড়ি করে আর ফুলের গন্ধ শুঁকে বেড়ায় এমন কিছু লোকজনের কাছেও ব্যাপারটা গোপন ছিল না। তাদের অনেকেই আবার দর্জির জানাশোনা। তারাই চিঠিতে সব কথা লিখে জানিয়ে দিয়েছিল দর্জিকে: এখানে বসে বসে সত্যি-মিথ্যে সাফাই-গাওয়াটাও রূপীর পক্ষে সহজ নয়। আর সেই সাফাই মেনে নেবেই বা কে? তবুও সে কাকুতি-মিনতি করে একটার পর একটা চিঠি লিখতে লাগল। দর্জির মন একটু নরম হলো তাতে। হয়ত মনে মনে ভেবেছিল, এই বউ যদি হাত-ছাড়া হয়ে যায়, তাহলে আর বউ জুটবে না কপালে, বাকি জীবনটা এমনিই কাটাতে হবে। একদিন সে রূপীর মা-র মধুশালায় এসে হাজির হলো। ভেতরে ভেতরে শঙ্কিত হলেও মনে মনে খুশি হলো রূপী। কোনো একটা অজুহাত দেখিয়ে সে এখান থেকে তাড়াতাড়ি চলে যেতে চাইল।

পাঁচ

মা দর্জির সঙ্গে মেয়েকে পাঠিয়ে দিলো। না জিজ্ঞেস করতেই আশপাশের লোককে বলে বেড়াতে শুরু করল—'আমার মেয়ে শ্বশুরবাড়ি চলে গেছে।' মেয়েকে চিঠিও দিলো সে, কিন্তু কয়েক মাস ধরে কোনো জবাবই এলো না। একদিন দেখা গেলো, রূপী আবার তার ঘরে এসে হাজির। দর্জি তাকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে এক মুহূর্ত দাঁড়ালো না, তক্ষুনি চলে গেলো। রূপীর রক্তশূন্য চেহারা। দেখে মনে হয়, কয়েক মাস জ্বরে ভুগেছে, চোখ দুটো কোটরে বসে গেছে। দর্জি যে ভালো লোক, সে-কথা রূপী স্বীকার করে। তাকে যেসব গয়নাপাতি কাপড় চোপড় দিয়েছিল, তার একটাও কেড়ে নেয়নি সে। বস্তুত মা-বাপের সঙ্গে ঝগড়া ঝাঁটি করেও সে রূপীকে কাছে রাখতে চেয়েছিল। কিন্তু রূপী যে পাঁচ মাসের অন্তঃসত্ত্বা, সে-কথা জানাজানি হতে দেরী হলো না। পাঁচ মাস কেন, তার চেয়েও আগে থেকে রূপী তার কাছে ছিল না। কি করে সে স্বীকার করবে যে পেটের সন্তান তার। এমন তেতো গিলতে তার সমাজের লোকজন রাজী হতে পারে না। তাদের সমাজে যে কোনো বংশের মেয়েকে গ্রহণ করা বৈধ, কিন্তু তাই বলে এ-অবস্থার নয়। তবুও সেই ইমানদার দর্জিটি তার ক্ষতি করতে চায়নি। কোনো একজন ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করে সন্তানটিকে নষ্ট করে দেওয়ার ব্যবস্থা করল। দু-তিন মাসের হলে হয়ত শরীর-স্বাস্থ্যের কোনো ক্ষতি হতো না, কিন্তু গর্ভ ধারণের মোট সময়কালের অর্ধেক সময়ই পেরিয়ে গিয়েছিল। সেজন্য রূপী যখন মধুপুরী ফিরল, তখনও তার রক্তস্রাব বন্ধ হয়নি।

তার জীবনে একবারই উষার রক্তরাগ ছড়িয়ে পড়েছিল, সে তার ভবিষ্যৎ জীবনের কত না স্বপ্ন দেখেছিল। মনে হতো সে পৃথিবীতে নয়, আকাশ-মার্গে যেন কোনো এক দেবযানে চড়ে বিচরণ করছে। বাসনার বশবর্তী হয়ে এরূপ জীবন সে স্বীকার করে নেয়নি, দারিদ্র্যই তাকে এ-পথে ঠেলে দিয়েছিল। কত আশা-নিরাশার মাঝখানে জীবন কাটাতে কাটাতে শেষ পর্যন্ত সে একবার পথের সন্ধান পেয়েছিল, কিন্তু আবার সেই অন্ধকার গর্তেই ছিটকে পড়ল সে।

শরীরের এ-অবস্থায় মধুপুরীতে থাকা অর্থহীন, সেজন্য তাকে গাঁয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। এবারকার পুরো সীজন —গ্রীষ্ম বর্ষা দুটোই —গাঁয়ে কাটালো সে। দাড়িওয়ালা, দাড়িবিহীন, টুপিওয়ালা, টুপিবিহীন, কত লোক রোজ মধুশালায় আসত ডজনে ডজনে, এখন তাদের সংখ্যা খুব নগণ্য। সন্ধ্যের দিকে কেউ কেউ মদ খাওয়ার জন্যে আসে। মনে হয় পথে আবার ঘাস গজাবে। পথে হাঁটার লোকজন কমে গেলে তাই তো হয়।

অক্টোবর মাসে পথ আবার চালু হলো। দেখা গেলো, নানা ধরনের মূর্তি ওদিকে যাতায়াত করছে। লোকে বলাবলি না করলেও জানাজানি হয়ে গেলো যে রূপী এসে গেছে।

এখন আবার সেই জীবন শুরু হলো তার। দর্জির তৈরি-করা ওভারকোট, সালোয়ার আর দোপাট্টা পরে কখনো কখনো তাকে বাইরে বেরোতেও দেখা যায়। মনে মনে যারা কামনা করত, এ-জীবন থেকে মুক্তি লাভ করুক সে, যারা তার কয়েকদিনের পরিবর্তিত জীবনধারায় খুশি হয়েছিল, তাদের দিকে এখন চোখ তুলে তাকাবারও সাহস নেই তার। নিজের লজ্জায় নিজেই সে মাটির সঙ্গে মিশে যেতে থাকে। তার চলা-ফেরা দেখলে মনে হয়, সে যেন মানুষ নয়, একটা যন্ত্র। তার মনে কি আর কোনো আশা থাকতে পারে? সমাজের অনেক বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে জীবনে একবারই মুক্তিলাভের সুযোগ পেয়েছিল সে, কত বছরের সাধ্য-সাধনার পর। দর্জির মতো লোক আর কি কেউ তার জীবনে জুটবে?

মধুপুরীর জন্য এই রূপী শুধু একা নয়, এ রকম আরও কত রূপী এখানে তিলে তিলে নিজেদের জীবন নষ্ট করছে। যখন আমরা মধুপুরীর মধুর সৌন্দর্যের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হই, তখন আমরা এতটুকুও ভেবে দেখি না যে এই সৌন্দর্য সৃষ্টির জন্য কতজনকে নরক-কুণ্ডে যেতে বাধ্য হতে হচ্ছে।

রাউত

ভারত কৃষিপ্রধান দেশ। এখানকার অধিকাংশ লোকের জীবিকা চাষবাসের ওপরই নির্ভরশীল। আমাদের দেশে কোনো কোনো রাজ্যের জনবসতি এত ঘন যে সেখানকার জমি ঠিক মতো বণ্টন করা হলেও মানুষের পক্ষে পর্যাপ্ত জমি পাওয়া সম্ভব নয়। দেশের যেসব অংশে জনবসতি খুব ঘন, দেশের মাটি তাদের ভার সইতে পারে না, সে-সব জায়গায় মানুষ পেটের জন্যে দেশ-বিদেশে যায় জীবিকার সন্ধানে। উত্তর প্রদেশের পূর্বাংশ, উত্তর বিহার —এ রকমই কিছু অঞ্চল রয়েছে উত্তর ভারতে। দক্ষিণে তামিলনাড়ুর সামনেও ঐ একই সমস্যা। এই কারণেই অবধী থেকে মৈথিলী ভাষা-অঞ্চলের লোকেরা ফিজি, গায়ানা, ত্রিনিদাদ, মরিশাস পর্যন্ত কুলি-মজুর খাটতে গেছে, আর সে-সব জায়গায় এখন তাদের সন্তানেরা মানবিক অধিকারের জন্যে লড়াই করছে। যারা ওদের কুলি-মজুর করে পাঠিয়েছিল, তারা এখনও ওদের ঐ অবস্থাতেই রাখতে চায়। তার টাটকা উদাহরণ ব্রিটিশ গায়ানা —চার্চিলের সরকার সেখানকার সংবিধান তাকে তুলে রেখে মন্ত্রিসভা ভেঙে দিয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে আফ্রিকার লোকগুলোকে যেমন ভুলিয়ে-ভালিয়ে ক্রীতদাস করে দ্বীপান্তরে পাঠানো হতো, কুলি-মজুর করে পাঠানোর ব্যাপারটাও ছিল অনেকটা সেই রকম। যদিও কুলি-মজুর সংগ্রহ করার এজেন্ট (আড়কাঠি) সরাসরি বল প্রয়োগ করত না, কিন্তু একবার যদি তাদের মিথ্যে কথায় গ্রামের কোনো সাদা-সিধে মানুষ ফেঁসে যেত, তাহলে জেলখানার কয়েদী হতে হতো তাকে, ইংরেজের পুলিশ তাদের এ-কাজে সাহায্য করত। এই ভূ-ভাগের লোকেরা আজও রুজি-রোজগারের ধান্দায় কলকাতা, বোম্বাই পর্যন্ত দৌড়ায়। এই দুটি শহরে আজকাল হিন্দী কথাবার্তা এত বেশি শোনা যায়, তার কারণ, আমাদের এই অবধী-ভোজপুরী-মৈথিলী ভাষাভাষী মজুররা রয়েছে সেখানে। মাদ্রাজে সেখানকার সস্তা মজুরের সঙ্গে যদি পাল্লা না দিতে হতো, তাহলে সেখানে গিয়েও হাজির হতো তারা। এখান থেকে বেশ মোটা সংখ্যক লোক কালাপানি পেরিয়ে সিঙ্গাপুরেও চলে গেছে।

কলকাতা আর বোম্বাই দুটি শহরই এই শ্রমজীবীদের চুম্বকের মতো সমানভাবে আকর্ষণ করে, কিন্তু এই দুটি শহরই শুধু তাদের গন্তব্যস্থল নয়। কিছু কিছু লোক ভাগ্য-পরীক্ষার জন্য পাঞ্জাবের দিকেও পাড়ি জমায়। কলকাতা আর

লাহোরের যাত্রীদের সীমারেখা হিসেবে কাজ করে পাঞ্জাব, সংবাদপত্রগুলো যেমন নিজস্ব বাজারে যাওয়ার জন্যে এপার-ওপার করে, ঠিক সেইভাবে। লাহোরে আর পাঞ্জাবে যারা কাজের সন্ধানে যায়, তারা প্রায় সবাই অবধী ভাষাভাষী, পশ্চিমের ভোজপুরী শ্রমিক খুব অল্পই যায় সেখানে। ইংরেজরা যখন পাঞ্জাবে কৃষ্ণাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গ সেপাইদের পল্টন তৈরি করে, তখন তারা বিশেষভাবে লক্ষ্য রেখেছিল, সেখানকার কৃষ্ণাঙ্গ সেপাইদের পল্টনে যেন পাঞ্জাবের চেয়ে পূর্বাঞ্চলের লোক বেশি হয়। পূর্বাঞ্চল আর পশ্চিমাঞ্চলের সীমারেখা প্রাচীনকাল থেকেই বিতর্কিত। কোনো এক সময় অম্বালা জেলায় প্রবাহিত শরাবতী বা সরস্বতীর পূর্বে অবস্থিত ভারতকেই পূর্বদেশ বলা হতো। কিন্তু সংস্কৃত বৈয়াকরণদের এই সীমা-নির্ধারণকে লোকে মেনে নেয়নি। পাঞ্জাবীরা মেরঠ জেলাকেও পূর্বাঞ্চলের অংশ বলে, আবার মেরঠের লোকেরা গঙ্গার ওপারে রুহেলখণ্ডের লোকেদের বলে পূর্বদেশী। তেমনি রুহেলখণ্ডের লোকেরা অবধী ভাষাভাষীদের, আর অবধী ভাষাভাষীরা ভোজ-পুরীদের, আবার ভোজপুরীরাও নিজেদের সীমা ছাড়িয়ে মিথিলাকে পূর্বদেশের অংশ বলে গণ্য করে, আর হয়ত মৈথিলীরাও তাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া এই অপবাদ বরদাস্ত করতে রাজী নয়।

তা সত্ত্বেও অধিকাংশ মানুষই অবধীর পশ্চিম সীমানাকেই পূর্বদেশের সীমানা বলে স্বীকার করে, আর এই তিন ভাষাভাষী লোককেই পূর্বদেশী বলে চিহ্নিত করে। যদিও মেরঠ কমিশনারের অধীনস্থ অন্যান্য জেলাগুলোতে শ্রমিকের অভাব নেই, কিন্তু দেরাদুনের ঐ দুর্নাম আছে। বিশেষ করে শিবালিক আর হিমালয়ের মধ্যস্থ দুনে তো এখনও পূর্বদেশী শ্রমিকের চাহিদা। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজরা যখন নেপাল থেকে দুন কেড়ে নেয়, তখন তার জনসংখ্যা দশ-পনেরো হাজারের বেশি নয়। সমস্ত ভূ-ভাগটাই অনাবাদী হয়ে পড়ে ছিল, জায়গায় জায়গায় ঘন জঙ্গল ছিল, তাতে হাতি আর বাঘ ঘুরে বেড়াত। কিন্তু তারাই শুধু মানুষের ভয়ঙ্কর শত্রু ছিল না, তার চেয়েও ভয়ঙ্কর ছিল ম্যালেরিয়া রোগসৃষ্টিকারী মশা। ম্যালেরিয়ার প্রকোপে এখানে আসা অর্ধেক লোকই সাফ হয়ে যেত। তবুও মানুষ বিপদের মোকাবিলা করে ধীরে ধীরে সেখানে গড়ে তোলার চেষ্টায় জনবসতি করেছে। প্রথম যারা এসেছিল, তারা হলো প্রতিবেশী সাহারানপুর জেলার কৃষক। তাদের সংখ্যা কিছুটা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যখন ব্যবসায়ীদের দরকার পড়ল, তখন হরিয়ানার রোহতক, করনাল ইত্যাদি জেলারও কিছু সংখ্যক লোক এসে পৌঁছল। কিন্তু তাদের দিয়ে শ্রমিকের প্রয়োজন পুরোপুরি মিটল না। সে-কথা শুনে, যারা লাহোর পর্যন্ত ধাওয়া করে, সেই পূর্বদেশীদের কিছু কিছু লোক দুনের দিকে মুখ ফেরালো। আজ দেরাদুনের সমভূমি অঞ্চলের (দুনের) বড় বড় কৃষক পূর্বদেশীদের বাদ দিয়ে নিজেদের কাজকর্ম আদৌ চালাতে পারে না।

দুই

পূর্বে অনেক জায়গায় আহীরকে রাউত বলে। সম্প্রদায়টির লোকসংখ্যা উত্তরপ্রদেশের পূর্বাংশের ও বিহারের সর্বাধিক লোকসংখ্যার সম্প্রদায়ের চেয়ে তিন গুণেরও বেশি। যদিও উঁচু সমাজ তাদের অচ্ছুত করেনি, কিন্তু ভালো আসনও দেয়নি, তবুও আত্মমর্যাদাবোধ বিসর্জন দেয়নি তারা। লাঠালাঠি, মারামারিতে বীরত্ব ও সাহস দেখানোতে তারা সবচেয়ে আগে থাকে। এক সময় পশুপালনই তাদের পেশা ছিল, গরু-মোষ পুষত আর দুধ-ঘি বিক্রী করত। এখনও কিছু কিছু লোকের পেশা ওটাই, বিশেষ করে যারা শহর-বস্তির কাছাকাছি থাকে, তাদের। কিন্তু এখন আর ততো গোচারণ-ভূমি নেই। যে হারে জঙ্গল কেটে সাফ করা হয়েছে, সেই হারে পশুর সংখ্যাও কমেছে। অন্যান্য সম্প্রদায়ের মতো তারাও ক্রমশ চাষাবাদের দিকে ঝুঁকেছে। কিন্তু ব্রাহ্মণদের তৈরি বর্ণব্যবস্থা শুধু প্রণাম আর আশীর্বাদ করার যোগ্যতাই নির্ণয় করে না, বরং উচ্চ বর্ণগুলিকে —ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য (বেনে কায়স্থ)-কে ধনোপার্জনের সমস্ত উপায়গুলির ব্যবস্থা করে দেয়। সুতরাং আহীর বেচারীরা ছোট ছোট চাষী কিংবা ক্ষেতমজুর হওয়া ছাড়া আর কি হতে পারে? আমাদের এই উপাখ্যানের নায়ক রাউত — রাজপুত্র, কত বড় নাম। এমনও হতে পারে, এদের অধিকাংশের পূর্বপুরুষ শকেরা যখন এদেশে এসেছিল, তখন ওদের রাজ্যপাট ছিল বলে ওদেরকে রাউত বলে ডাকা শুরু হয়, আজও সেই নামেরই পুনরাবৃত্তি চলছে। কিন্তু এখন তাদের ঐ নামটি শুধু বিদ্রূপাত্মক বলেই মনে হয়।

রাউত যখন রুজি-রোজগারের চেষ্টায় গ্রাম থেকে পশ্চিমের পথ ধরে, তখন তার বয়স হবে বিশ বছরের মতো। হয়ত তার গাঁয়ের কিংবা আশপাশের কেউ ম্যালেরিয়ার দেশে কোদাল চালাচ্ছিল তখন। সে-ও সেখানে গিয়ে হাজির হলো। কয়েক বছর ধরে সেখানে খাটা-খাটুনি করে সে নুন দিয়ে রুটি খেয়ে দিন কাটায়। দু-চারবার ম্যালেরিয়াতেও ভোগে, কিন্তু সে কর্মঠ, শরীর-স্বাস্থ্য বেশ মজবুত, এদেশে এসে যারা রুটির বদলে যমরাজের নেমন্তন্ন পায়, সে তাদের দলে পড়ে না। রাউত হয়ত কিছু দিন রক্ত-ঘাম ঝরিয়ে বাসমতীর জমি তৈরি করে, আবার কখনো, ঐ জেলায় তখন যে খাল তৈরি হচ্ছিল, তাতে গিয়ে মাটি কাটে। দু-তিন বছর পর পর বাড়িও যায়। তখন রেলের ভাড়া আজকের মতো এত বাড়েনি। শ্রমিকেরা টাকার হিসেবে নয়, এক-এক পয়সা করে বাঁচাবার চেষ্টা করে, বাড়ির চিন্তা সব সময় মাথায় থাকে। মা-বাপ ভাই-ভাইপোকে সাহায্য করার কথা যদি নাও ভাবে, তবুও নিজের বিয়ে কিংবা বিয়ে-করা বউয়ের জন্যে কিছু জমাতেই হয়। তাই রাউত প্রতি বছর ছুটি কাটাবার জন্যে বাড়ি যেতে

পারে না। কিছু টাকা রোজগার হলে বিয়ের খরচপত্তরের ভাবনা রইল না আর। তাদের সমাজে তখনও ছেলে-মেয়ে কেনা-বেচা হতো না, বিধবাকে নিয়ে ঘর-সংসার পাতাটাও নিচু চোখে দেখা হতো না। হয়ত রাউতের বিয়ে ছোটবেলাতেই হয়ে গিয়েছিল, তার বউটাকে দেখলে অন্তত তাই মনে হয়। সে নিজে বেশ গাঁট্টাগোট্টা, দেখে চল্লিশের বেশি বয়স বলে মনে হয় না। কিন্তু তার বউটাকে, লম্বায় তার স্বামীর চেয়ে খাটো হবে না, দেখলে মনে হয় ষাট বছরের বুড়ি। কোমর সোজা রেখে হাঁটতে পারে, হাঁটেও, কিন্তু একটু চড়াই ভাঙতে হলেই তার শরীরটা সমকোণ-ত্রিভুজের দুটি রেখা হয়ে যায়। লম্বা চেহারার জন্যে হয়ত ঘরের দরজায় কপালে ঠোকা খেয়েছে, সেই শিক্ষার পর এখন সব সময় ভয়ে ভয়ে থাকে, দূর থেকে হামাগুড়ি দিয়ে এগোয়। দেখলে সত্যিই হাসি পায়।

ম্যালেরিয়ার দেশে কোদাল চালাতে চালাতে, রোগ-ব্যাধির সঙ্গে লড়াই করতে করতে কয়েক বছর কেটে গেলো। রাউতের ছেলেপিলেও হয়েছে। মানুষের সঙ্গে মানুষের বুদ্ধি ও প্রকৃতির তফাত আছে। রাউতের এলাকার লোকজন রুজি-রোজগার কামাতে দূর দূর জায়গায় চলে যায়, তাতে তাদের বুদ্ধি-বিবেচনা নয়, ক্ষুন্নি-বৃত্তির তাগিদটাই থাকে বেশি। কিন্তু রাউত ওদের মধ্যে একটু অদ্ভুত ধরনের। খানিকটা ভাবনা-চিন্তা করার ক্ষমতাও রয়েছে তার, তাই ম্যালেরিয়ার মার খেতে খেতে মধুপুরী চলে আসার বুদ্ধিটা তার মাথায় গজালো। সেখান থেকে মধুপুরী খুব দূর নয়, এখানে মজুরীও বেশি পাওয়া যায়, অবশ্য বারো মাস কাজ জোটে না, পাঁচ-ছ মাসেরই কাজ। পূর্বদেশীরা এখানে এসে পৌঁছয়নি, তার কারণ সম্ভবত ম্যালেরিয়ার ভয়, অথবা পাহাড়ী লোকদের মোকাবিলা করতে সক্ষম নয় তারা। রাউত ক্ষেতে কাজ করতে করতে এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বাগানের কাজ ধরল। সেখানকার বাংলোর এক পাকা মালী তাকে এই বিদ্যার ক-খ শিখিয়ে দিলো। সে খবর পেলো, মধুপুরীতে মালীর চাহিদা আছে। তার গুরু মালী তাকে সঙ্গে আসার জন্যে বলল, সে-ও চলে এলো মধুপুরী। বর্তমান অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকা রাউতের স্বভাবে নেই, তাই মালীর মজুর হয়ে থাকাটা তার বেশিদিন পছন্দ হলো না। প্রথমে সে তার গুরুকে ছেড়ে, মধুপুরীর যে হোটেল দুটি সবচেয়ে বড়, তার একটিতে প্রধান মালীর সহকর্মী হয়ে গেলো। তার কাজে সবাই খুশি। কয়েক বছরেই পাকা মালী হয়ে উঠল। হোটেলের ম্যানেজারকে সে খুশি করতে জানে, তাই কয়েক বছর পরেই সেখানকার প্রধান মালী হয়ে গেলো সে।

তিন

মালী রাউত তার এক ডজন মালীকে নিয়ে 'হোটেল চার্ম'-এ কাজ করে। যদি তারা মাত্র দুটি প্রাণী হতো, তাহলে রোজগারটা অপর্যাপ্ত হতো না। বেতন

ছাড়াও কিছু বাড়তি রোজগার আছে, হোটেলের অতিথিরা ফুলের তোড়ার জন্যে কিছু কিছু বকশিস দিয়ে থাকে। কিন্তু, এখন তার পরিবার বড় হয়েছে, ছেলে-মেয়েরা সেয়ানা হয়ে উঠছে। সংসারের এত খরচের পক্ষে রোজগারটা যথেষ্ট নয়। প্রধান মালী হওয়ার জন্যে বেতন একটু কমিয়ে দিয়ে শীতকালেও রাখা হয় তাকে। অথচ, এত করেও তার অভাব মেটে না। রাউত ভাবতে থাকে, আর কি করা যায়। গাছপালা সম্বন্ধে সে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল, হোটেলের পাশের জমিতে কিছু শাক-সব্জীরও চাষ করে সে। কিন্তু মালীর কাজ ছেড়ে দিয়ে একদম এগিয়ে গিয়ে স্বাধীনভাবে তরি-তরকারির চাষ-বাস শুরু করে দেওয়ার সাহস হয় না তার। সে দেখল, নীচে পাশের শহরে যে সব্জী চার আনা সের দরে বিক্রী হয়, মধুপুরীতে তারই দাম বারো আনা। সে সব্জীর কারবার করবে ঠিক করল, কিন্তু ভাড়ায় দোকান নিয়ে নয়, এ থেকে তাকে বুদ্ধিমানই বলা যেতে পারে। দোকান স্থাবর জিনিস, যেসব খদ্দের দোকনে আসে, কেবল তাদের কাছ থেকেই লাভ করতে হয় দোকানদারকে। ফেরীওয়ালাকে দোকানের চড়া ভাড়া গুণতে হয় না, তার ওপর বাঁধা খদ্দেরদের জন্যে হা-পিত্যেশ করে বসে থাকতে হয় না। জিনিসপত্র বিক্রী না হলে সে বাংলোয় বাংলোয় ফেরী করতে পারবে। মধুপুরীতে বাংলোগুলো বেশ দূরে দূরে, যাদের যথেষ্ট চাকর-বাকর আছে, তারাই চাকর পাঠিয়ে বাজার থেকে শাক-সব্জী আনিয়ে নেয়। সে জানে চাকর এক টাকাকে দেড় টাকা না করুক, পাঁচ সিকে তো করেই, আর না দেখেশুনে কেনা সেই সব্জী কারোর পছন্দই হতে পারে না। তখনকার দিনে মধুপুরীতে যতদিন ছোট-বড় দুটি সীজন চলে, ততোদিন সমস্ত বাংলোই লোকজনে ভরে থাকে। সীজনের পরেও অনেক লোক থাকে এখানে। শীতকালে অবশ্যই বাংলোগুলো খালি হয়ে যায়, কিন্তু মধুপুরীর তিনটে বাজারের মধ্যে একটা তো বারো মাস একই রকম চলে, অন্যগুলোতেও যথেষ্ট দোকানপাট থাকে। রাউত আগেই বুঝেছিল, গর্দানের আর পা দু'খানার জোর চাই, তাহলে জিনিসপত্র অবিক্রীত থাকবে না। সে এক-তৃতীয়াংশ দামে বেশ ভালো শাক-সব্জী নীচের বাজারে গিয়ে কেনে, তারপর মাথায় করে মধুপুরীতে বয়ে আনে। জলে ধুয়ে সাফ-সুতরো করে সেগুলো পরিষ্কার বড় ঝাঁকায় নিয়ে ফেরী করতে বেরোয় সে। সব সময় খেয়াল রাখে, যাতে মাল ভালো হয়, কারোর কিছু বলার না থাকে, আর সেই সঙ্গে বাজার থেকে যেন দু'পয়সা সস্তাও হয়। এমন সব্জীওয়ালার কাছ থেকে যে একবার জিনিস কিনবে, সে তার বাঁধা খদ্দের না হয়ে যায়?

রাউতকে খুব বেশি দিন মাথায় করে সব্জী ফেরী করে বেড়াতে হলো না। আমদানি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে লোক রেখে দিলো, তারা মধুপুরী থেকে সব্জী নিয়ে আসে, তাদের মাথায় ঝাঁকা তুলে দিয়ে সে-ও সঙ্গে সঙ্গে মধুপুরীতে ঘুরে বেড়ায়। শুধু সমতল রাস্তার ওপরেই মধুপুরীর বাড়িগুলো তৈরি হয়নি, অনেক বাংলোয়

যেতে হলে যথেষ্ট চড়াই ভাঙতে হয়। রাউত নিজের মাথাতেও ঝাঁকা নিয়ে সে সব জায়গায় গেছে। বেচারী সমভূমির শ্রমজীবী মানুষ হওয়ার ফলে চড়াই ভাঙতে কাবু হয়ে পড়ত, কিন্তু ধীরে ধীরে অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল তার। এখন তো খালি হাতে বেড়ায় সে। তার কাজ শুধু দাঁড়িপাল্লায় মাল ওজন করে দেওয়া। রাউতের আগে থেকেই বাংলোয় বাংলোয় ফেরী করার লোক ছিল, কিন্তু তারা মাংস, ফল ইত্যাদি দামী দামী জিনিস বিক্রী করে বেড়ায়। রাউতের কপাল ভালো যে তার কারবারের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার মতো লোক এখনও নেই। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ছড়িয়ে পড়তে পড়তে সে আর একা সব্জীর ফেরীওয়ালা রইল না, কম দামে সব্জী বিক্রী করার লোকও জুটে গেলো। তবু তাতে রাউতের ভয় পাওয়ার কিছু নেই, যুদ্ধের ফলে মধুপুরীতে এত লোক বেড়ে গেছে যে এর আগে অতো লোক আর কখনও দেখা যায়নি। আমেরিকান সেপাই কুলিকে মজুরির কথা জিজ্ঞেস করলে কুলি যখন এক টাকা চায়, তখন সে পাঁচ টাকার নোট ফেলে দিয়ে বলে —না, এটাই তোমার মজুরি হওয়া উচিত। বেচারীরা ডলারের দেশের লোক, ওদের ওখানে একটা ডলার আমাদের এখানে তিন টাকার চেয়েও বেশি।

আমেরিকান সৈন্যরা রাউতের শাক-সব্জী খাওয়ার লোক নয়। তাদের খাওয়া-দাওয়া হোটেল-রেস্তোরাঁতেই, তাই এই বহতা গঙ্গায় রাউত হাত ধুয়ে নিতে পারল না। তবে বর্ষার ব্যাঙের মতো মধুপুরীর এখানে-ওখানে লজ, হোটেল, রেস্তোরাঁ গজিয়ে উঠেছে, সেগুলোর দু-চারটেকে বাঁধা খদ্দের করে নিতে অসুবিধে হলো না তার। কিছুদিন পরে দেখা গেলো, জিনিসপত্রের দুর্মূল্যের প্রভাব শাক-সব্জীর ওপরেও পড়েছে, নীচের শহরেও এখন আর সেই দামে জিনিসপত্র পাওয়া যায় না। রাউতের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আবার উপায় খুঁজতে লাগল। সে মধুপুরীর বেশি মজুরির লোকজন ছাড়িয়ে দিয়ে গাঁ থেকে সস্তা মজুরির লোক নিয়ে এলো। নিজের দেশ-ঘর হলে সে তাদেরও কাজে লাগাত না, স্ত্রীর মাথাতেই ঝাঁকা তুলে দিয়ে সব্জী ফেরী করে বেড়াতে এতটুকু কুণ্ঠা বোধ করত না সে। সেরকম করতে পারলে মজুরি দিয়ে লোক রাখার দরকার হতো না, ও-কাজটা তার স্ত্রীই করত। কিন্তু আমাদের দেশে শারীরিক পরিশ্রমকে লজ্জাজনক বলেই মনে করা হয়। উচ্চ বংশজাত এবং মান্যগণ্য বলে যে নিজের পরিচয় দিতে চায়, তাকে কিছুতেই নিজের হাতে কাজ করলে চলবে না। ছোট-বড় কোনো জিনিস হাতে করে বইতে হলে সেটাকে কাগজে কিংবা অন্য কিছুতে এমনভাবে মুড়ে নিতে হবে, যাতে বোঝা না যায় যে সে মাল বওয়ার কাজ করছে। দেশ থেকে দূরে, বিশেষ করে মধুপুরীতে বসবাস শুরু করার পর, প্রথমে মালীদের সর্দার এবং তারপর সব্জীর কারবারী হয়ে রাউত একটা কথা সব সময় মনে রাখে, যেন কেউ তাকে কুলি-মজুর না ভাবে। এমনিতেই সে মধুপুরীতে মজুর সেজে আসেনি,

একটা ছোট-খাটো মালী হয়েই এসেছিল। নীচের শহরে থাকতেই সে ফরসা জামা-কাপড় পরতে শুরু করেছিল, সভ্যতার আরও কিছু ব্যাপার-স্যাপার শিখে ফেলেছিল। কখন এক সময়ে এই অবধীভাষী চাষীটার মাথা থেকে আঁটসাঁট দেশোয়ালী টুপি নেমে গেছে, তার জায়গায় ঝুঁটিওয়ালা কালো গোল টুপি উঠেছে মাথায়। এক এক ঋতুতে এক এক ধরনের পোশাক পরে সে।

রাউতের বাজে খরচ নেই। এ-ব্যাপারে তার স্ত্রী আবার আরও এক ধাপ এগিয়ে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের দেখা-শোনা করার সময় তো বেচারীকে যথেষ্ট কাজ করতে হতো, কিন্তু এখন তারা বড় হয়ে যাওয়ায় আর তেমন কাজকর্ম নেই। এতদিনের চেষ্টাচরিত্রের ফলে কিছু টাকা-পয়সা জমিয়েছিল রাউত, তা দিয়ে সে গাঁয়ে কিছু জমি-জমা কিনেছে। জমি দেখাশোনার জন্যে বড় ছেলেকে বাড়ি পাঠিয়ে দিতে হয়েছে। রাউতের স্ত্রীর কাছে রান্নাবাড়া বাসন-কোসন ধোয়ার কাজটা যথেষ্ট নয়। সে মনে মনে ভাবে, আরও কিছু কাজ হলে ভালো হয়। চাষীর মেয়ে, তাই চাষবাসের কাজের দিকেই তার ঝোঁক বেশি। স্বামী যখন শাক-সব্জী ফেরী করতে যায়, তখন ঘরের কাজকর্ম সেরে নিয়ে বাকি সময়টা কাটানো মুশকিল হয় তার। রাউতের স্ত্রী চুপচাপ স্বভাবের মেয়ে নয়, তার গলার খনখনে আওয়াজ এক ফার্লং দূর থেকে শোনা যায়। বারো বছর আগে হয়ত সে এখনকার মতো এত রোগা-পাতলা ছিল না, কিন্তু তাই বলে যথেষ্ট মোটা-তাজা ছিল বলেও মনে হয় না। সভ্য জগতে প্রবেশ করার পর তার বেশ-ভূষায় যথেষ্ট পরিবর্তন এসেছে। গাঁয়ের ঘাগরা-চুনরী ছেড়ে শাড়ি পরতে শুরু করেছে সে। দু'আনা ওজনের সোনার নাকফুল এখনও তার নাকের শোভা বাড়ায়। সময়ের একটু আগেই সে বুড়িয়ে গেছে, এটা ঠিক, কিন্তু এ-বয়েসেও তাকে দিনের বেলা কখনও বসে থাকতে দেখা যায় না, সব সময় যেন গা-নাচিয়ে বেড়ায়। নিজের বিশ্বাস অনুযায়ী ধর্মকর্মেও ঘাটতি নেই তার। তা তুষারপাতই হোক আর হাড় কনকনে ঠাণ্ডাই হোক, দিনে একবার, তা-ও আবার ঠাণ্ডা জলে স্নান না করে থাকে না। লোকে দেখে অবাক হয়, তাপমাত্রা যখন হিমাঙ্কের নীচে নেমে যায়, তখনও তার পরনে ঐ শাড়িই থাকে। ঠাণ্ডা দূর করার কোন বিদ্যে তার জানা আছে, কে জানে!

রাউতের স্ত্রীর একটাই দোষ বলা যেতে পারে, লোকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করতে জানে না সে, অবশ্য তেমনি তার শত্রুও বেশি নেই। আর কেউ শত্রুতা করতে এলে একমাত্র ভগবানই তাকে বাঁচাতে পারেন, তখন জাঁতির মতো দ্রুত জিভ নড়ে তার। সে নিজের ভাষাটা অবিকল বজায় রেখেছে, যদিও হিন্দী আর পাহাড়ী ভাষাও বোঝে, কিন্তু কার সাধ্যি, তার পূর্বদেশী অবধী ভাষার মধ্যে অন্য ভাষার একটি শব্দও ঢুকিয়ে দেয়। রাউতের সঙ্গে তার এ ব্যাপারে তফাত আছে। রাউত তার স্ত্রীর সঙ্গেও বিশুদ্ধ অবধীতে কথা বলতে

চায় না, আর বাইরে তো অবধী মেশানো হিন্দীই তার ভাষা। তার সাজ পোশাকের সঙ্গে সেটা বেশ খাপ খেয়ে যায়।

চার

নিজের বর্তমান অবস্থায় সন্তুষ্ট না হয়ে সে আবার তার কাজ বদলালো। ভেবে দেখল যে শাক-সব্জী ছাড়া তার কারবারের আর কোনো রাস্তা নেই। একটা দোকানের পেছনে দু-চারশো টাকা লাগাতে পারে, কিন্তু সে ভালো করেই জানে যে ব্যবসায়ীদের মতো ধৈর্য ও সাহস তার নেই। চলে-ফিরে বেড়ানোর জীবনটাই তার পছন্দ, দোকানে বসে বসে মাছি মারতে তার ভালো লাগবে কেন? মধুপুরীতে প্রত্যেকটি বাংলোর সঙ্গেই চাকর-বাকর আর ঘোড়ার জন্যে অনেকগুলো করে ঘর (আউট-হাউস) থাকে, কোনো কোনো বাড়িতে তা মালিকের ঘরের চেয়েও তিনগুণ চারগুণ বেশি। এক সময় যখন ইংরেজরা ঘোড়া আর দলবল নিয়ে এখানে আসত, তখন এই ঘরগুলিতেও তাদের পোষাতো না। তথচ, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের হিড়িকে বাংলোগুলো লোকজনে ভরে গেলেও ঐ ঘরগুলো খালিই পড়ে আছে। রাউতের থাকার জন্যে মুফতে ঘর পাওয়া সহজ, বিশেষ করে যখন সে মধুপুরী থেকে বেশ দূরে থাকতে রাজী। এখানকার বাংলোগুলো বেশ দূরে দূরে হওয়ার জন্য মহাযুদ্ধের দিনকালেও সেগুলোর দু-একটিতেই লোক উঠেছে। এই রকমই এক বাংলোর আউট-হাউসে রাউত পরিবার থাকতে শুরু করল। বাংলোর আশপাশে শাক-সব্জী লাগানোর মতো কিছু জমি যেন আগে থেকেই তৈরি হয়ে আছে। এক সময়ে সেখানে গাছে গাছে আপেল, নাসপাতি ফলত। কিন্তু বাংলোটা যখন ইংরেজ মালিকের হাত থেকে ভারতীয় রাজার হাতে চলে এলো, তখন সেই ফলের গাছপালা শুকিয়ে যেতে দেরী হলো না। রাউত বাংলোর আউট হাউসে বাস করতে লাগল আর পড়ে থাকা জমিটায় শাক-সব্জী লাগাতে শুরু করল। রাউতের স্ত্রীও তাকে কাজে সাহায্য করে। বাইরে থেকে তখনও সব্জী কিনে বিক্রী করা বন্ধ হয়নি, আর নিজের হাতে ফলানো সব্জী তো 'অধিকস্যাধিকং ফলং'। তারপর তার চোখে পড়ল, পাশের পোড়ো বাংলোটার কাছে প্রায় দু'একরের মতো সব্জী লাগানোর জমি রয়েছে। একথা উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই, মধুপুরীতে যে ইংরেজ ঐ সুন্দর বাংলোটা তৈরি করেছিল, সে শাক-সব্জীর চাষ করার জন্যে জমিটা তৈরি করেনি, তাতে ফুল-ফল হতো। তারা চলে যাওয়ার পর গাছপালা শুকিয়ে গেছে, জমিটা ফাঁকা পড়ে আছে। বড় বাংলোটার আরও একটা সুবিধে রয়েছে একটা বড় চৌবাচ্চা রয়েছে সেখানে, সেটা বর্ষায় আপনা-আপনি জলে ভরে যায়। মধুপুরীতে বর্ষা শুরু হওয়ার আগে প্রায় মাস দু'য়েক শুকনো খটখটে হয়ে যায় মাটি, কেবল সেচের জোরেই শাক-সব্জী

কিংবা ফুলের বাগান টিকে থাকে। এমন সুবিধে কি রাউতের চোখ এড়িয়ে যেতে পারে? বাংলোর মালিক তো ভাড়াটের ব্যাপারে হাত ধুয়ে বসে আছেন, রাউত যখন তাঁর কাছ থেকে অল্প কিছু টাকায় জমিটা বন্দোবস্ত করে নিতে চাইল, তখন খুশি হয়েই দিয়ে দিলেন তিনি।

সে-সময় রাউতের নিত্য-নতুন চিন্তা-ভাবনা আকাশকুসুম কল্পনাকেও হার মানায়। দু'একর ভালো জমি, জলের এমন সুবিধে, আর সেই সঙ্গে চড়া দামে তরি-তরকারি বিক্রী করার বাজার তো ঘরেই। এর চেয়ে বেশি আর কি চাই? দক্ষ মালী হওয়ার ফলে সে তো জানেই যে ভালো বীজ আর ভালো সার মন্ত্রের মতো কাজ করে। মটরের চাষ সবচেয়ে বেশি লাভজনক। কারণ মধুপুরীতে সাড়ে ছ'হাজার ফুট উঁচুতে মে মাসেই ভালো স্বাদের বড় বড় মটরশুঁটি ফলে। নীচে তখন ও জিনিস দুর্লভ, তাই দেড় টাকা দু'টাকা সের দরে তা সহজেই বিকিয়ে যায়। ঠিক এই সময় মধুপুরী শৈলবিহারী লোকজনে থৈ-থৈ করে। তাদের চাহিদার তুলনায় ফসল বেশি হলে নীচের শহরে কিংবা দিল্লীতে নিয়ে গিয়েও বেশ ভালো দামে বিক্রী করা যেতে পারে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অনেক আগেই মধুপুরীতে মোটর-লরী আসতে শুরু করেছিল, আর এখন একেবারে দিল্লী পর্যন্ত তরি-তরকারি নিয়ে গিয়ে বিক্রী করে আসা আদৌ কঠিন নয়। দার্জিলিঙের লোকেরা তো কলকাতায় সব্জী বিক্রী করে লাল হয়ে গেলো। কিন্তু মধুপুরী আর তার আশপাশের পাহাড়ের লোকেরা বড় আরামপ্রিয়। তারা অর্থোপার্জনের এমন সুন্দর উপায়টিকে ব্যবহার করতে আদৌ প্রস্তুত নয়। রাউত সবই জানে, কিন্তু এখনও তার অতো ভাববার দরকার নেই, কারণ তার অতো মটরশুঁটি ফলে কোথায়?

মটর ছাড়া বাঁধাকপি, গাজর, শালগম আর মূলোর চাষও শুরু করল সে। এত উঁচুতে ফুলকপি খুব চেষ্টাচরিত্র করে ফলাতে হয়, আর তারও যা ফুল হয়, এইটুকু এইটুকু, তাই ওতে কোনো লাভ নেই। ওলকপি আর একটু বড় হয়, কিন্তু রাউতকে লক্ষ্য রাখতে হয় ফসলের ওজনের দিকে, তাই সে বাঁধাকপিরই চাষ করে। অল্প কিছুদিন অন্তর অন্তর সে এমনভাবে মটর বোনে, যাতে মে থেকে জুলাই পর্যন্ত মটরশুঁটি বিক্রী করা যায়। প্রথম বীজ বোনা হয় নভেম্বরেই। শীতকালে তার জমি এখানে-ওখানে যে এক-আধটু সবুজ দেখায়, তা ঐ মটরের জন্যেই। বাকি সব ফসলের বীজই বোনা হয় শীতকাল শেষ হলে, মার্চের শেষে কিংবা এপ্রিলে।

চাষের কাজ শুধু হাত দিয়ে হয় না, অনেক কিছু দরকার হয়। নানা আয়োজনের পরও হয়ত দেখা গেলো, আবহাওয়া অনুকূল কিংবা প্রতিকূল। যদি মাটি স্যাঁতসেতে হয়ে গেলো তো কাজের বারোটা বেজে গেলো। ফসলে পোকা লাগলে তাতেও মুশকিল। কিন্তু রাউতের কাছে সবচেয়ে বড় আপদ

শজারু। ওরা রাতের বেলা এসে ক্ষেতের দাঁড়িয়ে থাকা ফসল খেয়ে চলে যায়। দু-একবার আলু লাগিয়েছিল সে, কিন্তু ঐ শজারুতেই সব নষ্ট করে দিয়েছিল। একেবারে জঙ্গল লাগা জমি বলে এই জন্তুটার উৎপাত বন্ধ করা কিছুতেই সম্ভব নয়। কুকুর দিয়েও কোনো কাজ হয় না। কুকুরের খোঁজে নেকড়েরা তো রোজ চক্কর দিয়ে বেড়ায়, শজারু দেখে ঘেউ-ঘেউ করে ওঠার আগেই নেকড়ের মুখের মধ্যে চলে যায় বেচারারা। রাউত বুঝতে পারল, জঙ্গলের গা-ঘেঁষে থাকা জায়গায় মাত্র দু'একর জমি জঙ্গলের জন্তু-জানোয়ারদের কাছেই যথেষ্ট নয়।

পাঁচ

যুদ্ধ শেষ হওয়ার দু-এক বছর পর পর্যন্তও রাউত কোনোরকমে একইভাবে কাটালো। রাউতের স্ত্রী তার ছেলেবেলার চাষীর জীবন-যাপন আবার ফিরে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা। চাষের জন্যে রাউত দুটো বলদও পুষেছে। দুধের কারবার মধুপুরীতে খুব লাভজনক, বাজারে খাঁটি দুধ মানে অর্ধেক জল। এটা রাউতের পৈতৃক পেশা, কিন্তু দুধের কারবারের দিকে সে কখনও মনোযোগ দেয়নি। সেটা করতে চাইলে সে নিজে গরু-মোষ না পুষে গাঁয়ের লোকের কাছ থেকে সস্তায় দুধ কিনেও বিক্রী করতে পারত, অনেকেই যেমন করে। এক-আধটা গরু কখনো-সখনো বাড়িতে রাখে, কিন্তু তার মানে এই যে ঘরের প্রয়োজনীয় দুধটুকু পাওয়া যাবে, আর বাছুরটা বড় হলে চাষের কাজে লাগবে। রাউতের স্ত্রী এখন সারাদিন কাজে ব্যস্ত থাকে। গাছপালা লাগানো, জমি নিড়ানো, ফসল তোলা—এইসব করতে হয়। কাঠ-কুটো সহজে পাওয়া গেলেও সে ঘরের গোবরে ঘুঁটে দেয়, আর ঘুঁটের আগুনে রাঁধা খাবার বেশি সুস্বাদু বলে মনে করে সে।

অবশেষে রাউত দেখল, এই সামান্য চাষাবাদে কাজ চলতে পারে না। জমিতে যদি আরও টাকা ঢালা হয়, সে-টাকা উঠে আসবে না। রাউত এখন তরি-তরকারি বিক্রী করার চেয়ে ফসল ফলানোর কায়দা-কানুনই ভালো রপ্ত করেছে। মধুপুরীর যে-প্রান্তে সে থাকে, সেখানকার সমস্ত লোকজন, বাড়িঘর, জমিজমা সবই তার পরিচিত। তার বাংলোটার কাছেই একখণ্ড সমতল জমি রয়েছে, দৈর্ঘে-প্রস্থে অনেকখানি। জমিটার ওপর তার নজর পড়ল। বিধবা মেমসাহেব তার প্রাসাদ-তুল্য বাংলোটা মেরামতও করতে পারে না, এদিকটায় কোনো ভাড়াটেও আসে না। রাউতকে সে এক-দেড় একর ভালো জমি ঠিকেতে দিয়ে দিলো। বাংলোর আর একদিকেও ঠিক অতোটাই সমতল জমি পড়ে ছিল! বাংলোর চারপাশে ফুলের এবং অন্যান্য গাছগাছালির বাগানের জন্যে যথেষ্ট আলাদা জমি আছে। বাংলোটা যখন তৈরি করা হয়, তখন গোড়ার দিকে বাংলোর সৌন্দর্য বাড়াবার জন্যে ঐ জমি ব্যবহার করা হতো। অনাবাদী পড়ে থাকা সত্ত্বেও

মেমসাহেব শুধু একদিকের জমি ছেড়ে দিলো। আর একদিকের জমি সে নিজের হাতেই রাখল। বর্ষায় যখন ঘাসের মখমলে জমিটা ঢেকে যায় তখন সেদিকে চেয়ে মেমসাহেবের চোখ জুড়িয়ে যায়। বাংলোটা থেকে কিছু দূরে তিন একরেরও বেশি আর একখণ্ড সমতল জমি ছিল। রাউত সেটাও ঠিকেতে নিয়ে নিলো। অমন জমি মধুপুরীতে কোথাও নেই। এখানে অনেকগুলি ক্রিকেটের মাঠ তৈরি করা যেতে পারে, বল খেলার মাঠ হিসেবেও ব্যবহার করা যেতে পারে। চারদিকে পাহাড়, আর মধ্যিখানে সমতল ভূমি। জল বেরিয়ে যাওয়ার কোনো পথ নেই, কিন্তু প্রচুর বৃষ্টিপাত হলেও কয়েক ঘণ্টার মধ্যে জল যে কোনদিকে বেরিয়ে যায়, বোঝা যায় না। এখানে খুব চমৎকার জলাশয় নির্মাণ করা যেতে পারে, তবে, জমিটার যেসব ফাঁক ফোকর দিয়ে জল বেরিয়ে যায়, সেগুলো সিমেন্ট দিয়ে বন্ধ করা দরকার।

রাউত এবার মেমসাহেবের বাংলোর আউট-হাউসে উঠে এলো। দু-তিনটি ঘর কেন, চাইলে সে এক ডজন ঘর নিয়ে নিতে পারে। গ্রীষ্ম আর বর্ষার কয়েক মাস কাটাতে মেমসাহেব প্রতি বছর এখানে চলে আসে আর রাউত তাকে সেলাম জানাতে থাকে। এখন তার ফসলের জন্যে নিশাচর জন্তু-জানোয়ারের ভয় নেই। তবে হ্যাঁ, মধুপুরীর ফসলের সবচেয়ে বড় শত্রু লালমুখো আর কালোমুখো বানরগুলো। এই এক সমস্যা। ওদের সঙ্গে রাউতের তো রীতিমতো লড়াই, কার ফসল দেখা যাক। কিন্তু ওরা দিনের বেলাতেই হামলা চালাতে পারে। রাউত ওদের ঠেকাবার জন্যে একটা বড় কুকুর পুষলো। বাচ্চাই নিয়ে এসেছিল। চাইলে ভালো জাতের বড় কুকুরও সে তার বন্ধু-বান্ধবের কাছ থেকে মুফতেই যোগাড় করতে পারত, কিন্তু জাত নিয়ে তো তার কাজ নয়। আর কে জানে কোন জ্যোতিষীকে দিয়ে শুভক্ষণ দেখে বাচ্চাটাকে নিয়ে এসেছিল, সত্তি-সত্যিই তার ট্যাগর খুব কাজের হয়ে উঠল। মধুপুরীতে সাধারণত লোকের বিশ্বাস যে কুকুর কেবল ইংরেজি ভাষাই বুঝতে পারে, সেজন্যে কুকুরের নাম ইংরেজিতেই রাখা হয়। ট্যাগর নামটা উচ্চারণ করা রাউতের স্ত্রীর পক্ষে খুব কঠিন নয়। মাঝে মাঝে তার বজ্রকণ্ঠের 'ট্যাগর, ট্যাগর' আওয়াজ আশপাশের পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হতে শোনা যায়। পুরনো বাংলোর চেয়ে এই নতুন জায়গায় এসে এখন চাষবাসে ভালো লাভ হচ্ছে রাউতের। এখানে জমিও বেশি, ফসল ফলেও বেশি। কেবল একটাই দুশ্চিন্তা, খরার দু'মাস জলের কোনো ব্যবস্থা নেই। তখন কেবল ভগবানের ওপরেই ভরসা। যদি বৃষ্টি হয়ে যায়, তাহলে তো লালে লাল, আর ঠিক সময়ে বৃষ্টি না হলে ফুল ধরা কিংবা কচি ফলে ভর্তি মটরগাছ চোখের সামনেই শুকিয়ে যায়। গত দু'বছর রাউতকে দুর্দিনই বেশি দেখতে হয়েছে, তবুও হতাশ হয়নি সে।

রাউত জাতে আহীর, গরিব চাষী-মজুর শ্রেণীর লোক। কিন্তু কারোর চোখ

রাঙানি সে বরদাস্ত করতে পারে না। মেমসাহেব খাস ইংলণ্ডের মেয়ে, ভারতে এসেছিল তখনকার এক বড় ভারতীয় অফিসারের বউ হয়ে, তখন ইংরেজের দোর্দণ্ড প্রতাপ এখানে। ইংরেজ রাজত্ব চলে যাওয়ার পরও মেমসাহেবের মন-মেজাজের পরিবর্তন খুব একটা হয়নি। সে রাউতকেও একজন কালো চামড়ার লোক মনে করে তার সঙ্গে সেই ধরনেরই ব্যবহার করতে চায়। যখন রাউত সেটা বরদাস্ত করতে চাইল না আর তার স্ত্রী-ও দু-চার কথা শুনিয়ে দিলো, তখন মেমসাহেবের মাথায় ভূত চাপল, রাউতকে জমি থেকে তাড়িয়ে দিতে চাইল। কিন্তু রাউত জানত, যে-জমিতে সে নিজের হাতে চার-পাঁচ বছর লাঙল চালিয়েছে, সে-জমিতে তারও কিছু হক আছে। সে মামলা লড়ার জন্যে তৈরি হলো। মধুপুরীর সবচেয়ে ভালো উকিল লাগালো সে। মেমসাহেব হেরে গেলো মামলায়। তারপরেও সে আরও উঁচু আদালতে লড়বার জন্যে ভাবনাচিন্তা করছিল, এমন সময় হঠাৎ মারা গেলো সে।

রাউত আর রাউতের স্ত্রী বিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে মধুপুরীতে বসবাস করে আসছে। কিছু কিছু জমিতে চাষাবাদ করার স্থায়ী অধিকারও পেয়েছে সে। জমিতে শুধু জলের দরকার। গাঁয়ের লোকেরা প্রতি বছর আশপাশে নিজেদের গরু-মোষ নিয়ে এসে দুধের কারবার করে, সেখান থেকে সে তার যত ইচ্ছে সার নিয়ে নিতে পারে, শুধু বয়ে আনলেই হলো। বানরের সমস্যা তো একা ট্যাগরই সামলে রেখেছে, অবশ্য মাঝে মাঝে রাউতও সুযোগ পায় মোকাবিলা করার। মধুপুরীর বাংলোগুলোতে ফসল লাগানোর উপযুক্ত এত জমি রয়েছে যে, যদি জল আর বানরের বিহিত করা যায়, তাহলে বাইরে থেকে তরি-তরকারি আনার দরকারই হবে না, এমনকি অসময়ে এখান থেকে যথেষ্ট শাক-সব্জী পাঁচ-ছ' ঘণ্টার পথ গাড়ি দিয়ে দিল্লীতে পৌঁছে দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু এখনও সেদিকে শহরের কর্তৃপক্ষ কিংবা সরকারী কৃষি-বিভাগ —কারোরই নজর পড়েনি। আশ-পাশের বাড়িগুলির বড় বড় চৌবাচ্চায় বৃষ্টির জল এত বেশি ধরে রাখা যেতে পারে যে চাষাবাদের জন্যে ভগবানের মুখ চেয়ে থাকার প্রয়োজন হয় না রাউতের। অথচ অতো বড় চৌবাচ্চা তৈরি করার পুঁজি কোথায় তার? কখনো কখনো ফসলে পোকা লাগে, তার প্রতিকার করাও তার পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। অন্যান্য শহরে ডি. ডি. টি. ছড়িয়ে পোকা-মাকড় মারার ব্যবস্থা করা হয়েছে, কিন্তু এখানে সে-ব্যবস্থাও নেই। এগারো বছর হলো এখানকার সমস্ত কাজের দায়িত্ব আমলারা নাগরিকদের হাত থেকে কেড়ে নিয়েছে, অথচ মানুষের উপকার করা নয়, কাগজপত্র ঠিক রাখাটাই তাদের কাজ।

রাউত আর রাউতের স্ত্রী এখন মধুপুরীর বাসিন্দা। এখানকার মাটি তার পায়ের তলায় এমনভাবে জুড়ে গেছে যে এখানেই তাকে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে হবে। বুদ্ধি-বিবেচনা আছে তার, সাহসী উদ্যোগী পুরুষ সে। কিন্তু সে তার সারা জীবনের অক্লান্ত চেষ্টায় যেটুকু পেয়েছে, ঐটুকুই কি তার মজুরি?

গাড়োয়াল জেলার অন্যান্য শহরগুলি যেমন, তেমনি মধুপুরী হলো হিমালয়ের সমস্ত বিনোদন-নগরীর রানী। কিন্তু এটা সবাই জানে যে, সে তার চারপাশের ভূ-ভাগ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক, অন্তত শৌখিন নর-নারী এবং তাদের অবলম্বন করে যারা জীবিকা নির্বাহ করে, তারা এটা স্বীকার করে। ইংরেজরা এখানে তাদের বাংলো আর প্রাসাদ তৈরি করিয়েছিল। তারা ভেবেছিল, ক্রীতদাসের জীবন-যাপন করা ছাড়া স্থানীয় দু'পেয়েদের এখানে আর কোনো অধিকার নেই। ইংরেজদের স্থাবর সম্পত্তি সমভূমির লোকেদের হাতে চলে এসেছে। এখন তারা নিজেদের মধুপুরীর প্রভু বলে মনে করে। স্থানীয় লোকেরা তবুও পশুর মতো নিজেদের রক্ত-ঘাম ঝরিয়ে এখানে বেঁচে থাকার চেষ্টা করেছে এবং এখনও তাদের সেটাই কাজ। এ রকম জঘন্য জীবন-যাপনেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা কম নেই। স্থানীয় কুলি মজুরের প্রায় সমান সংখ্যক নেপালী কুলি-মজুরও প্রতি বছর এখানে এসে হাজির হয়, ভারী মোট বওয়াতে টেক্কা দেয় এদের, অনেক বছর আগে থেকেই মোট বওয়ার প্রায় সমস্ত কাজই ওদের হাতে চলে গেছে। দূর থেকে আসা এইসব নেপালী মুটেরা, যারা এখানে জীবনের সঙ্গে কঠোর সংগ্রাম চালাচ্ছে, তারা বলে, মধুপুরীর আশপাশের গ্রামগুলির চেয়েও না-কি তাদের দেশে লোকের অবস্থা আরও খারাপ। তবে হ্যাঁ, স্থানীয় লোকেরা আর একদিকে কাজ পায়, ওরা মিউ-নিসিপ্যালিটিতে ছোট-খাটো চাকরি করে, কুলি-মজুর খাটে। রাস্তা-ঘাট আর বাড়ি তৈরি করার কাজকর্মও গাড়োয়ালী মজুরদের হাত থেকে চলে গেছে। পাকিস্তান হওয়ার আগে লাদাক সংলগ্ন বালতি লোকেরা এসে এসব কাজ করত। শুধু মধুপুরী কেন, সারা পশ্চিম আর মধ্য হিমালয়ে বিশেষ করে রাস্তা-ঘাট তৈরির কাজ বালতি মজুরদের একচেটিয়া ছিল। তাদের দেশটা আবার নেপাল থেকেও গরিব, পরিশ্রমীও খুব ওরা। দশ-বারো হাজার ফুট উঁচু জায়গার লোক বলে ওরা ঠাণ্ডাও সইতে পারে বেশি। আর শৈলাবাসগুলিতে শীতকালেই বাড়ি-ঘর তৈরির কাজ বেশি হয়।

১৯৪৭ সালের আগস্টে যে খুন-খারাবির ঘটনা ঘটেছিল, তার কিছু ছিটে-ফোঁটা মধুপুরীতেও এসে পড়েছিল। সে-সময় বালতিরা কোনো রকমে প্রাণ বাঁচিয়ে সেই যে পালালো, আর ফিরে আসেনি। তাদের দেশের বেশির ভাগটাই

পাকিস্তানের হাতে চলে গেছে। যদি তা না হতো, তাহলে মাংস, সব্জী বিক্রেতা মুসলমানদের মতো ওরাও আবার ফিরে এসে কাজকর্মে লেগে পড়ত।

মধুপুরীর পার্শ্ববর্তী গ্রামের মানুষ হিমালয়ের অত্যন্ত পিছিয়ে থাকা লোকজনের মধ্যে পড়ে। গাড়োয়ালের অন্যান্য এলাকার লোকজনের মতো ওরা অতো গরিব নয়, সম্ভবত এই কারণেই ওদের মধ্যে পাণ্ডব-বিবাহের প্রথাটি এখনও রয়েছে। আর এই জন্যেই সাধারণত কুলিগিরি করতে ওরা এখানে আসে না। বড় জোর বাড়ির দারোয়ানের কাজ করে, কিংবা হালকা ধরনের ছোটখাটো কাজ যোগাড় করে নেয়। প্রধানত তাদের কাজ হলো দুধ-ঘি সরবরাহ করা। দুধ বলতে অর্ধেক জল, আর ঘি বলতে তিন-চতুর্থাংশ ডালডা —মধুপুরীর লোকের কাছে দুধ-ঘি বলতে ঐ। চেহারা দেখে ঐ দুধ-ঘিতেই তারা খুশি। এমন পিছিয়ে-থাকা মানুষও যে শুধু জলের নয়, ডালডার মহিমাও জেনে ফেলেছে, এ-থেকেই বোঝা যায়, জীবন-সংগ্রাম মানুষকে কোথা থেকে কোথায় নিয়ে যেতে পারে। এখানকার আশপাশের মানুষ নিতান্তই সাদাসিধে, তাই কুলি-মজুরের যে-সব কাজ একটু বেশিদিন ধরে চলে, কাজের মজুরিও একটু বেশি, সেগুলো তাদের কপালে জোটে না, গাড়োয়ালের দূর দূর এলাকার মানুষেরাই জাঁকিয়ে বসেছে সে-সব কাজে। তাছাড়া যখন-তখন মদে চুর হয়ে থাকা এখানকার এই দেহাতীগুলোকে দায়িত্বপূর্ণ কাজ দেওয়াও যায় না, তাদের এই অবস্থার সেটাও একটা কারণ।

কেদার-বদরী যাঁরা গেছেন তাঁরা জানেন, রাস্তার ধারে ধারে পাহাড়ের বন জঙ্গল কেটে কিভাবে ধাপে ধাপে জমি তৈরি করা হয়েছে, মাঠ-ঘাট সমতল করা হয়েছে। লোকসংখ্যা দ্রুত বেড়ে যাওয়ার জন্যেই করতে হয়েছে এসব। তাতেও জীবিকার সংস্থান না হওয়ায় গাড়োয়ালের ছেলেরা যেখানে একমুঠো খাবার জোটে, সেখানেই যাওয়ার জন্যে তৈরি থাকে। কমলসিং এই রকমই এক যুবক, আজ থেকে বিশ বছর আগে ভাগ্য-পরীক্ষা করতে মধুপুরী এসেছিল। কিছুদিন এমনি মামুলী ধরনের খাটা-খাটনির কাজ করে বেড়ালো, লোকের বাড়িতে থালা-বাসন ধোয়ার কাজ। কিন্তু যুবকটি বেশ বুদ্ধিমান। ভালো জানাশোনা 'আছে, এমন একজনের দেখা পেয়ে গেলো সে, ফলে মিউনিসিপ্যালিটিতে বারো মাসের কাজ জুটে গেলো তার। আগে খেটে-খুটে ভালোই রোজগার করত, কিন্তু তা বছরে কয়েক মাস, আবার রোজ রোজ যে কাজ জুটবে, তারও নিশ্চয়তা ছিল না। সেজন্য কমল মিউনিসিপ্যালিটির কাজটা নিয়ে নিলো। পরিশ্রমও কম। একজন ইলেকট্রিক মিস্ত্রীর সঙ্গে কাজ করতে হয়। কয়েক বছর থাকতে থাকতে ইলেকট্রিক তারের কিছু কিছু ব্যাপার জেনে ফেলল। সূক্ষ্ম কাজ তো আর নয়। প্রথমে বিদ্যুৎ-প্রবাহ বন্ধ করে দেওয়া, তারপর তারগুলোকে খুলে দেওয়া, জুড়ে দেওয়া —এই সবই তার কাজ। দেখতে দেখতে মিস্ত্রী যেটুকু জানে সেটুকু সবই শিখে ফেলল সে, কিন্তু সেরকম কাজ পাওয়া সোজা নয়। একটা কাজের জন্যে

যেখানে পঞ্চাশ জন হাঁ করে আছে, সেখানে বেচারী কমলের কি আর কাজ জুটতে পারে? কুড়ি টাকা করে মাইনে পায় সে, অবশ্য দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগের কুড়ি টাকা এখনকার আশি টাকার সমান। আগে কমলকে তার বেতন থেকে টাকা বাঁচিয়ে বাপ-মাকে পাঠাতে হতো। টাকা-পয়সা না জমালে চিরকাল আইবুড়ো হয়ে থাকতে হবে, এটাও ভাবত সে, কিন্তু প্রতি মাসে পাঁচ-ছ' টাকা করে যখন বাপ মা-র কাছে গিয়ে পৌঁছত, তখন তারাও চিন্তা করত —সেখানে আবার কারোর সঙ্গে কমলের ভাব-ভালোবাসা হয়ে না যায়, তাহলেই ছেলে হাতের বাইরে চলে যাবে। তখনও মেয়ে এত দুর্মূল্য ছিল না, স্রেফ একশো-সওয়াশো টাকার ব্যাপার। যাই হোক কয়েক বছরে কিছু টাকা জমিয়ে নেওয়ার পর তারও বিয়ে হয়ে গেলো। কিন্তু অর্বাচীন তরুণীকে কোনো বিনোদ-নগরীতে নিয়ে যাওয়াটা বিপজ্জনক, এই ভেবে কমল তাকে নিজের কাছে নিয়ে এলো না।

কমলের বেতন কুড়ি টাকাতেই রইল কয়েক বছর। তারপর যখন গূঢ় রহস্যটা জানতে পারল সে, তখন ওপরের অফিসারকে এক মাসের বেতন দিয়ে পাঁচ টাকা মাইনে বাড়িয়ে নিলো, যেটা তার প্রাপ্য। এখন সে মাসে পঁচিশ টাকা করে পায়। মধুপুরীতে গরিব লোকের ঘরবাড়ি মুফতেই জোটে। প্রত্যেক বাংলোর সঙ্গে পাঁচ থেকে কুড়িটা পর্যন্ত কুঠরি রয়েছে চাকর-বাকরদের জন্যে, এক সময় সাহেবদের ঘোড়া আর চাকর-বাকরেই সেগুলো ভরে থাকত, কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর সেগুলো অধিকাংশই খালি পড়ে আছে। এ রকম কিছু কুঠরি ছেড়ে দেওয়াতে মালিকের কোনো লোকসান নেই, বরং লাভ। মানুষ বাস করলে তার মেরামতি এবং দেখাশোনাও করবে। দারোয়ান রাখলে যা বেতন দিতে হবে, তার তিন-চারগুণ কমেই মালিকের কাজ চলে যাবে। তবে হ্যাঁ, এ রকম মুফতে বাস করতে হলে তাকে মধুপুরীর কেন্দ্রস্থল থেকে অনেক দূরে থাকতে রাজী হতে হবে। কমল একা, তার হাত-পা মজবুত। দিনে দশ মাইল দৌড়াদৌড়ি করা তার কাছে কিছুই না। সে একটা বাড়ির অনারারী দারোয়ান হয়ে গেলো।

এতদিন তারা কয়েকজন মিলে একসঙ্গে থাকত, রান্নাবান্না করত একসঙ্গেই। জ্বালানীর খরচ ছিল, তবে তার জন্যে পয়সা খরচ করতে হতো না। প্রত্যেক জুড়িদারই কাজ থেকে ফেরার সময় জঙ্গল থেকে কিছু শুকনো কাঠ-কুটো নিয়ে আসত। জঙ্গলে মঙ্গল হওয়ার শহর মধুপুরী। রাস্তা থেকে একটু ওপরে কিংবা নীচে গেলে ছোট ছোট শুকনো কাঠ-কুটো পাওয়া কঠিন নয়। দূরের বাড়িগুলোর তো এমনিতেই প্রচুর গাছপালা, কোনো কোনো বাড়িতে রীতিমতো বন-বাদাড় রয়েছে। সেজন্যে কমলকে জ্বালানীর জন্যে ভাবতে হয় না। ভাড়াটে বাড়ি হওয়ার জন্যে জলের কলও বারোমাস চালু থাকে, আর সম্পত্তি-কর দেওয়া বাড়ি বলে মিউনিসিপ্যালিটি থেকে মুফতে যা জল পাওয়া যায়, কমলের প্রয়োজনের তুলনায় তা অনেক বেশি।

দুই

কমল বছর খানেক এই বাড়িতেই কাটালো। খুব একা একা। এই সময় তার মনের মধ্যে চিন্তা-ভাবনা উঁকি মারতে লাগলো, বউটা যদি সঙ্গে থাকত, তাহলে রাঁধা খাবার জুটত তার, কাঠ-কুটোও জোগাড় করে আনত সে, ঘর-সংসারও সামলাত। তার ঘরে জিনিসপত্র খুব একটা নেই, কিন্তু যা আছে, তা-ও অন্তত দু'মাসের মাইনের। তার ওপর যে-বাড়ির সে দারোয়ান হয়েছে, সেখানে কখনো কিছু হয়ে গেলে সে-দায় তার কাঁধেই বর্তাবে—অবশ্য দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে মধুপুরীতে চুরির কথা কখনও শোনা যায়নি। ঠিক এই সময় অন্য নম্বরের লাইনম্যানের কাজ জুটে গেলো কমলের, অর্থাৎ বিদ্যুৎ-তারের তদারকি করা, সেই সঙ্গে লাইনের তার জোড়া-কাটার দায়িত্ব নেওয়ার উপযুক্ত লোক বলে বিবেচনা করা হলো তাকে। মাইনে একই, তবে এখন বাড়বার সম্ভাবনা রয়েছে। এবার সে মিউনিসিপ্যালিটির পক্ষ থেকে তৈরি করা কোয়ার্টারও পেয়ে গেলো। নতুন লোককে শহরের মধ্যিখানে বাস করার জায়গা কে দেয়? যে মিউনিসিপ্যালিটির অফিসে তাকে রোজ কাজ করতে যেতে হয়, সেখান থেকে আড়াই মাইল দূরে তার কোয়ার্টার। বস্তুত কোয়ার্টারটি আগে একটি ছোট্ট বিদ্যুৎ-কেন্দ্রের জন্য তৈরি করা হয়েছিল। সেখান থেকে তার টেনে নিয়ে যাওয়ার জন্যে দেওয়ালে ফাঁক-ফোকরের ব্যবস্থা আছে। এর সিকি মাইল দূরে আর একটি বিদ্যুৎ-কেন্দ্র রয়েছে, তাই এটাকে অনাবশ্যক মনে করা হয়। সম্ভবত মিউনিসিপ্যালিটি যখন ইংরেজদের কর্তৃত্বাধীন ছিল, তখন তারা ভেবেছিল যে, মধুপুরী আরও বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়বে, তাই তারা এখানে এই বিদ্যুৎ-কেন্দ্রটি তৈরি করেছিল। এখন বাড়িটা খালি পড়ে আছে। কমল এসেই এক যুগ থেকে খালি পড়ে থাকা বাড়িটাকে ঠিক-ঠাক করে নিলো। বাড়িটা ঠিক মিউনিসিপ্যালিটির সীমান্তে, এটাই মধুপুরীর এদিককার শেষ বাড়ি। এখানে এসেই যে কথাটি তার সবচেয়ে বেশি মনে হতে লাগল, সেটি হলো, বউকে নিয়ে আসা। অফিস যাওয়ার জন্যে রোজ পাঁচ মাইল রাস্তা তো তাকে হাঁটতেই হয়, দূরে কোথাও কাজ পড়লে আট-দশ মাইলও হয়ে যেতে পারে। একা থাকার জন্যে রান্নাবান্নার কাজটাও নিজের হাতে করতে হয়, আর তার ফলে, মাঝ রাত্তিরের আগে সে চোখ বন্ধ করতে পারে না।

বাপ-মা মারা গেছে। দাদা-বৌদির সঙ্গে সম্পর্ক ততো মধুর নয়। শ্বশুর শাশুড়ীর দিক থেকেও আপত্তি উঠতে পারে না, কারণ কমলের বউ যথেষ্ট সেয়ানা হয়ে উঠেছে, অর্বাচীন তরুণীর জায়গায় এখন সে মা হতে চলেছে। সেজন্য কয়েক বছরের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হওয়ার পথে আর কোনো বাধা নেই। শীতকালে সে মাস খানেকের ছুটি নিয়ে বাড়ি গেলো এবং বউকে সঙ্গে নিয়ে ফিরল। আগে

বাড়িটাকে একেবারে নিস্তব্ধ নির্জন বলে মনে হতো তার। বাড়িটায় খেলাঘরের মতো ছোট ছোট দুটি ঘর আছে, সেই সঙ্গে পায়খানা আছে, বিদ্যুৎ-জলের জন্যে পয়সা লাগে না, তবে হ্যাঁ, একটা নির্দিষ্ট পরিমাণে। অথচ বউকে সঙ্গে নিয়ে কমল যখন ফিরল, তখন সেই বাড়িই অন্য রকম মনে হলো তার কাছে। সংস্কৃত সুভাষিত যদি তার জানা থাকত, তাহলে সে বলত—'ন গৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।' খেলাঘরের মতো দু'খানা ঘর, তা-ও সে কুঁড়েমি করে সপ্তাহে একবারও সাফ-সুতরো করত না। বউ এসেই ঝাঁটা দিয়ে সাফ করল, কাছাকাছি পড়শীর কাছ থেকে গোবর চেয়ে এনে ছড়া দিলো। কমল তো থালা-বাসনগুলো নেহাত ভদ্রতার খাতিরেই ধুয়ে ফেলত, এখন সেগুলো ঝকঝক করছে। শুধু ঘরের ভেতরটারই নয়, এমন কি ঘরের আশপাশেরও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা যত্ন-আত্তি দেখবার মতো। বউয়ের বয়স বাইশ-তেইশ বছর। বয়স আরও কম হলেও ভাবনা ছিল না, কারণ মাথায় দায়িত্বের বোঝা চাপালে মানুষ অল্প বয়েসেই হুঁশিয়ার হয়ে যায়। বিয়ের পরও অনেকদিন পর্যন্ত, যখন সে বাপের বাড়িতে থাকত, তখন জঙ্গলে গিয়ে গরু ছাগল চরাত, অন্যান্য তরুণী মেয়েদের সঙ্গে গলা ছেড়ে গান গাইত, নিজের দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মতোই পাহাড় আর জঙ্গল ছিল তার কাছে পরিচিত এবং প্রিয়। কমল মধুপুরীর বদলে নীচে সমভূমির কোনো শহরে যদি কাজ করত, তাহলে বউয়ের যে সেটা পছন্দ হতো না, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। তাদের গ্রামটা দু-আড়াই হাজার ফুটের বেশি উঁচুতে নয়, তাই সেখানে গরম একটু বেশি পড়ে। সাড়ে ছ' হাজার ফুট উঁচু মধুপুরীতে গরমের নাম নেই। নতুন কোয়ার্টারের আশপাশে বন-জঙ্গল একটু বেশি ঘন। দু-চারটে যে বাড়ি আছে, জঙ্গলের ভেতরে সেগুলো আবছা আবছা দেখায়।

কোয়ার্টারের চারপাশে তারের বেড়া দিয়ে ঘেরা একটু জমি আছে। সীজনের সময় আশপাশের গ্রামগুলোর শতশত পরিবার দুধ বিক্রী করার জন্যে তাদের গরু মোষ নিয়ে এসে মধুপুরীর কাছাকাছি যখন ডেরা পাতে, তখন কি সারের অভাব আছে? কমলের কোয়ার্টার লাগাও দু-তিনটে বাড়িতে বছরে পাঁচ-ছ' মাসের জন্যে মোষ আনা হয়। বউটাও চাষীর মেয়ে। পাহাড় অঞ্চলে লাঙল বওয়া ছাড়া চাষবাসের সব কাজই মেয়েরা করে, বরং বলা যেতে পারে, তাদের সামনে পুরুষেরা একেবারে কুঁড়ের রাজা—কমল সেরকম নয়। তার বউটা চাষের সব কাজেই পটু। দু-দু গজের কেয়ারিতে চাষ করার জন্যে লাঙলের দরকার নেই। কাকের ঠোঁটের মতো পাহাড়ী কোদাল মাটি খোঁড়াখুঁড়ির পক্ষে যথেষ্ট। এখানে কমলের বউয়ের বাচ্চা হয়েছে। বাচ্চাটাকে রোদে শুইয়ে রেখে, সংসারের রান্নাবান্না ধোয়া মোছা সেরে, বউ কোদাল চালাতে শুরু করে দেয়। মধুপুরীর জমিতে মাটির চেয়ে পাথরই বেশি, আর অনেক জায়গায় তো ফুলের গাছ লাগানোর জন্যে অন্য জায়গা থেকে মাটি নিয়ে আসতে হয়। কমলের স্ত্রী কেয়ারিগুলোতে আলগা মাটি বিছিয়ে

দেয়নি, মাটি থেকে নুড়ি-পাথর বেছে বেছে ফেলে দিয়েছে। বাগানের মাটি হয়ে উঠেছে মাখনের মতো মোলায়েম। মিউনিসিপ্যালিটির জল মাপা-জোখা। বাড়তি জলের জন্যে পয়সা দেওয়ার ক্ষমতা নেই কমলের। কপাল ভালো, বাড়ি থেকে একশো পা দূরেই সাধারণের ব্যবহারের জন্যে জলের কল আছে। খুব একটা চড়াই উৎরাই রাস্তাও নয়। কমল সেখান থেকে টিন টিন জল এনে কেয়ারিতে ঢালে।

বউকে যখন এনেছিল কমল, সে-সময় তখনো শীতের সবচেয়ে কঠিন মাস দুটি বাকি ছিল। কিন্তু দেখতে দেখতে মাস দুটি কেটে গেলো। মার্চ মাস শেষ হতে হতে সে শাক-সব্জী লাগানোর কথা ভাবতে শুরু করল। অনারারী দারোয়ান থাকার সময়েই শাক-সব্জী আর ফুলের গাছ লাগানোর কাজ এক-আধটু শিখে ফেলেছিল। বউ ধান-গম-ভুট্টার চাষ জানে। শাক-সব্জী বলতে আলু কিংবা চালের ওপর লতিয়ে ওঠা লাউ-কুমড়োর গাছের সঙ্গেই পরিচিত। কমল তার জানাশোনা লোকের কাছ থেকে চারা এনে একটা কেয়ারিতে পেঁয়াজ লাগালো, দ্বিতীয়টাতে টোম্যাটো, তৃতীয়টাতে মুলোর বীজ ছড়িয়ে দিলো, চতুর্থটাতে বাঁধাকপির চারা বসালো। স্ত্রীর আগ্রহাতিশয্যে আধখানা জমিতে গম বুনতে হলো তাকে। ওতে লাভ নেই বিশেষ, সব সময় ভালো ফলে না, তবুও স্ত্রীর মন যোগাতে গিয়ে বরাবরই তাকে কিছু জমিতে গম-ভুট্টা বুনতে হয়। তারের বেড়া দিয়ে ঘেরা জায়গার বাইরেও কিছুটা জমি আছে, যে বাড়িটার জমি নিয়ে মিউনিসিপ্যালিটি এই বিদ্যুৎ-কেন্দ্রটি তৈরি করেছিল, জমিটা তারই। মেহনত করলে সেখানে আরও কিছু ক্ষেত তৈরি করা যেতে পারে। বাড়ির মালিকের কাছে ও-জায়গাটা বেকার। স্বামী-স্ত্রী দু'জনে মিলে বেড়ার বাইরে কয়েক টুকরো জমি তৈরি করে ফেলল, তার পরিমাণ আগেকার কেয়ারিগুলোর চেয়ে কিছুটা বেশিই। প্রশ্ন শুধু মেহনতের, বউ সব সময় ওতে লেগেই থাকে, কমল রবিবারে এবং অন্যান্য ছুটির দিনেও তাকে সাহায্য করে। কমলকে সকাল আটটায় বেরিয়ে যেতে হয়, আর ঠিক সন্ধ্যের সময় বাড়ি আসার ছুটি পায় সে।

বউ কাছে থাকাতে এখন কমলের নিঃসঙ্গতা কেটেছে, জল আর খাবারের চিন্তা থেকে মুক্ত হয়েছে সে, শুধু তাই নয়, তার কেয়ারিগুলোতে এত তরি-তরকারি হয় যে বাড়ির জন্যে কেনার দরকার হয় না, তার অর্ধেকটা বিক্রীও করতে পারে। আলু-ডালের বদলে এখন তারা শাক-সব্জীই বেশি করে খায়। কখনো-সখনো গম হয়, কিন্তু তাতে তিন-চার হপ্তার বেশি চলে না।

তিন

কমলের সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য যাই হোক, তার স্ত্রীর প্রথম সন্তান হতে বেশ দেরি হয়েছিল —বাইশ-তেইশ বছর বয়সেও বউয়ের প্রথম সন্তানের প্রতীক্ষায় থাকাটা

অনেক শাশুড়ীর কাছেই অসহ্য। তাদের তো রীতিমতো আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল যে বাঁজা বউ ঘরটাকে নির্বংশ করতে এসেছে। কিন্তু কমলের ঘরে প্রথম ছেলে আসতেই দেরী হয়েছিল। বড় ছেলেটির জন্মের পর তার বোন আসতেও অবশ্য তিন বছর সময় নিয়েছিল। তারপর প্রায় প্রতি বছরই নতুন মুখের আগমন ঘটতে লাগল তার বাড়িতে। প্রথম তিন বছরের অবকাশে কমল আর তার বউ দু'জনে মিলে ঘরবাড়ি শুধু সুন্দর করেই তোলেনি, ঐ সময় থেকে তাদের রোজগারপাতিও শুরু হয়েছিল। ছেলের নাম রেখেছিল নেম। পাহাড়ে জন্ম বলে মেয়েটির নাম সারো (সরস্বতী) খুবই মানানসই। ছেলেপিলে মা-বাপের ওপর খরচের বোঝা বাড়ায়। বড়লোকের ঘরে শিশুর জন্যে খরচপত্র একজন বয়স্ক মানুষের চেয়ে কম হয় না, কিন্তু কমলের মতো গরিব লোকের ঘরে ব্যাপারটা তা নয়। বাচ্চারা মায়ের দুধ পায় পুরোপুরি। কম হলেও সেদিকে নজর দেওয়া হয় না। বাচ্চার গা ঢাকার জন্যে মায়ের ছেঁড়া-খোড়া কাপড়ই যথেষ্ট, ঘুমোবার জন্যে মায়ের খাটিয়া। রোদ্দুর উঠল তো বাইরে শুইয়ে দেওয়া হলো। চোখে রোদ্দুর পড়লে চোখ খারাপ হয়ে যাবে, সেটাকে গরীব মা বড়লোকের আদরের বাড়াবাড়ি বলে মনে করে। বড়লোক মা তার কালো কুচকুচে শিশুকে দুধে নাইয়ে কিংবা দুধে আটা সেনে শিশুর গায়ে মাখিয়ে গায়ের রঙ ফরসা করার চেষ্টা করে। আর এখানে তো শিশুকে সরষের তেল মাখানোটাও কালেভদ্রে জোটে। শিশুর কপালের আর গায়ের রোমের জন্যে বড়লোক মা খুব চিন্তিত হয়ে পড়ে, অলিভ তেল কিংবা সেইরকমই অন্য কোনো কোমল পদার্থ খুব আলতো হাতে শিশুর গায়ে মাখিয়ে মাখিয়ে ওগুলো তুলে ফেলার চেষ্টা করে। আর এদিকে নেমর মা উনুনের ছাই নিয়ে শিশুর গায়ে একটু জোরে জোরে রগড়ে দেয়, আর তিন মাস কাটতে না কাটতেই শিশুর সারা গায়ের রোম দূর হয়ে যায়। একদিন নেমর মা তার এক পড়শী ভদ্রমহিলাকে যখন এই গূঢ় রহস্যের কথা প্রকাশ করল, তখন সেই ভদ্র-মহিলার হৃদয় ভয়ে আশঙ্কায় কেঁপে উঠল।

ঘরে একদিকে ক্রমাগত নতুন নতুন মুখ আসতে থাকলে খরচ না বেড়ে কি যায়? নেমর মা তার স্বামীকে একটা ছাগলছানা কিনে আনতে বলল। যুদ্ধ শেষ হয়েছে, কিন্তু সমস্ত জিনিসপত্রের দাম চতুর্গুণ করে দিয়ে গেছে। কমলের বেতন হয়েছে বত্রিশ টাকা, দশ টাকা মহার্ঘ ভাতা পায়। কিন্তু এই বিয়াল্লিশ টাকার প্রকৃত মূল্য যুদ্ধের আগে চোদ্দ টাকার মতো ছিল। একটা ছোট মতো ছাগলের জন্যে কমলকে তার অর্ধেক বেতন দিতে হলো। ছাগলটা গাভিন ছিল। এসেই প্রথমবারে সে দুটো বাচ্চা দিলো, যা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। ছ'মাস পরে, সেই বছরই, ছাগলছানা দুটো বিক্রী করে সে ছাগলের দাম তুলে নিলো। নেমরও একটা খেলনা জুটে গেলো।

মধুপুরীর বাজার তিনটিকে বাদ দিলে বাকি অংশকে মহল্লা বলা ভুল, কারণ

জঙ্গলের ভেতরে দূরে দূরে তৈরি বাড়িঘর। পাঁচ বছর বয়স হতে না হতেই নেম ঐ এলাকায় একটা ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়াল। নিজে মারধোর খাওয়াটাকে গ্রাহ্য করে না, কিন্তু তার দ্বিগুণ বয়সের ছেলের গায়ে হাত চালিয়ে দেওয়া তার কাছে মামুলি ব্যাপার। হাত বাদ দিয়ে ইট-পাটকেলও ছোঁড়ে। কয়েকটি ছেলের মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে, সেজন্য তাকে ভয় পায় তারা। ছ' বছরের নেম আশপাশের বাংলোর-লোকজনের কাছ থেকে ট্যাক্স আদায় শুরু করে দিলো। যদি তাকে খাওয়ার জিনিস এটা-ওটা দেয়, তাহলে সম্পূর্ণ নিরাপদ, নইলে জানালার কাচ বাঁচানো মুশকিল। কমল আর তার স্ত্রী নেমকে কত মারধোর করে, কিন্তু তাতে কোনো ফল হয় না। ঘরে ছাগল পোষাটা নেমর উৎপাত বন্ধ করারই একটি প্রচেষ্টা, সেই সঙ্গে কিছু রোজগারপাতিও। মধুপুরীর এ-তল্লাটে ছোট ছোট দাঁতনকাঠি খোঁজার দরকার নেই। শুধু একটু মেহনত করলেই হলো, জঙ্গল থেকে মোটা মোটা ডাল কেটে আনো, আর ইচ্ছে করলে তার কিছু বিক্রীও করতে পারো। কমলের বিক্রী করার মতো কাঠ কেটে আনার ফুরসৎ খুব কম, কিন্তু শীতকালে ঘর গরম রাখার জন্যে যথেষ্ট কাঠ-কুটো মজুত রাখে, জ্বালানীর তো প্রশ্নই নেই। তিন চারটে ছাগল আর তাদের বাচ্চাকাচ্চাগুলোকে নিয়ে নেমকে জঙ্গলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, সেখানে সে অন্যান্য রাখালের সঙ্গে খেলায় মেতে থাকে। যখন সে আর একটু বড় হলো, তখন কমল একটা অল্প দামের বাছুরও কিনল। বছরে তিন চারটে করে ছাগল বিক্রী করা যায়, তাতে প্রায় শ'খানেক করে টাকা আসে। কমল কখনও কাউকে ছাগলের দুধ খেতে দেখেনি। নীচে থেকে আসা এক বাবু বললেন, ছাগলের দুধ না-কি শিশুদের পক্ষে খুব উপকারী। তবু নেমর মা-র কথাটা বিশ্বাস হয়নি। সে ভাবত, সম্ভবত ছাগলের দুধ খাওয়া ক্ষতিকর, তাই তাদের লোকজনের কাছে ওটা অখাদ্য। অবশ্য অতো কিছু ভাবার তার দরকারও নেই, কারণ বাচ্চাকে খাওয়ানোর জন্যে তার নিজের দুধই যথেষ্ট। যাই হোক, কমল আর তার স্ত্রী ছাগলের দুধ ব্যবহার করেনি। বাছুরটা বড় হয়ে গাভিন হলো, বাচ্চা হলো তার। গরুর দুধ খেতে তাদের আপত্তির কোনো কারণ নেই। কিন্তু পাহাড়ের গরুতে কতটুকুই বা দুধ দেয়? সন্ধ্যে পর্যন্ত যদি সের খানেক হলো, তাহলেই যথেষ্ট। ঘাস-বিচালির ভাবনা নেই, দিনের বেলা কখনো মা কখনো ছেলে গরু-ছাগল চরায়, তাতেই যথেষ্ট পেট ভরে যায় ওদের। শীতকালে ঘাস শুকিয়ে যায়, সহজে পাওয়া যায় না। তাই কমল বর্ষাকালেই প্রচুর ঘাস শুকিয়ে কাছাকাছি গাছে টাঙিয়ে রাখে। তাই গরুটা সব সময়েই মোটা-তাজা হয়ে থাকে।

সারোর পর থেকে প্রতি বছর ঘরে নতুন নতুন মুখ দেখা যায়। তৃতীয়টাও মেয়ে হলো, চতুর্থটাও তাই। একটি ছেলে তো রয়েছেই, কিন্তু মা-বাপের মন তাতে ভরে না। যদিও মেয়ের জন্যে যৌতুক-দানসামগ্রী দিতে উচ্ছন্নে যাওয়ার ভয় নেই, তবু আমাদের দেশে ছেলের প্রতি পক্ষপাতিত্ব সাধারণ ব্যাপার।

চার

মা-বাপ আর পাঁচটি ছেলেমেয়ে —সংসারে এখন এই সাতটি লোকের বোঝা। আর কমল মহার্ঘ ভাতা মিলিয়ে বেতন পায় মাত্র উনষাট টাকা, অর্থাৎ যুদ্ধের আগের পনেরো টাকা। অথচ চাকরি শুরু করার সময় সে পেত কুড়ি টাকা। সাতটি প্রাণীর একটি সংসার উনষাট টাকায় কি করে চলে, সেটা ভাবতে গিয়ে কোনো অর্থনীতিবিদ কিংবা মধ্যবিত্ত ব্যক্তিদের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। কিন্তু এর উত্তরটা খুব সরল। যদি মানুষকে সংসার চালানোর দায়িত্ব পালন না করতে হয়, ছেলেপিলেকে বছরের বেশির ভাগ সময় উলঙ্গ অবস্থায় রেখে দেওয়া হয়, শীতকালে মোটা ধোসা গায়ে জড়িয়ে কিংবা বিনা পয়সার কাঠ-কুটো জ্বেলে আগুন পুইয়ে দিন কাটানো হয়, মোটা ধোসাও কারোর কাছ থেকে চেয়ে-চিন্তে যোগাড় করে নেওয়া হয়, শুধু অসুখ-বিসুখে নয়, পেটের খিদেতেও যদি ভাগ্যের ওপর ভরসা করে থাকা হয়, তাহলে খুব সহজেই প্রশ্নের সমাধান হয়ে যায়। কমলের পারিবারিক জীবন অনেকটা এই রকমই। যদি পাড়া-পড়শীর বাড়িগুলোর বাবুরা প্রতি বছর আসা-যাওয়া করতেন, তাহলে এতগুলো ছেলেপিলে সত্ত্বেও তার স্ত্রী কাজ করে কিছু পয়সা, আর তার চেয়েও প্রয়োজনীয়, পুরনো শাড়ি-কাপড় পেয়ে যেত। কিন্তু যুদ্ধের শেষে, বিশেষ করে পাকিস্তান হওয়ার পর, মধুপুরীর দূর দূরাঞ্চলের বাড়িগুলি চিরকালের মতো খালি হয়ে গেছে, সুতরাং নেমর মা-র এভাবে কিছু বাড়তি টাকা-পয়সা রোজগার করার সম্ভাবনা নেই।

তাদের বেঁচে থাকাটা যে মানুষের মতো বেঁচে থাকা নয়, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু কমল আর তার স্ত্রী এমন অনেক পরিবারের কথা জানে, যারা তাদের চেয়েও দুঃখী। মানুষ তার নীচের স্তরের লোকজনকে দেখলে তৃপ্তি পায়, ওপরের স্তরের লোকজনকে দেখলে মনের মধ্যে অতৃপ্তি বা ঈর্ষা জন্মে। জীবন কোনোরকমে কেটে যাচ্ছে। উনষাট টাকার দাম খুব কম। সাতজনের সকলেরই রেশন-কার্ড রয়েছে, কারোর পুরো কারোর আধা। বেতনের তিন ভাগের দু'ভাগ রেশনেই চলে যায়। বাকি কুড়ি টাকায় কাপড়-চোপড় আর সংসারের যাবতীয় খরচ চলতে পারে না। গরু-ছাগল আর শাক-সব্জী থেকে পনেরো-ষোলো টাকা আসে, তাতে সংসারের বড় সুরাহা হয়। প্রথমে যে দুটো ঘর নিয়ে কমল বাস করতে শুরু করেছিল, তাতে আরও একটা কুঠরি যোগ হয়েছে। কোথা থেকে কার কাছে পুরনো টিন চেয়ে এনে একপাশে একটু বেড়া দিয়ে চাল নামিয়ে নিয়েছে, সেখানে রান্নাবান্না চলে। দুটো ঘরের একটাতে পরিবারের সবাই মিলে থাকে, অন্যটা গরু-ছাগলের জন্যে ছেড়ে দিতে হয়েছে। এ-অঞ্চলে রোজই রাতে নেকড়ে ঘোরা-ফেরা করে, তাই গরু-ছাগল ঘরে না রাখলে নিরাপদ নয়? কমলের জমিতে বারোমাসই কিছু-না-কিছু

ফসল থাকে। টাকা-পয়সা জমানোর প্রশ্ন নেই, যা হাতে আসে তাতেই যদি সংসার চলে যায়, তাহলেই খুব। নেম এখন স্কুলে যেতে শুরু করেছে। মধুপুরীতে শিক্ষা বাধ্যতামূলক। তাছাড়া নিরক্ষর কমলও বিদ্যার মূল্য বোঝে। সে যদি দু'অক্ষর জানত, তাহলে এতদিনে সে অবশ্যই প্রথম শ্রেণীর লাইনম্যান হয়ে যেত। ধোসা গায়ে দিয়ে ছেলেকে স্কুলে পাঠাতে পারে না সে। তাই কাপড়ওয়ালার কাছ থেকে না কোত্থেকে সস্তা কাপড়ের প্যান্ট-জামা এনে দিলো ছেলেকে। সেই ধরনেরই একটা টুপি উঠল নেমর মাথায়। নেমর মতো ছেলেপিলেদের কাছে জুতো পরা হলো শখের ব্যাপার—তা সে তুষারপাতই হোক আর তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নীচেই নেমে যাক, পা দুটো ঢাকার প্রয়োজন নেই তার।

পাঁচ

সেবার দ্বিতীয় সীজনটাও শেষ হতে চলেছে, বহু শৈলবিহারী মধুপুরী ছেড়ে চলে গেছে। অক্টোবরের শেষাশেষি। নামমাত্র ঠাণ্ডা রয়েছে। কমলের পেট-ব্যথা শুরু হলো। এমনিতে সকাল-সন্ধ্যে কমলের সঙ্গে সকলের দেখা হয়ে যায়, কিন্তু তিন দিন ধরে তাকে দেখতে না পেয়ে পড়শীরা খোঁজ-খবর নিলো। জানা গেলো, কমল অসুস্থ, বেশ ভালোরকম অসুস্থ। পেটে মিষ্টি-মিষ্টি ব্যথা আর সেই সঙ্গে একটু একটু জ্বর শুরু হয়। কমল গ্রাহ্য করেনি। তৃতীয় দিনে সে বেশ কিছুক্ষণের জন্যে বেহুঁশ হয়ে যায়। তখন তাকে ডুলিতে চাপিয়ে হাসপাতাল পাঠানো হলো। ডাক্তার বললেন, নিউমোনিয়া। বেশ আশঙ্কাজনক অবস্থা। নিউমোনিয়া কথাটি তার স্ত্রীর বোধগম্যই হলো না, অবশ্য সেটা তার পক্ষে মঙ্গলই বলা যেতে পারে। কিন্তু অসুখটা যে মারাত্মক, সেটা সে এক-আধটু বুঝতে পারল। যদি কমলের কিছু হয়ে যায়, তাহলে পাঁচটি ছেলেমেয়ে নিয়ে সে কার দরজায় দরজায় ঘুরে বেড়াবে? এত মেহনত করে দুজনে মিলে যে ঘরখানা আর জমিটুকু তৈরি করেছে, সেখানে তো মিউনিসিপ্যালিটি থাকতে দেবে না! তার ছেলেপিলেরা কি পথের ভিখিরী হয়ে যাবে! তার আশঙ্কা শুধু স্বকপোলকল্পিত নয়। ভাবাবেগে তার চোখ দুটো জলে ভরে ওঠেনি। দুঃখের জীবন তাদের, সে-দুঃখের গভীরতা মেয়েটি বুঝত না, কিন্তু ছেলেপিলেরা একমুঠো খাবারের জন্যে ছটফট করে মরবে, সেটা তার কাছে আরও দুঃখের। তিন মাইল দূরে হাসপাতাল। চারটি ছেলে-মেয়েকে বাড়িতে রেখে সেখানে যাওয়া রীতিমত অসুবিধেজনক—পঞ্চম শিশুটি তখনও ভূমিষ্ঠ হয়নি। সবচেয়ে ছোট মেয়েটি কয়েক মাসের, কেবল বসতে শিখেছে। স্বামী—তার জীবনের একমাত্র নির্ভর কমল—তাকে দেখতে যাওয়া খুবই দরকার। নেমর ওপর তিনটি বাচ্চাকে ছেড়ে দিয়ে সে চলে যায়। কিন্তু নেম কি চুপচাপ বসে থাকতে পারে? সে অন্য ছেলেদের সঙ্গে খেলতে চলে যায়,

আবার কখনো কখনো সারো (সরস্বতী)-কেও সঙ্গে নিয়ে। ছোট শিশুটি খাটিয়ায় শুয়ে থাকে। গরীবের ছেলে খুব কাঁদতে জানে না, কান্না শোনার যদি অবকাশই না থাকে, তাহলে মা-বাপ সেদিকে মনোযোগ দেবে কেন? খিদে পেলে কিংবা অন্য কারণে হয়ত একটু কাঁদে, তারপর ঘুমিয়ে পড়ে। নেমর মা তার ছেলেমেয়েগুলোর জন্যে তাড়াতাড়ি ফিরতে চায়, কিন্তু ছ' মাইল পথ হাঁটতে সময় লাগে, আধ ঘণ্টা পৌনে এক ঘণ্টা কমলের খাটের পাশে বসতেও হয়। কখনো কখনো সন্ধ্যেবেলা নীচে থেকে বাড়িতে যাওয়ার পথটায় মেজ মেয়েটিকে একা একা বসে থাকতে দেখা যায়। ঐ অবস্থায় মেয়েটিকে দেখলে যে কোনো সহৃদয় ব্যক্তির মন করুণার্দ্র হয়ে ওঠে। সন্ধ্যেবেলা, আশপাশে কোনো লোক নেই, নুড়ি-কাঁকরে ভর্তি রাস্তায় দেড় বছরের ঐ মেয়ে ছেঁড়া-ফাটা জামা-কাপড় পরে বসে বসে ঠাণ্ডা ভোগ করে। এমন একটা সময়, যখন নেকড়েরা এ-তল্লাটে আকছার ঘোরা-ফেরা করে। যদিও মধুপুরীতে আজ পর্যন্ত কোনো নেকড়ে মানব সন্তানের ওপর কখনও আক্রমণ করেনি, কিন্তু এ রকম একটি ছোট্ট মেয়েকে একা পেলে ছেড়ে দেবে, সে-আশা খুব কম।

তিন দিন ধরে হাসপাতালে কমল জীবন-মৃত্যুর মাঝখানে ঝুলে রইল। চতুর্থ দিন স্বামীকে দেখে নেমর মা যখন বাড়ি ফিরল, তখন তার মুখ দেখে বোঝা গেলো, নৈরাশ্যের ভাব একটু কেটেছে। কয়েকদিন পর কমল হাসপাতাল থেকে ফিরে এলো। অসুখ সেরেছে, কিন্তু তখনও বড় দুর্বল। ডাক্তার বলেছেন, মাংসের ঝোল খাওয়া দরকার। অথচ, মাংস আড়াই টাকা সের। তবুও তার স্ত্রী কোনোরকমে দু-চারদিন একটু একটু করে মাংসের ঝোল খাওয়ালো। আরও দশ দিন ঘরে বসে থাকতে হলো কমলকে। তখনও গায়ে পুরোপুরি বল আসেনি, কিন্তু অতো দিনের জন্যে ছুটি পাওয়া সম্ভব নয়। কমল আবার কাজে যেতে শুরু করল।

ছয়

জীবন-রথের চাকা আবার গড়িয়ে চলতে শুরু করল আগের মতোই। অভাব তো জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, তবুও কালরাত্রির অবসান হয়েছে। সে-ও প্রায় আট মাস হয়ে গেলো। তারপর সাত বছরের সারো অসুখে পড়ল, পরদিনই দেখা গেলো, সে হাত-পা নড়াতে পারছে না, পক্ষাঘাতে অসাড় হয়ে গেছে। মারা যাওয়ার ভয় নেই, কিন্তু মেয়েকে বিয়ে করবে কে? চিরকাল কি তার বোঝা বয়ে বেড়াতে হবে কমলকে? সে মেয়েকে কোলে নিয়ে আবার হাসপাতালে গেলো! ডাক্তার বললেন, পোলিও, এর কোনো ওষুধ নেই, নিয়ে যাও। বড় ডাক্তারই যখন এ-কথা বললেন, তখন মা-বাপের কি আর কোনো আশা থাকতে

পারে ? সেই মাংসপিণ্ডকে তুলে নিয়ে কমল আবার বাড়ি ফিরে এলো। সারো খাটিয়ায় পড়ে থাকে। কেউ খাইয়ে দিলে খায়। পেচ্ছাব-পায়খানার জন্তেও অন্তকে সাহায্য করতে হয়। হাসপাতালের ডাক্তার তো নিরাশ করে ফিরিয়ে দিয়েছেন, তবু এদিকে যে যা ওষুধ বাতলায়, তাই করে। এক মাসেও যখন অসুখের একটুও হের-ফের হলো না, তখন তাদের বিশ্বাস দৃঢ়মূল হলো যে ডাক্তারের কথাই সত্যি। এই সময় এক অভিজ্ঞ বৈদ্য তাঁর বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে এলেন তাদের পাড়ায়। বন্ধুর কাছে সব শুনে তিনি মেয়েটিকে দেখতে এলেন। ভয়ঙ্কর পোলিও-তে সে আক্রান্ত হয়নি। বৈদ্য মশাই স্পষ্ট ভাষায় বেশ জোর দিয়ে বললেন —পক্ষাঘাতটা অল্প দিনের। ওষুধপত্রে কাজ হবে না। একটা তেল বলে দিচ্ছি, তাই দিয়ে মালিশ করো। তেল তৈরি করার পদ্ধতিটা বলে দিলেন তিনি। সেটা তৈরি করতে দশ-বারো আনার বেশি খরচ পড়ল না। মা-বাপ সকাল-সন্ধ্যে সেই তেল দিয়ে মেয়েকে মালিশ করে। এক মাসে সে হাত নাড়াতে সক্ষম হলো, আর এক মাস পর সে খাটিয়া ধরে দাঁড়াতে শুরু করল। তিন-চার মাসের মধ্যেই কারোর সাহায্য না নিয়ে নিজের শক্তিতেই সে আবার চলা-ফেরা করতে লাগল, নিজের হাতে খেতে লাগল। প্রথম যেদিন সে উঠে নিজে নিজেই কাছাকাছি একটা পাথরের ওপর গিয়ে বসল, সেদিন শুধু বাপ-মায়ের নয়, সারা পাড়া-পড়শীর মনও খুশিতে ভরে উঠল। বেচারী মেয়েটির জীবন রক্ষা পেল।

জীবনটাকে আবার সুখের বলে মনে হতে লাগল কমলের। দুঃখ-চিন্তার অভাব নেই, ওটাকে তো তারা সুখ বলেই ভাবে। এক বছরের মধ্যেই কমল মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছে, মেয়েটি জ্যান্ত তালগোল পাকানো মাংসপিণ্ড থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে! এ-পর্যন্ত যেসব মারাত্মক আপদ-বিপদ তাদের ওপর এসে পড়েছিল, তাতে মানুষের কোনো হাত ছিল না। অথচ এবার মানুষ তাদের ওপর আঘাত হানল। কমলের এই জীবন-যাপন নিশ্চয়ই কারোর পছন্দ হয়নি, সে অফিসারের কাছে নিবেদন করল, 'অনেক বছর হলো, কমল এক জায়গাতেই রয়েছে। ওকে বদলি করা উচিত।' কথাটা মনে ধরল অফিসারের। তিনি তাকে মধুপুরীতে নয়, বিদ্যুৎ-ব্যবস্থা রয়েছে এমনি একটা কাছের শহরে বদলি করে দিলেন। সেদিন অফিসে যেই খবরটা শুনল কমল, অমনি মনের মধ্যে একটা প্রচণ্ড ধাক্কা খেল সে। এখন ঐ কুঁড়ে ঘরটাতে শুধু তার পা দু'খানাই নয়, তার সংসারের বারোটি পা আটকে গেছে —চার-পাঁচ মাস আগে কমলের পঞ্চম সন্তান —একটি পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়েছে। এখন সেখান থেকে তাদের সবাইকে উচ্ছেদ হতে হলে কি অবস্থা দাঁড়াবে তার ? নীচের শহরে শাক-সব্জী লাগানোর জমি পাওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়, গরু-ছাগলও পুষতে পারবে না সেখানে। উনবাট টাকা মাইনেতে সাতটি প্রাণীর খরচ কি করে চলবে ? কাঠ-কুটোও সেখানে বেশ চড়া দামে কিনতে হবে। ইন্দ্রের ঐশ্বর্য দেখে ঈর্ষা বোধ করে, সেটা কোনো ব্যাপার নয়। কিন্তু

কমলের কি এমন ঐশ্বর্য আছে, যা মানুষে দেখতে পারে না! কি করবে না করবে, কিছুই বুঝে উঠতে পারছিল না সে। অফিসে কাকুতি-মিনতি করেও কোনো ফল হলো না। সে তার পাড়ার বাবুকে তার দুঃখের কথা শোনালো। এর পেছনে যে নৃশংস, পাশবিক মনোভাব কাজ করছে, সেটা বুঝতে পারলেন তিনি। সাত সাতটি প্রাণীর সঙ্গে এরূপ আচরণ ঘোর অন্যায়। কমল অদৃষ্টে বিশ্বাসী, তবুও সে বলল —'নীচের শহরে খুব গরম। আমার ছেলেপিলেরা মধুপুরীর ঠাণ্ডা জায়গাতেই বরাবর থেকেছে। ওদের 'লু' লেগে যাবে।' দরিদ্র ব্যক্তি ছেলেপিলেকে কত ভালোবাসে? নিজের জীবনের চেয়েও তাদের জীবনকে প্রিয়তর বলে ভাবে সে। মধুপুরীর মিউনিসিপ্যালিটির কর্মচারীদের সঙ্গে বাবুর কম-বেশি পরিচয় ছিল। তিনি কমলের হাত দিয়েই চিঠি লিখে পাঠালেন। কমল তার অফিসের সবচেয়ে বড় অফিসারের কাছে চিঠিখানা নিয়ে গেলো খুব আশায় আশায়। পড়শীরাও কমলের পরিবারের করুণ অবস্থার কথা সংক্ষেপে লিখে দিয়েছিল। কিন্তু কোনো ফল হলো না।

কমলকে অন্য শহরে অবিলম্বে কাজে যোগ দেওয়ার হুকুম হয়েছিল। তার পরিবারটি ঐ কোয়ার্টারে আরও এক মাস থাকার সুযোগ পেল, যেহেতু ওটার কোনো দরকার ছিল না মিউনিসিপ্যালিটির। চল্লিশ টাকার ছাগল সে কুড়ি টাকায় বেচে দিলো। ছাগলটা গাভিন ছিল, কমলের সংসার গুটিয়ে নিয়ে চলে যাওয়ার আগেই নতুন মালিকের ঘরে তার তিনটি বাচ্চা হলো। গরুটা বিক্রী করেও দাম পাওয়া গেলো তিন ভাগের এক ভাগ। এতদিন ধরে এই ঘরে বাস করতে করতে ছোট-বড় বহু আসবাবপত্র জমে উঠেছিল, জ্বালানীর কাঠ ছিল, ঘাস-বিচালি ছিল। কাঠ বিক্রী করে বারো টাকা হাতে এলো। কিন্তু আরও বহু জিনিস রইল, যা তাদের কাছে খুবই মূল্যবান, অথচ অন্যের কাছে তার কানা-কড়িও দাম নেই। চারটি রবিবারের প্রত্যেক রবিবারই কমল এখানে আসে, আর নিজের বাসা নিজের হাতেই ভেঙে তচ্‌নচ করে। তারপর একদিন সাতটি প্রাণী তাদের কুঁড়েঘরটির দিকে নিরাশ দৃষ্টিতে চেয়ে দেখতে দেখতে চলে গেলো। আজও সেই বাড়ি রয়েছে, সেটার দিকে তাকালে কমলের জীবনের সমস্ত কাহিনী ছবির মতো চোখের সামনে ভেসে ওঠে, এক অজানা বোঝায় হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়।

ডোরা

"মেয়েটারও অসুখ। ঘরে খাবার বলতেও কিছু নেই। তুমিও আমায় বকছ মা!' —অকালবার্ধক্যে জীর্ণ একটি স্ত্রীলোক কাঁদতে কাঁদতে করুণ কণ্ঠে কথাগুলি বলল। শুনে মনে হয়, দুঃখসমুদ্রে আকণ্ঠ ডুবে আছে সে।

'সেদিন তেল আনলে, এর মধ্যেই ফুরিয়ে গেলো?' —কথার মাঝখানে অন্য এক সম্পর্কিত ব্যক্তি বলল।

'মাপ করো।' —ভেজা ভেজা চোখ দুটি আর একদিকে সরিয়ে নিয়ে জবাব দিলো সে। ঠিক সেই সময় তার কঙ্কালসার তৃতীয় মেয়েটিকে হাসপাতাল থেকে নিয়ে আসছিল এক বন্ধু।

আঠাশ-ঊনত্রিশ বছর আগেকার কথা। বছরের হিসেবে হয়ত সময়ের ব্যবধান ততোটা বোঝা যাবে না, কিন্তু অন্নচিন্তা এবং অন্যান্য ব্যাপারে তখন থেকে যেন এক মহাকাল কেটে গেছে। গোপালু মধুপুরীর একজন খুব চৌকস খানসামা এবং পাচক ছিল। ঐ সুবাদেই সে মধুপুরীতে শুধুমাত্র ইংরেজদেরই যে ক্লাবটি, সেই ক্লাবটি থেকে পঞ্চাশ টাকা করে মাইনে পেত। হ্যাঁ, পঞ্চাশ টাকা। অর্থাৎ আজকের সওয়া একশো টাকা। তার ওপর প্রত্যেক খদ্দের-অতিথি কিছু টিপ্ (বকশিস)-ও দিত। মাংসের যোগানদার যদি গোপালুকে কিছু না খাওয়াত, তাহলে গোপালু তার মাংস ভালো নয় বলে অন্য যোগানদার লাগিয়ে দিতে পারত —ক্লাবে রোজ দুটো খাসির চাহিদা। সব্জীওয়ালার পক্ষেও ক্লাবের বড় খানসামার কাছে মিষ্টি কথায় চিঁড়ে ভেজানো সম্ভব ছিল না। তাছাড়া মদ, চাটনি, টিনের মাংস ইত্যাদি যেসব জিনিস ক্লাবের ভোজনশালায় যেত, সেগুলোকে ভোজনশালা থেকে বের করে নিয়ে যাওয়ার মালিকও ছিল গোপালু। সে কিন্তু চোরও নয়, মিথ্যেবাদীও নয়। সে-সময় পাহাড়ী লোকেরা আজকের চেয়েও অনেক বেশি ইমানদার হতো। কিন্তু সব জায়গাতেই খানসামাদের দস্তুরি বাঁধা থাকে, সেটা নেওয়াতে কোনো দোষ আছে বলে মনে করে না তারা। ক্লাবের ম্যানেজার অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সাহেবেরও তাতে কোনো আপত্তি ছিল না। তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা অনুসারে বেতনের অতিরিক্ত রোজগার অবৈধ হতে পারে, কিন্তু সেটা তো দস্তুরির মধ্যেই পড়ে। আর তাছাড়া ওটা শুধু আল্‌স ক্লাবেরই ব্যাপার নয়, সারা মধুপুরীতে এই নিয়মই চলে আসছে।

গোপালু বকের পালকের মতো সাদা ধবধবে পোশাক পরে থাকত। ছোট

আর বড় দুটি সীজনের সময় মধুপুরীতে ততো ঠাণ্ডা থাকে না। বর্ষায় কখনো যদি প্রচণ্ড বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে জোর হাওয়া চলতে থাকে, তাহলে অবশ্য পৌষ-মাঘের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, কিন্তু সেজন্যে শীতের গরম পোশাক তো গোপালুর ছিলই। অন্যান্য হোটেল, ক্লাব, দোকানের মতো আল্স্‌ ক্লাবেরও কারবার মে থেকে অক্টোবর পর্যন্তই কম বেশি চলে। তারপর শৈলবিহারীদের সঙ্গে সঙ্গে চাকর-বাকরেরাও বিদায় নিতে থাকে, অধিকাংশ দোকানের তালায় কাপড় জড়িয়ে সীল-ছাপ মেরে দেওয়া হয়। কিন্তু আল্স্‌ ক্লাবের মতো জায়গাগুলোতে ঘরদোর এবং আসবাবপত্রের দেখাশোনার জন্যে একজন দারোয়ান ছাড়াও গোপালুর মতো একজনকে বারোমাস থাকতে হয়। দরকার পড়লে তারা মজুর লাগিয়ে ছোট-বড় মেরামতির কাজও করিয়ে নেয়। এমনিতে মধুপুরীতে বাড়িঘরের কোনো নতুন কাজকর্ম সাধারণত শীতকালেই করা হয়। প্রায় সবই ভাড়াটে বাড়ি, মেরামতির দায়িত্বটা বাড়ির মালিকেরই। ফার্নিচার, পর্দা, পার্টিশন ইত্যাদি কোনো নতুন কাজ করতে হলে তার জন্যে ম্যানেজার এপ্রিলেই এখানে এসে হাজির হন। ছ'মাসের জন্যে নির্জন আল্স্‌ ক্লাবের ম্যানেজার গোপালু। সে-সময়টা তাকে তার বাঁধা মাইনেতেই কাটাতে হতো। তখন ইংরেজের দাপট, মধুপুরী ষোলো আনা তাদেরই শহর। ক্লাবে উঠতে হলে অতিথিকে তিন-চার মাস আগেই জায়গা রিজার্ভ করে নিতে হতো, নইলে ঘর পাওয়া মুশকিল হতো। এমনকি, অর্ধেক অতিথি আগের বছরই অ্যাডভান্স দিয়ে যেত।

গোপালু পাহাড়ী রাজপুত। তার কাছে ক-অক্ষর গোমাংস বরাবর, কারণ বড় কষ্টে সে হিন্দীতে নিজের নামটা সই করতে পারত। তার ফরসা সুন্দর চেহারা, ছিপছিপে শরীরে নতুনের মতো ঝকঝকে পোশাক দেখে কারোর বলার সাধ্য ছিল না যে সে শিক্ষিত নয়। ছোটবেলাতেই এসে সে এই ক্লাবে কাজ করতে শুরু করে। প্রথম মহাযুদ্ধের কথাও মনে পড়ে তার, যুদ্ধ শেষ হতে না হতেই তার গোঁফের রেখা দেখা দেয়। শৈশব থেকেই মধুপুরীর উচ্চ সমাজের সংস্পর্শে থাকার দরুণ সে তারই একটা অঙ্গ হয়ে পড়ে। সব সমাজেই ভৃত্যেরা সাধারণত এই রকমই হয়। এখানে থাকতে থাকতে ঐ হোটেলটিরই বড় খানসামার বাড়ির সঙ্গে তার পরিচয় নিবিড় হলো। সে-বাড়িতে এক যুবতী মেয়ে ছিল। গোপালু হিন্দু, আর সেই খানসামা খ্রীষ্টান। তা সে-ও পাহাড়ী। অবশেষে বড় খানসামার মেয়েকে বিয়ে করার জন্যে গোপালুও খ্রীষ্টান হয়ে গেলো। গোপালুর নাম গোপালুই রইল। শ্বশুর-শাশুড়ীর একটাই মেয়ে। তখন শ্বশুরের শুধু ধ্যান-জ্ঞান, গোপালু যাতে তার কাজটা পায়। সে সাহেবদের খাবারগুলো একটি একটি করে শিখিয়ে দিয়ে গোপালুকে বেশ পটু করে তুলল। দু-তিন বছর পরে শ্বশুরের সহকারী খানসামা হয়ে গেলো সে। তিন-চার বছর পর শ্বশুর চলে গেলো। শাশুড়ী আরও অনেকদিন বেঁচে ছিল। গোপালু এখন আল্স্‌ ক্লাবের বড় খানসামা।

তার একটি মেয়ে। আরও ছেলেপিলে হয়েছিল, কিন্তু বাঁচেনি। প্রথম সন্তান বলে মা-বাপ দু'জনেই মেয়েটিকে দারুণ ভালোবাসে। গোপালু আর তার বউ এক সঙ্গে তাদের মেয়েটিকে নিয়ে একদিন গীর্জায় গিয়েছিল। সম্ভবত পাদরীর মেমসাহেবের নাম ছিল ডরোথি, মেয়েটিরও সেই নাম দিয়েছিলেন তিনি। অথচ এদেশী লোকজনের কাছে ও নামের কোনো অর্থ আছে বলেই মনে হয় না। পাদরী হয়ত কখনো আদর করে তাঁর মেমসাহেবকে ডোরা নামে ডেকে ফেলেন, আর তাই মেয়েটির নামও হয়ে যায় ডোরা। তাগা অর্থে ডোর শব্দ থেকেই ডোরা হয়েছে বলে লোকে ভাবে।

দুই

ডোরা ঘরের একমাত্র সন্তান। মা-বাপ আর দিদিমা তাকে ফুলের মতো চোখে চোখে রাখতে চায়। ফুলের মতো দেখতে সে। মা-বাপ দু'জনেই বিশুদ্ধ খস্ (গড়ওয়ালের প্রাচীন নাম, ঐ অঞ্চলের অধিবাসীরাও 'খস্' নামে পরিচিত —অনুবাদক) রক্তের হওয়ার ফলে তার গায়ের রঙ দারুণ ফরসা, টিকোলো নাক, লম্বাটে মাথা, আর মুখখানা যথার্থই সুন্দর। ইদানীং ক্লাবের বড় খানসামার ঘরে লক্ষ্মী যেন আসন পেতেছেন। সীজনে খেয়ে-পরেও হাজার টাকার ওপর বেঁচে যায়। শীতকালেও পুরো মাইনেটা হাতে আসে। খুব সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে সে ডোরাকে মানুষ করে। পাঁচ-ছ' বছরের হলে পাদরী সাহেব মেয়েটিকে লেখাপড়া শেখানোর জন্যে খুব আগ্রহী হয়ে উঠলেন। গোপালু তাকে পাদরী সাহেবের এক স্কুলে ভর্তি করে দিলো। এই মধুপুরীতে তিন বছর বয়স থেকে বেশি বয়সের ইংরেজ ছেলেমেয়েদের জন্যে বহু কনভেন্ট আর স্কুল রয়েছে, সারা দেশের ছেলেমেয়ে সে-সব স্কুলে থেকে পড়াশোনা করে। শুধু শ্বেতাঙ্গ সাহেবদের ছেলেমেয়েরাই পড়ে, তা নয়। মোটা রকম খরচপত্রের বিনিময়ে আজকাল কালো চামড়ার সাহেবরাও তাদের ছেলেমেয়েদের এসব স্কুলে পাঠানোর স্বীকৃতি পেয়েছে, তাই তাদের ছেলেমেয়েরাও এসব কনভেন্ট আর স্কুলে পড়াশোনা করে, তাদের অধিকাংশই খ্রীষ্টান নয়। অথচ খ্রীষ্টান হওয়া সত্ত্বেও গোপালুর পরিবার ভদ্রলোকের সমাজে মিশে যেতে পারেনি। কি করে তা সম্ভব! সে খানসামা, খানসামার মতোই রোজগার, সেই সঙ্গে খানসামাগিরি ছাড়া আর কোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষাও নেই তার। হতে-পারে, ডোরার জায়গায় যদি কোনো ছেলে হতো, তাহলে তাকে পড়াবার জন্যে গোপালু আরও বেশি মনোযোগ দিত। যাই হোক, সে তার মেয়েকে পড়াশোনার জন্যে খ্রীষ্টানদের একটা ছোট্ট স্কুলে ঢুকিয়ে দিলো কিন্তু ঘরে না আছে লেখাপড়ার পরিবেশ না ডোরা তেমন বাধ্য মেয়ে। মা আর দিদিমা তো নিতান্ত মন বেজার করে তাকে স্কুলে পাঠায়। ডোরা প্রথম বছরটা বেশ গেলো, তারপর দু'দিন স্কুলে যায় তো তিনদিন পাড়ার

মেয়েদের সঙ্গে খেলে বেড়ায়। দশ বছরের হতে না হতেই বোঝা গেলো, তার পড়বার ইচ্ছেও নেই, তার প্রয়োজনও নেই। মা-বাপ আর বুড়ো দিদিমা প্রত্যেক রবিবার গীর্জায় যায়। মধুপুরীতে ঈশ্বরের ঘরেও বর্ণভেদ রয়েছে —কত রাস্তাই তো ভারতীয়দের জন্যে এক রকম বন্ধ। কোনো কৃষ্ণাঙ্গ সাহেবও যদি সেদিক মাড়ায়, তাকে ঠোকর খেতে হবে, গালিগালাজ শুনতে হবে। রাস্তা, হোটেল আর ক্লাবে বর্ণভেদ চালু আছে —কোনো ভারতীয় আল্‌প্‌স ক্লাবের মেম্বার হতে পারে না, সেখানে এসে ওঠার জায়গা পাওয়াও সম্ভব নয় তার পক্ষে। এখানকার ভারতীয় খ্রীষ্টান বলতে ঐ বেয়ারা-খানসামারা। আর রয়েছে কিছু অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান, তাদের গায়ের রঙ যদি শ্বেতাঙ্গদের কাছাকাছি হয়, তাহলে তারা গীর্জার উপাসনায় তাদের সঙ্গে সামিল হতে পারে। রঙের বাধা ছাড়াও বাধা রয়েছে ভাষারও। ইংরেজের ভগবান শুধু ইংরেজি ভাষাতেই প্রার্থনা-সঙ্গীত বুঝতে পারেন, কৃষ্ণাঙ্গদের ভগবান কৃষ্ণাঙ্গদের ভাষাতেই। তাই ডোরার বাপের মতো খ্রীষ্টানরা যেসব গীর্জায় হিন্দীতে উপাসনা-প্রার্থনা হয় সে-সব গীর্জায় যায়। এ রকম গীর্জা একটি কি দুটি। যার মনে প্রচণ্ড ভক্তি, কেবল সেই মধুপুরীর এ-মুড়ো ও-মুড়ো থেকে প্রত্যেক রবিবার ঐ গীর্জাগুলোয় যেতে পারে। কিন্তু, গোপালুর ক্লাব এ রকম একটি গীর্জা থেকে দূরে নয়, আর বলা যেতে পারে, তার পরিবারে ভক্তিও যথেষ্ট তাই প্রত্যেক রবিবার তারা সেখানে হাজিরা দেয়।

ডোরা স্কুলে যেতে যতই কুণ্ঠিত হোক, রবিবারে গীর্জায় যাওয়ার সময় সে লাফ দিয়ে ওঠে। সেদিন তার বিশেষ পোশাক, চুল আঁচড়ে তাতে লাল ফিতে বেঁধে দেওয়া হয়, মুখে-হাতে পাউডার মাখানো হয়, পায়ের নতুন জুতো, কেবল ঐ রবিবারেই তা ব্যবহার করা হয়। তার মা-দিদিমার চাল-চলনে খুব একটা আধুনিকতা নেই, ক্লাবে যেসব মহিলারা এসে ওঠে, তাদের নকল সাজসজ্জাও খুব কাছে থেকে দেখার সুযোগ হয় না ওদের। মেমসাহেবদের ছেলেমেয়েদের জন্যে আয়ার দরকার হয়, কিন্তু তারা এমন আয়া রাখতে চায় যেন সে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ইংরেজিতেই কথা বলতে পারে। সুকুমার-মতি শিশুরা যাতে কালা আদমিদের কথাবার্তা এবং চাল-চলন শিখে না ফেলে, তার জন্যেই এই ব্যবস্থা। আয়ারা অধিকাংশই কৃষ্ণাঙ্গিনী, অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান আয়াকে মাইনে বেশি দিতে হয়, তাই বড় বড় সাহেবরাই শুধু ও রকম আয়া রাখতে সাহস পায়। অবশ্য নিজের স্ত্রীকে আয়া করার ইচ্ছে গোপালুর নেই। আশপাশের অন্যান্য মেয়েরা যেমন সাজগোজ করে গীর্জায় যায়, গোপালুও তেমনি ডোরাকে গোলাপী ফ্রক পরিয়ে এটা-ওটা দিয়ে সাজিয়ে গীর্জায় নিয়ে যায়। ডোরা তার পাহাড়ী পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে মধুর কণ্ঠ পেয়েছে। খ্রীষ্টান ধর্মে দীক্ষা দেন যেসব বড় বড় পাদরীরা, তাঁরা সবাই শ্বেতাঙ্গ, কৃষ্ণাঙ্গদের সঙ্গীত তাঁদের ভালো লাগে না। নামটাই পছন্দ হয় না ওঁদের। তৎকালীন পাদরী সাহেবের উদারতাই বলতে

হবে যে তিনি গোপালুর নাম বদলে ডেভিড কিংবা জেমস্ রেখে দেননি, গোপালসিং হয়েই থেকে গেছে সে। গীর্জার গান তো 'যীশুখ্রীষ্ট আমায় প্রাণদান করেছেন,' কিন্তু তা এমনভাবে গাওয়া হয় যে সাধারণ ভারতীয়দের পক্ষে বুঝে ওঠাই দুষ্কর যে সেটা তাদের নিজেদের ভাষায় গাওয়া হচ্ছে কি-না। পাদরীর মেমসাহেব উপাসনার প্রধান ভূমিকায় এগিয়ে আসেন, গীর্জার পিয়ানো ঠিক করে দেওয়া হয় তাঁকে, কারণ ওটা তাঁর চিরকালই আয়ত্তের বাইরে, তারপরই শুরু হয় 'যীশুখ্রীষ্ট আমায় প্রাণদান করেছেন'—ইংরাজি গান যেমন হয়, ঠিক সেই সুরে। ডোরা মধুর কণ্ঠে বিলাতী সুরে খুব মন দিয়ে সেটা গায়। গীর্জায় যারা যায়, তারা সবাই তার গানের তারিফ করে। অর্থাৎ প্রকারান্তরে বলা হয়, ভারতীয় ভাষার গানের বেশ ভালোই শ্রাদ্ধ হচ্ছে, কিংবা ভারতীয় সঙ্গীতের যথেষ্ট অপমান করা হচ্ছে।

তিন

ডোরা পনেরো ছাড়িয়ে ষোলোতে পা দিলো। রঙে চেহারায় দু'দিক দিয়েই সে সুন্দরী। তাছাড়া ঐ বয়সের জন্যে পণ্ডিতেরাই বলেছেন, 'ষোলো বছরের যুবতী, গর্দভী হলেও সুন্দরী।'

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর তৃতীয় বছর চলছে। যুদ্ধ প্রাণভরে মধুপুরীকে গুলজার করে তুলেছে। সাধারণ মানুষ হিসেবে ইংরেজরা তো আসেই, এখন বেশ ভালো সংখ্যক যুদ্ধের সৈন্যও এখানে রয়েছে, আবার তাদের অনেকেই বারো-মাসের অতিথি। মধুপুরীর ভাগ্যের সঙ্গে বাঁধা রয়েছে আল্পস ক্লাবের ভাগ্যও। অতএব গোপালুর আমদানিও বেড়েছে খুব। গোপালুর পরিবার বড় সুখেই দিন কাটাচ্ছে। বারো বছর পেরোতেই গোপালু তার মেয়ের স্কুল যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল। চার-পাঁচ বছরে সে কষ্টে-সৃষ্টে তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত উঠেছিল। তার লেখাপড়ার ইচ্ছে ছিল না আদৌ। দিদিমা বেচারী চার বছর আগেই মারা গেছে। মা-বাপ ভেবে দেখল, চিরকাল এমনি নির্ভাবনায় সুখে জীবন কাটবে তাদের, অতএব মেয়েটিকে বেশি পড়িয়ে লাভ কি?

গোপালু খ্রীষ্টান হয়েছে, কিন্তু সে পুরনো সংস্কারেরই বশীভূত। কেউ তাকে ছোট জাত বলে ফেললে মারামারি করার জন্যে সে এক পায়ে খাড়া। সে যেন তার জাত-পাত সঙ্গে নিয়েই জন্মেছে। যুদ্ধের সময় মধুপুরীর রাস্তাঘাটে যখন শুধু শিক্ষিত ইউরোপীয়রাই নয়, যথেষ্ট সংখ্যায় গোরা সৈন্যরাও ঘুরে বেড়াতে শুরু করল, তখন সেটাকে খুব বিপজ্জনক বলে মনে হতে লাগল তার। ডোরাকে একা-একা বাড়ি থেকে বেরোতে দেয় না সে। এটা এমন এক সময়, যখন বহু অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মা-বাপ তাদের শ্বেতাঙ্গিনী কন্যাকে বর খুঁজে নিতে সাগ্রহে পাঠিয়ে দেয়। যদি কোনো মার্কিন কিংবা ইংরেজ সৈন্যের সঙ্গে বিয়ে হয়ে যায়, তাহলে তাদের

কন্যারা জাতি ও ঐশ্বর্য উভয় দিক দিয়েই উচ্চ সম্প্রদায়ে ঠাঁই পেয়ে যাবে —এটাই তাদের মনের প্রচ্ছন্ন বাসনা। অথচ ডোরার জন্যে গোপালু দুর্ভাবনায় দিন গোনে। ঐ সব অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়েদের চেয়ে ডোরা অনেক বেশি সুন্দরী। চিন্তা ভাবনায় গোপালু এমন অস্থির হয়ে উঠল যে তাড়াতাড়ি মেয়ের বিয়ে দেওয়ার জন্যে সে উঠে পড়ে লাগল।

তাড়াহুড়োর কাজ হলো শয়তানের—প্রবাদ বাক্যটি তো খুব খাঁটি। তাড়াতাড়ি ডোরার উপযুক্ত বর পাওয়া কঠিন। যে খ্রীষ্টান ছেলেটি এক-আধটু লেখাপড়া শিখে কোনোরকমে ম্যাট্রিক টপকেছে, সে-ও অশিক্ষিত খানসামার প্রায় অশিক্ষিত মেয়েকে সুন্দরী হওয়া সত্ত্বেও বিয়ে করতে রাজী হলো না। সে-বছর গোপালু তার হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে মধুপুরীতে তার সম্প্রদায়ের সমস্ত খ্রীষ্টান ছেলেকেই দেখে বেড়ালো। অবশেষে একটা বড় হোটেলে গোয়ার ছেলে পাওয়া গেলো একটি। ভালো করে খোঁজ-খবর করলে হবু বরটি সম্পর্কে সে অনেক কিছু জানতে পারত। অথচ তার তাড়াহুড়ো, যদি খুঁত-টুত বেরিয়ে পড়ে, তাহলে ডোরাকে কুমারী অবস্থায় রেখে বিপদ মাথায় নিয়ে বসে থাকতে হবে। ইদানীং তারই ক্লাবের জমাদারের মেয়েকে নিয়ে এই রকমই এক কাণ্ড ঘটেছে, যার ফলে সে আরও বেশি শঙ্কিত হয়ে উঠেছে। গোয়ার ছেলেটি মেয়ে দেখল, দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলো একেবারে। কিন্তু বিয়ের সময় আবার অসুবিধা দেখা দিলো। ছেলেটি হলো রোমান ক্যাথলিক, আর ডোরার মা-বাপ প্রোটেস্ট্যাণ্ট। রোমান ক্যাথলিক ছেলেমেয়েরা ক্যাথলিক ছাড়া ভিন্ন গোত্রে বিয়ে করতে পারে না যদি না অন্যপক্ষ ক্যাথলিক হয়ে ঐ সম্প্রদায়েরই রীতি অনুযায়ী বিয়ে করতে রাজী হয়। হয়ত এর জন্যে ছেলেটি জিদ ধরত না, কিন্তু এ-ব্যাপারে তার কাকার আগ্রহটাই বেশি। গোপালুর কাছে ওটা এমন কিছু না। রাজপুত থেকে খ্রীষ্টান হওয়ার সময় একবার সে ভীষণ দোটানায় পড়েছিল, কারণ তখন তাকে বাঁড়ির লোকজন আর জ্ঞাতি-কুটুম্বের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হচ্ছিল চিরদিনের মতো, আর তাই সে দুটো রশির মাঝখানে ঝুলে ছিল কয়েক মাস। কিন্তু তাদের সকলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে যখন সে খ্রীষ্টান হয়েই গেছে, নিজের সমাজ থেকে পতিত হয়েছে, তখন তার প্রোটেস্ট্যাণ্ট থাকলেই বা কি, আর ক্যাথলিক হলেই বা কি, তার কাছে কি এমন তফাৎ?

রোমান ক্যাথলিক গীর্জায় ডোরার বিয়ে হলো। সেখানে সকালবেলা ভক্তিমান নারী-পুরুষের প্রার্থনা-উপাসনা চলে, সন্ধ্যেবেলা কৃষ্ণাঙ্গদের। মেয়ের বিয়েতে সেদিন গোপালু মনের সাধ মেটাতে চাইল। তার শ্রেণীভুক্ত লোকেরা কনের জন্যে যত দামী পোশাক-পরিচ্ছদ তৈরি করাতে পারে, সেই রকম পোশাক-পরিচ্ছদ তৈরি করালো সে। বিশেষ সাজগোজের জন্যে একজন শিক্ষিতা ভারতীয় খ্রীষ্টান মহিলাকে পাওয়া গেলো। গোপালুর শ্বশুরের আমলে পাদরীরা

তাদের ভারতীয় শিষ্য-শিষ্যাদের শুধু নামের নয়, তাদের পোশাক-পরিচ্ছদের পার্থক্যও ঘুচিয়ে দিতে চাইত—মেয়েরা মেমসাহেবদের অনুকরণে পেটিকোট পরত। কিন্তু, ডোরার সময় এখন আর সেরকম আগ্রহ নেই তাদের, খ্রীষ্টান মহিলারা দেশের অন্যান্য মেয়েদের মতো শাড়ি পরছে। ডোরাকেও দামী সাদা রেশমী শাড়ি পরানো হলো, পায়ে সাদা জুতো, আর মাথার চুল ঢাকার জন্যে দীর্ঘ সাদা নেটের ওড়না। হাতে বড় বড় গোলাপের তোড়া, শীত পড়ার জন্যে নীচের শহর থেকে ফুল আনাতে হয়েছে। বিয়ে উপলক্ষে মধুপুরীর সমস্ত শুভানুধ্যায়ী বন্ধু-বান্ধবেরা গীর্জায় এলো। ডোরা যে সুন্দরী, সে-কথা আগে থেকেই সবাই জানত, কিন্তু আজ যেন সে মানবী নয়, কোনো এক অপ্সরীর মতো মনে হচ্ছিল তাকে। সাদা পোশাক কালো বর্ণকে আরও কালো এবং গৌরবর্ণকে আরও গৌর করে তোলে। ডোরা গৌরবর্ণা, রুজ ব্যবহার না করা সত্ত্বেও তার গাল দুটি আরক্ত হয়ে উঠেছে। গীর্জায় উপস্থিত লোকজনের মধ্যে সেই ছেলেটিও হাজির ছিল, ডোরা লেখাপড়া কম জানে বলে যে তাকে বিয়ে করতে চায়নি। সত্যি সত্যিই আজ তার মনে মনে অনুতাপ হচ্ছিল। গোয়ার ছেলেটি কালো নয়, কিন্তু তাকে সুপুরুষ বলা যায় না। সকলেরই অভিমত—বানরের গলায় যেন মুক্তোর মালা। গোয়ার ছেলেটি হিন্দু হলে সে বলত—এমন গোলাপ যে আমার হাতে এসেছে, সেটা নিশ্চয়ই আমার পূর্বজন্মের ফল। খ্রীষ্টানরা পূর্বজন্ম মানে না, তারা মুসলমান ও ইহুদীদের মতো যে কোনো ভোগ ভোগাপ্তিকে ঈশ্বরের মহিমা বলে মনে করে। বিয়ের পর গোপালু তার বাড়িতে একটি ভোজের আয়োজন করল। সে তার মনিবদের জন্যে যত রকম খাবার তৈরি করে, সমস্ত তৈরি করল তার হিতাকাঙ্ক্ষীদের জন্যে! শরৎকালের সীজন শেষ হতে চলেছে, কিন্তু ক্লাবটা তো শীতকালেও খালি থাকে না। বহু সামরিক অফিসার স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্যে সেখানে এসে উঠেছে। অবশ্য এ রকম খরচকে ভয় পায় না গোপালু। অতিথিদের ভালো ভালো মদ পরিবেশন করা হলো। ক্লাবের ম্যানেজার অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সাহেব, তা ইংরেজদের সামনে তাঁকে প্রায় অচ্ছুতই বলা যায়, তিনিও কালো খ্রীষ্টানদের—তাতে আবার তারা খানসামার অতিথি, তাদের দলে একসঙ্গে বসতে পারেন না। তাঁর জন্যে এবং তাঁর মেমসাহেবের জন্যে পৃথক ব্যবস্থা করল গোপালু। কয়েকজন উৎসাহী খ্রীষ্টান তরুণী বিবাহোৎসবকে জমকালো করে তোলার জন্যে কিছু গান-বাজনাও দরকার বলে মনে করল। নাচটা অবশ্য এখনও তাদের সমাজে স্বীকৃত হয়নি, আর গানে যদি সিনেমার প্রভাব না পড়ত, তাহলে হয়ত গান বলতে 'যীশুখ্রীষ্ট আমায় প্রাণদান করেছেন' —টিউনেই গাওয়া হতো।

জামাতার কাকা যে হোটেলে থাকে, সেটা শীতকালের জন্যে আংশিক বন্ধ হলো, অনেক চাকর-বাকরের ছুটি হয়ে গেলো, তাদের মধ্যে কাকাটিও রয়েছে।

সে তার ভাইপো আর বৌমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে চাইল, কিন্তু গোপালু তার একমাত্র মেয়েকে ছেড়ে দিতে রাজী হলো না। অবশেষে গোপালু জামাতাকেও নিজের বাড়িতে এনে তুলল। সম্ভবত সে ভেবেছিল, সে যেমন তার শ্বশুরের জায়গাটি পেয়েছে, তেমনি জামাতাটিও একদিন তার জায়গায় যেতে পারবে। দূরে থাকলে হয়ত আরও কিছুদিন জামাতার গুণাবলী ঢাকা থাকত, কিন্তু এখন তো কাছাকাছি রয়েছে, কোনো ব্যাপার কি লুকোছাপা থাকতে পারে? সে একটা পাঁড় মাতাল। সামান্য একটু মদ গোপালু তাকে যে দেয়, সেটা তার কাছে যথেষ্ট নয়। বলে কি-না সে বোতল বোতল ব্রাণ্ডি, হুইস্কি, শ্যাম্পেন খায়। একদম মিথ্যে কথা। অতো দামী মদ না তার সাধ্যে কুলোবে, না ও খেয়ে সুখ পাবে। ওর তো মাথা ঘুরিয়ে দেওয়া দিশী ধেনো মদ দরকার। বউকে ধমক-ধামক দিয়ে কিছু পয়সা আদায় করে, আর তাই নিয়ে শহরতলীর যে-পাড়ায় হোটেল আছে, সেখানে গিয়ে আড্ডা মারে। ও-সব পাড়ার কাছাকাছি গাঁ-গুলোতে ঘরে ঘরে কড়া মদ, চোলাইয়ের কারবার। মদে চুর হয়ে সেখান থেকে ফেরে। রাস্তায় দু-এক জায়গায় আছাড় না খেয়ে বাড়ি পৌঁছতে পারে না। তারপর পৌঁছেই হৈ-হল্লা শুরু করে দেয়, অকারণে বউকে ধরে পেটায়, গালিগালাজ দেয়, শ্বশুর-শাশুড়ীকেও নাকাল করে ছাড়ে। মাসে এক-আধদিনের ব্যাপার নয়, হপ্তায় কয়েকবারই সে এই কাণ্ড চালায়। সবচেয়ে বেশি দুঃখ গোপালুর। সে যেন নিজের মেয়ের গলায় নিজের হাতেই ফাঁস পরিয়ে দিয়েছে। দু' হপ্তাও মেয়েটি তার জীবনের সুখ ভোগ করতে পেলো না, তার জন্যে এই নরকের আগুন জ্বলতে শুরু করল। গোপালুর কোয়ার্টার ক্লাব-ঘর থেকে খুব দূরে নয়। মদ খেয়ে গোয়ার লোকটা যেভাবে চেঁচামেচি করে, তাতে তার ভয় করে, ক্লাবের অতিথিদের না আবার ঘুম চটে যায়। সে বাড়ি ফিরলেই তাকে ঘরের ভেতর ঢুকিয়ে দিয়ে দরজা-জানালা ভালো করে বন্ধ করে দেয় গোপালু, যাতে বাইরে কোনো আওয়াজ না বেরোয়। রাগ দিয়ে রাগের মোকাবিলা করাটা অনর্থের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে, এই ভেবে গোপালু তাকে মিষ্টি কথায় বুঝিয়ে-সুজিয়ে ঠাণ্ডা করতে চায়। তাতে ফল হয় এই, পরের দিনের জন্যে জামাতার কিছু পয়সা জুটে যায়।

গোপালুর ওপর এ যেন এক প্রচণ্ড অভিশাপ। এক-আধটা রাত্তির তো পথেই কোথাও না কোথাও পড়ে থাকে জামাতা। যাতায়াতের পথে যদি কোনো জানাশোনা লোকের চোখে পড়ে, মনে দয়া হয়, তাহলে কিছুদূর পৌঁছে দিয়ে যায়। তা না হলে যতক্ষণ এক-আধটু নেশা না ছোটে, ততোক্ষণ ঐ রাস্তার মোড়েই পড়ে থাকে, তারপর নিশুতি রাতে শ্বশুরের ঘরে এসে হাজির হয়। গোপালু মনে মনে জপে, সে যদি ওখানেই খতম হয়ে যায়, কিংবা জন্তু-জানোয়ার এসে তাকে রাস্তার ধারের জঙ্গলে তুলে নিয়ে যায়, তাহলে সবচেয়ে ভালো হয়। কিন্তু

মধুপুরীর জন্তু-জানোয়ারেরা খুব হুঁশিয়ার। তারা মানুষের সঙ্গে শত্রুতা করার ভয়ানক পরিণামের কথা জানে। শ্বশুরবাড়ির লোকজন যতই নম্র হয়, জামাতা ততোই সিংহের মতো তর্জন-গর্জন করতে থাকে। গোপালু ভাবে —আমার কোয়ার্টার যদি এখান থেকে একটু দূরে হতো, তাহলে বাছাধনকে উচিত শিক্ষা দিতাম।

মার্চ মাস শুরু হয়েছে। শীতকাল পিছু হটছে। এমনিতেই মধুপুরীর আবহাওয়ার ব্যাপারে সঠিক কিছু বলা যায় না। যদি হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টিপাত দু-তিন দিন ধরে লাগাতার চলে, তাহলে শিলাবৃষ্টিও হতে পারে। শীতকাল কেটে গিয়ে যখন বসন্ত দেখা দেয়, তখন সমভূমির বাসিন্দাদের চেয়েও বেশি আনন্দ-উল্লাসে মেতে ওঠে মধুপুরীর স্থায়ী বাসিন্দারা। কিন্তু গোপালুর ঘরে যেদিন জামাই এসেছে, সেদিন থেকেই তার ঘর থেকে আনন্দ-আহ্লাদ একেবারে বিদায় নিয়েছে।

চার

১৯৪৭-এর আগস্ট এলো। ইংরেজ চিরদিনের মতো ভারত থেকে বিদায় নিলো, মধুপুরী বিধবা হয়ে গেলো। যেন সেই বৈধব্যকে প্রমাণ করার জন্যেই সেই বছরই আগস্টে এখানেও প্রচণ্ড উথাল-পাথাল হলো। দেশ-ভাগের আগে থেকেই লাহোর আর পশ্চিম পাঞ্জাবের দূর দূর শহরের লোকজনে জায়গাটা ভরে উঠেছিল। তারা রোজ রেডিও-তে কান লাগিয়ে শুনতে চায়, লাহোর কোনদিকে পড়ল। লাহোর যে পাকিস্তানে চলে যাবে, তাতে কি কোনো সন্দেহ আছে? লাহোরের আশপাশের গ্রামগুলো সবই মুসলমানদের। শহরে যদি হিন্দুদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকত, তাহলেই কি ইংরেজ সেখানে ভারতের একটা দ্বীপ তৈরি করে রাখতে চাইত! হিন্দুরা তাদের নাকানি-চোবানি খাইয়ে ভারত ছাড়তে বাধ্য করেছে। মুসলমানরা ভারতের স্বাধীনতার জন্যে যে সংগ্রাম করেনি, তা নয়, কিন্তু ইংরেজ সমস্ত প্রতিশোধ তুলতে চায় হিন্দুদের ওপর দিয়ে। সেজন্যে রায়বাহাদুর ও সরদারবাহাদুরদের ইংরেজ-প্রেমে মশগুল হয়ে মনে মনে এ-আশা পোষণ করা দুরাশা মাত্র যে তাদের পুরনো প্রভু লাহোরটাকে পাকিস্তানের হাতে তুলে দেবে না। হাত থেকে লাহোর চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই হিন্দুদের রক্তের নদী বয়ে যাওয়ার অতিরঞ্জিত খবর আসতে শুরু করল পাঞ্জাবে, সে-খবর শুনে মধুপুরীতে থাকা পাঞ্জাবীদের রক্ত টগবগ করে ফুটতে লাগল, দশ-বিশজন নিরপরাধ মুসলমানকে খুন করে জান ঠাণ্ডা করতে চাইল তারা।

ইংরেজ মধুপুরীর সর্বস্ব লুঠ করে নিয়ে গেছে। গোপালু এখনও আল্লস ক্লাবে রয়েছে। কিন্তু ক্লাবে অতিথিদেরই যখন আর টিকি দেখা যায় না, তখন তার সুখের

জীবন অটুট থাকবে কি করে ? ঈশ্বর তার প্রার্থনা মঞ্জুর করেছেন, বছর খানেক হলো গোয়ার লোকটা মধুপুরী ছেড়ে পালিয়েছে। নাজেহাল হয়ে গিয়ে গোপালু দু-একবার তাকে আচ্ছা করে ধোলাই দিয়েছিল। সে চলে যাওয়াতে গোপালু খুব খুশি, খুশি তার স্ত্রী এবং ডোরাও। কিন্তু ডোরাকে সে দুটো মেয়ের মা করে ভেগেছে। গোপালুর হাত-টান চলছে। পঞ্চাশ টাকা করে সে এখনও পায়, কিন্তু বর্তমানে তার দাম পনেরো টাকাও নয়। উপরি আমদানি তো এখন নাম মাত্র। পরে কি যে হবে তার কিছুই ঠিক নেই।

দুশ্চিন্তাও ব্যাধির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। গোপালু যে-সুদিন দেখেছে, তা ফিরে আসার আর কোনো আশা নেই। সংসারের অভাব-অনটন তাকে দিশেহারা করে তুলেছে। এ রকম পরিস্থিতিতে যদি তার শরীর ভেঙে অর্ধেক হয়ে যায়, তাতে আশ্চর্য কি ? সীজন শুরু হলো। মধুপুরী লোকে লোকারণ্য, কিন্তু তাদের অধিকাংশই পাঞ্জাব থেকে আসা শরণার্থী। এক-একটি কুঠরিতে দশ-দশজন লোক গাদাগাদি করে ঢুকে আছে, অথচ বাংলো-হোটেল বেশির ভাগই খালি পড়ে আছে। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর থেকেই ইংরেজের সংখ্যা কমতে শুরু করেছিল, আর এ-বছর শীতকালের দাঙ্গা-হাঙ্গামার খবর শুনে তাদের মধুপুরীতে বেড়াতে আসার ইচ্ছে না হওয়াই স্বাভাবিক। নবাবেরা তো বাড়িতে বসে-বসেই আল্লাকে ডাকছেন, তাঁদের অনেকেই পাকিস্তান চলে গেছেন। অনিশ্চিত অবস্থার দরুণ রাজা আর বড় বড় জমিদারেরাও সে-বছর এলেন না। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরেই আল্‌স ক্লাবে কালা আদমিদের দাপট বেড়ে গিয়েছিল, আর এখন তো ঐ ক্লাবের মালিক বলতে তারাই। কিন্তু ক্লাবের অর্ধেক ঘরও এবার কোনো কাজে লাগেনি। প্রথম সীজনেই গোপালু অসুখে পড়ল। খুব কষ্টেসৃষ্টে মে-জুন পর্যন্ত নিজেকে ঠেলে নিয়ে গেলো, তারপর বর্ষা আসতেই সেই যে খাটিয়ায় শুয়ে পড়ল, আর উঠল না। দুঃখের জগৎ থেকে চিরকালের মতো বিদায় নিলো সে।

অথচ, দুটি মেয়ে আর মা-কে সঙ্গে নিয়ে এই পৃথিবী থেকে কোথাও পালাবার জায়গা নেই ডোরার। খানসামা মারা যাওয়ার পর তার পরিবারটিকে আউট হাউসে থাকতে দেওয়া যায় কি করে ? ডোরাকে ঘর ছাড়তে হলো। ঐ ঘরেই সে বিশ্ব-সংসারটিকে প্রথম চোখ মেলে চেয়ে দেখেছিল, ঐ ঘরেই সে তার শৈশবটিকে বড় আনন্দে কাটিয়েছিল।

* * *

বছর খানেক পরে ডোরার মা-ও দুঃখের হাত থেকে মুক্তি পেলো। ডোরার কোনো জানাশোনা লোক তার বাসার কাছাকাছিই ডোরাকে ঘর খুঁজে দিয়েছিল। মধুপুরীতে আউট-হাউসগুলি অধিকাংশই খালি পড়ে থাকে, সেজন্য বিনা পয়সায় ঘর পাওয়া কঠিন নয়। কিন্তু দুটি মেয়েকে নিয়ে নিজের জীবনতরী বেয়ে যাওয়া ডোরার পক্ষে সহজ নয়। মেয়েদের কাছে বিয়েটা শখের ব্যাপার নয়, বিশেষ করে

ডোরার মতো মেয়েদের। এখন তার বয়স একুশ কি বাইশ। বাপ মারা যাওয়ার পর যেরকম দুরবস্থার মধ্যে কাটাতে হয়েছে, তার ফলে সময়ের অনেক আগেই সে যে বুড়িয়ে যাবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই, তবু এখনও তার দেহে শক্তি-সামর্থ্য ও সৌন্দর্য অবশিষ্ট রয়েছে কিছু। গোলাপ ফুলের মতো মেয়ে ডোরার জন্যে অতো চেষ্টা-চরিত্র করা সত্ত্বেও যদি বাপের কপালে গর্দভ জামাতা জোটে, তাহলে এখন জীবন-সংগ্রামে নাস্তানাবুদ ডোরার কপালে ভালো পুরুষ জোটা কি সম্ভব? এখন তাকে তার জানাশোনা পরিধির মধ্যে অপদার্থের অপদার্থ লোকেরও শরণাপন্ন হতে হয়। খ্রীষ্টানদের ওপর সাহেবদের অনুগ্রহ বর্তমানে আর নেই। তাদের চাকরি বাকরির পথ বহুক্ষেত্রেই অবরুদ্ধ। মুসলমান খানসামাদের অনেকেই পাকিস্তান চলে গেছে, তবু প্রয়োজনের তুলনায় এখনও অনেক বেশি রয়েছে এখানে, তারা অল্প বেতনেও কাজ করার জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ডোরা অবলম্বন হিসেবে একজনকে ধরল। কিন্তু সে ডোরার এবং ডোরার ছেলেমেয়ের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব তো বহন করতে পারলই না, উপরন্তু তার বাচ্চাকাচ্চার সংখ্যা আর একটি বাড়িয়ে তাকে ত্যাগ করে চলে গেলো। তারপর আর একজনও তাই করল। পাঁচটি ছেলেমেয়ের জন্যে আঠাশ বছরের ডোরা এখন আবার আর একজনের পাল্লায় পড়েছে। লোকটার চামচিকের মতো চেহারা দেখলেই বোঝা যায়, সে একজন পাকা কোকেন-খোর। বাপ-মাকে দিয়ে একটি একটি করে গয়না বিক্রী করে সে তার ছেলেমেয়েদের খাইয়েছে। চোখের সামনে ছেলেমেয়েদের ছটফট করতে দেখে মা কি চুপ করে থাকতে পারে? প্রথমে গয়নাগুলো বন্ধক দিয়ে টাকা ধার করত, এখন কাকুতি-মিনতি করে যেখান থেকে পায় সেখান থেকেই ধার করে আনে। লোকের থালা-বাসন ধোয়, ঝাড়ু দেয়, কিন্তু তাতে ছ-সাত জনের পেট কি করে ভরবে?

ডোরা তার সমস্ত কাপড়-চোপড়গুলোও বিক্রী করে খেয়েছে। কিন্তু নকল রেশমের একখানা পুরনো নীল শাড়ি আর এক জোড়া ছেঁড়া জুতো তার কাছে এখনও রয়েছে। ঘরে তেলচিটে ময়লা কাপড়-চোপড় পরেই থাকে, কিন্তু যখন বাইরে বেরোতে হয়, তখন ঐ পোশাকে কারোর সামনে যেতে ইচ্ছে করে না তার। এখনও যদি কোথাও দু-চার আনা ধার জোটে, তা ঐ কাপড়ের জোরেই। এ বছর খুব সদাশয় এক ভদ্রলোক সস্ত্রীক তার পাশের বাড়িতে এসে উঠেছেন। ডোরার ভিক্ষে করা স্বভাব নয়, যদিও তার অবস্থা এমন জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে যে ভিক্ষে ছাড়া গত্যন্তর নেই। ধারের নামে সে প্রকারান্তরে ভিক্ষেই করে। পাশের বাড়ির ভদ্রলোকের কাছ থেকে আট আনা পয়সা ধার চাইল সে। তিনি বুঝতে পারলেন, মেয়েটি মিথ্যে কথা বলছে, এ-ধার সে কোনো দিন শোধ করবে না। ডোরা যদি সব কথা খুলে বলত, কিংবা ভদ্রলোক যদি তার অবস্থার কথা জানতেন, তাহলে নিশ্চয়ই তাঁর দয়া থেকে ডোরা বঞ্চিত হতো না। তিনি তাকে যাচ্ছেতাই বলে তাড়িয়ে দিলেন। ডোরা করুণ মুখে নিরাশ হয়ে ফিরে এলো।

ডোরার চারটি মেয়ে। পঞ্চমটি দশ-এগারো মাসের ছেলে। সব ক'টির গায়ের রঙই ফর্সা, যদিও দারিদ্র্যের কালো ছাপ পড়েছে সকলেরই চোখে-মুখে। বড় মেয়েটি এগারো বছরের। খিদে পেলে সবাই ডোরার কাছে এসে কাঁদতে থাকে। রাগে জ্বলে ওঠে ডোরা, কিন্তু মনে মনে ভাবে—আমি ছাড়া এদের আর কে আছে! 'কুপুত্রো জায়েত কচিদপি কুমাতা ন ভবতি।' সে কুমাতা নয়। দুঃখের ভেতর দিয়ে তাকে জীবন কাটাতে হয়েছে, সেটাও তার এই বিবেচনা-শক্তির একটা কারণ। মান হোক অপমান হোক, কাজ করে কিংবা ধার করে, যেমন করে হোক, সে তার সন্তানদের লালন-পালন করতে চায়। এই ছেলেমেয়েরাই সুযোগ পেলে ভবিষ্যতে কি হবে, কে বলতে পারে? কিন্তু যেখানে তাদের পেট ভরানোর জন্যে দু'মুঠো খাবার নেই, লেখাপড়ার সুযোগ নেই, সেখানে তাদের পক্ষে কিছু একটা হয়ে যাওয়া কি করে সম্ভব?

ডোরা বাজারের রাস্তার পিছন দিকে একটা কোয়ার্টারে বিনা পয়সায় থাকে। সেটাতেই তার স্বামী এবং আরও দু-একটা লোক থাকে। হয়ত তারা তার ভাশুর-দেওর কেউ হবে। সীজনে তাদের কখনো-সখনো কাজকর্ম জুটে যায়। ডোরা সবাইকে রান্না করে খাওয়ায়। সবাই ঐ ঘরটাতেই থাকে, অন্তত সীজনের পরে। সীজনের সময় ছেলেমেয়েরা তবু আধ-পেটা খেতে পায়, কিন্তু বাকি সময় যে কি করে চলে, বলা মুশকিল। পাশের ঘরগুলোতে শৈলবিহারীরা এসে ওঠে, প্রতি বছর প্রতি সীজনেই নতুন নতুন মুখ। সেটা বলতে গেলে ডোরার পক্ষে মঙ্গলই, নইলে ঐ সব লোকের কাছে বারবার ধারের নামে ভিক্ষে চাওয়া বেকার হতো। গরিবের দুঃখ গরিবেই বোঝে। পাশের পাঞ্জাবী পরিবারের চাকরটা ডোরার দুর্দশা লক্ষ্য করে। সে তার প্রভুদের উদ্বৃত্ত-উচ্ছিষ্ট খাবারের কিছু কিছু ডোরাকে দেয়। উনুনের আধ-পোড়া পাথুরে কয়লাও পায় ডোরা। বাইরের দিকে বাংলোর গায়ে লাগানো কল থেকে টিনে করে জলও আনে সে। তেলচিটে ময়লা কাপড় পরা মেয়েটিকে রোজ কল থেকে জল নিয়ে যেতে দেখে পাঞ্জাবী মহিলাটির এতটুকু মায়া-দয়া হয় না। সেদিনও সে ডোরাকে ভীষণ বকাবকি করছিল, তাই ডোরা অশ্রু-ছলছল চোখে তার দীনহীন অবস্থার কথা বোঝানোর চেষ্টা করছিল। ডোরার মা-বাপের কপাল ভালো যে তাদের মেয়ের এই দুর্বিষহ জীবন চোখে দেখার জন্যে বেঁচে থাকতে হয়নি তাদের। ডোরাও মাঝে মাঝে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে—'হে প্রভু, আমাকেও মা-বাবার কাছে পাঠিয়ে দাও।' কিন্তু গরিবের প্রার্থনা কি এত সহজে মঞ্জুর হওয়া সম্ভব! তার কালরাত্রি তো এখনও অর্ধেকই কাটেনি বলে মনে হয়ে।

নেপালকে ধরে আসাম থেকে লাদাক পর্যন্ত ভারতের সীমা তিব্বত অর্থাৎ চীন প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত। উভয় দেশের সন্ধিস্থলে প্রায় সর্বত্রই প্রাকৃতিক দৃশ্য যেন হঠাৎ বদলে গেছে। মনে হয়, আমরা অন্য কোনো জগতে এসে উপস্থিত হয়েছি। কয়েক মাইল পিছনেই বনস্পতিতে আচ্ছাদিত শ্যামল সুশোভিত পর্বতরাজি আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, এখানে তার বড় অভাব, যাত্রীদের কাছে জ্বালানীই এক সমস্যা। এখানে জ্বালানী বলতে পশুর বিষ্ঠা শুকনো ঘুঁটের আকারে পাওয়া যায়। আমাদের সমভূমির লোকেরা তো ঘুঁটের অভাবে অনাহারে মরবে, কিন্তু তিব্বতী যাত্রীরা একটা ছোট মতো হাপর সঙ্গে রাখবেই, সেটা দিয়ে কৃত্রিম ভাবে অক্সিজেন পাঠিয়ে আগুনটাকে বেশ জোরালো করে তোলা যায়। কনম্ এই রকমই এক প্রাকৃতিক সন্ধিস্থলে অবস্থিত জনবসতি। মানস সরোবরের ভাই রাবণ হ্রদ থেকে নির্গত সত্‌লজ তার শতদ্রু (শতগুণ দ্রুতবেগে যে ধাবিত হয়) নামটিকে চরিতার্থ করতে করতে নীচে বয়ে চলেছে, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে কনম্ গাঁয়ে দাঁড়িয়ে আপনি তার ঘর্‌ঘর শব্দ শুনতে পাবেন, আর সেজন্য আপনি নদীটির নাম দিয়ে দেবেন ঘগ্‌ঘর্ বা ঘাঘরা। শতদ্রুর সন্নিকটে পৌঁছতে হলে দু'মাইল নীচের দিকে নামতে হবে, কিছু কিছু জায়গা এমন ভয়ঙ্কর যে পাহাড়ী লোকেরাও তা পেরোতে সাহস পায় না। কনম্ গ্রামের কাছ থেকে পর্বতপৃষ্ঠের ওপর পর্যন্ত শতদ্রু যে রেখা সৃষ্টি করেছে, তার একপাশে দেবদারু আর ধুপীর গাছপালা—যেন খানিকটা অসতর্কতার ফলেই কোথাও কোথাও গাছপালা বিরল হয়ে এসেছে, কোথাও-বা বনানীর রূপ নিয়েছে। তিব্বত-ভারত সড়ক ধরে ওপরের দিকে এগিয়ে চলুন, একটি কি দুটি পথের বাঁক পেরোলেই বৃক্ষশূন্য পার্বত্যভূমি আপনার চোখে পড়বে। তৃণ-গুল্ম অবশ্য রয়েছে, সমস্তই পশুদের খাওয়ার উপযুক্ত নয়, খুব ঘনও নয়। ওসবের মধ্যে কিছু কিছু গাছ রয়েছে, যা ভেষজ দ্রব্যগুণের দিক দিয়ে খুব মূল্যবান, আবার অগুরুর মতো সুগন্ধী গুল্মও রয়েছে। দ্রুত হাঁটলে কনম্ থেকে একদিনেই ভারতের শেষতম গ্রাম নমগ্যায় পৌঁছে যাওয়া যায়, সেখান থেকে দু-এক মাইল পরেই যে শুকনো খটখটে নালাটি শতদ্রুতে এসে পড়েছে; সেটিকে উভয় দিকের স্থানীয় লোকজনই ভারত ও তিব্বতের সীমা বলে স্বীকার করে, যদিও ইংরেজ

সরকার এবং তাদের মতানুসারী ভারত সরকার আজও নিজেদের মানচিত্রে সেটিকে চিহ্নিত করেনি। তিব্বত-ভারত সড়ক শতদ্রুর সঙ্গে-সঙ্গে গিয়ে নমগ্যায় পৌঁছে শেষ হয়ে গেছে। অবশ্য ব্যবসায়ীরা পরবর্তী তিব্বতী গ্রাম শিপ্‌কীর সঙ্গেও যোগাযোগ রক্ষা করে, কিন্তু সেখানে যাওয়ার জন্য শতদ্রুর তীর ধরে এগোনো সম্ভব নয়। শতদ্রু পাহাড়ের বুক চিরে এমন খাড়া প্রাচীর তৈরি করেছে যে সেখান দিয়ে মানুষ ও পশু উভয়েরই হেঁটে যাওয়া বিপজ্জনক। সেজন্য অন্য একটি ছোট্ট নদীর ধারে ধারে ওপরে চড়ে একটা সীমান্ত পেরিয়ে শিপ্‌কীতে পৌঁছতে হয়।

কনম্‌-এর পরের গ্রাম 'স্পু' বেশ বড় গ্রাম। তিব্বতের সীমান্ত থেকে চার ঘণ্টার পথ। এখানে পাদরীরা নিজেদের আখড়া গেড়ে এখানকার তিব্বতী ভাষাভাষী লোকদের খ্রীষ্টান করার চেষ্টা করছেন। মিড্‌ল স্কুল এবং হাসপাতালও খুলেছেন তাঁরা। তাঁদের উদ্যোগেই ব্রিটিশ সরকার স্পু-তে ডাকঘর এবং ডাক-বাংলোও তৈরি করে দিয়েছেন।

কিন্তু তিব্বত থেকে আসার পথে গাছপালায় ঢাকা এলাকার প্রথম গ্রাম বলতে ঐ কনম্‌। এখান থেকে শুধু প্রাকৃতিক সীমারেখাই শুরু হয়নি, এমনকি ভাষার সীমারেখাও শুরু হয়েছে এখান থেকেই। কনম্‌-এর লোকেরা কিরাত ভাষাগোষ্ঠীর কনৌরী (কিন্নর) ভাষায় কথা বলে। কনৌরী ভাষা হলো মাবুছি, রাজকিরাত, মগর, গুরুঙ্গ্‌, তমঙ্গ্‌, নেওয়ার, লিম্বু, যাখা, লেপ্‌চা ইত্যাদি ভাষার সহোদরা। পূর্বদিকের কিরাত বংশজাত লোকের চোখে ও গালে মঙ্গোলীয় মুখের আদলই বেশি, অবশ্য তার মানে এই নয় যে চীনা ভাষার সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক রয়েছে। কনৌরে মঙ্গোলীয় মুখের ছাঁচ খুব কম চোখে পড়ে, এমনকি যদি কনম্‌ থেকে শতদ্রু পেরিয়ে উত্তরে যাওয়া যায়, তাহলে বহু গ্রামেই দেখা যাবে ও রকম মুখের ছাঁচ খুব কম। সে-সব জায়গার লোকের গায়ের রঙ ফর্সা, লম্বা নাক ও লম্বা করোটি। বিশুদ্ধ খস্‌ সম্প্রদায়ের লোক তারা। অথচ কনম্‌ তিব্বত থেকে আসা প্রধান সড়কটির ওপর হাজার বছর ধরে রয়েছে। জায়গাটি পশ্চিম তিব্বতের রাজাদের শাসনাধীন ছিল কয়েক শতাব্দী যাবৎ। পশ্চিম তিব্বতের খুব এক পরাক্রমশালী অবতার লামা —লো-ছেন্‌ রিম্পোছের কেন্দ্রীয় মঠ এখানেই।

কনৌর-এর লোকেরা এখনও অধিকাংশই বৌদ্ধ। নীচের দিকে ওদের কিছু জাতভাই ব্রাহ্মণদের পুরুত বলে মেনে নিতে শুরু করেছে, অথচ তাদের মধ্যেও লামাদের মান-সম্মান একেবারে উঠে যায়নি। বলা যেতে পারে, ব্রাহ্মণদের দিকে তাদের ঝোঁকার পিছনে একমাত্র কারণ রাজপুত হওয়ার প্রলোভন। নইলে যেখানে ইকনম্‌-এর সঙ্গে এতটুকু সংস্পর্শ রয়েছে, সেখানেই কেবল বৌদ্ধ ধর্মেরই প্রভাব।

প্রকৃতি কনৌরকে এমন এক পরিবেশের মধ্যে সৃষ্টি করেছে যে সেখানকার

লোকজনকে আধা ভবঘুরে হয়ে জীবন কাটাতে হয়। মেষ-ছাগল প্রতিপালন এখনও সেখানকার লোকের একটি প্রধান উপজীবিকা। এর সঙ্গে হাজার হাজার বছর ধরে পশ্চিম তিব্বতের ব্যবসা-বাণিজ্যও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। শতদ্রুর গতিপথের যে জায়গাটি সবচেয়ে নীচু, সেটিও পাঁচ-ছ'হাজার ফুট ওপরে। গ্রামগুলি তো সেখান থেকে আরও উঁচু হতে হতে চলে গেছে। নম্-এর উচ্চতা প্রায় দশ হাজার ফুট। শীতকালে সেখানে তুষারপাত হয়। এর ফলে বড় বড় গাছপালা জন্মায় যেসব জায়গায়, সেখানেও তখন পশুদের খাদ্য বলতে শুধু চিরহরিৎ তিলৌঞ্জের কাঁটাওয়ালা পাতাগুলোই অবশিষ্ট থাকে। সমভূমির লোকেরা তাদের বাগানের আমগাছগুলোর যেমন যত্ন-আত্তি করে, তেমনি করে এখানকার লোকেরা প্রত্যেকটি তিলৌঞ্জের যত্ন নেয়। তুষারপাত শুরু হলেই তারা তিলৌঞ্জের পাতা তড়িঘড়ি ছাগল-ভেড়াকে খাইয়ে শেষ করে দেয় না, জমিয়ে রাখা ঘাস-বিচালি যখন শেষ হয়, তখনই তাতে হাত দেয় তারা। তবু, কনৌরের লোকেরা যদি শীতকালে তাদের গবাদি পশু সমস্তই ওখানে রাখে, তাহলে তাদের অনাহারে মৃত্যু কেউ ঠেকাতে পারবে না। সেজন্যই বাড়ির অর্ধেক লোক শীত শুরু হওয়ার আগেই তাদের পশুর পাল হাঁকাতে হাঁকাতে সিমলা, মণ্ডী ও দেরাদুনের জঙ্গল অবধি চলে যায়। তুষারপাত হয় না বলে সেখানে ঘাস-টাস সহজেই জোটে, আর তা পেয়ে গেলে তারা নিজেদের মেষ-ছাগলের পিঠে চেপে খানিকটা ঢুলুনি খাওয়ার কাজও সেরে নেয়।

কিন্নর নারী-পুরুষেরা শৈশব থেকেই নিম্ন-পার্বত্য অঞ্চল এবং সেখানকার লোকজনদের দেখার সুযোগ পায়, কিন্তু মেয়েদের মধ্যে কদাচিৎ কেউ নিম্নাঞ্চলের ভাষা রপ্ত করে। শীতকাল পড়লেই যেমন ওরা রওনা দেয় নীচের দিকে, তেমনি বসন্তকাল এলেই ওদের যাত্রা শুরু হয় ওপরের দিকে। মে মাসের গোড়াতেই খুব নীচের দিকে চলে যাওয়া লোকেরাও নিজের নিজের গাঁয়ে এসে ঠিক পৌঁছে যায়, তারপর বরফ-মুক্ত জমিতে চাষ দিয়ে বীজ বোনা শুরু করে দেয়। আবার জুন মাস এলেই ওদের যাত্রা ওপরের দিকে। শিপ্‌কী অথবা অন্য কোনো সীমান্ত-এলাকা পেরিয়ে ওরা পশ্চিম তিব্বতের পশুপালকদের কাছে গিয়ে হাজির হবে। সঙ্গে করে নিয়ে যাবে দরকার মতো শস্যদানা কিংবা অন্যান্য জিনিসপত্র, সেগুলো বদল করে ছাগল-ভেড়া সংগ্রহ করবে তারা। এই-ভাবে শীতকালটা দেরাদুনের জঙ্গলে আর বর্ষাকালটা মানস সরোবরের শীতল মৃত্তিকায় কাটাবার মতো লোক সেখানে প্রচুর দেখা যায়। তিব্বতের ব্যবসা বাণিজ্য তাদের উপার্জনের একটা বড় উৎস। নিজেদের পোশাক-পরিচ্ছদের জন্যে ওরা সেখানকার ভেড়ার কোমল পশমের ওপর নির্ভর করে। নিজেদের প্রয়োজনের তুলনায় বেশি হলে ওরা সেই বাড়তি পশম কানপুর ইত্যাদি শহরের কারখানাগুলোর এজেন্টদের বিক্রী করে দেয়।

দুই

বালক বিস্নুনের জন্ম হয়েছিল কিন্নরদের এই কনম্‌-এ, যার ফলে ভবঘুরেমির নেশা ছিল তার রক্তে। মা-র কোলে কোলে সে কখনো দেরাদুনের কখনো-বা মণ্ডীর জঙ্গলে শীতকাল কাটিয়েছে। যখন আর একটু বয়স হলো, ছাগল-ভেড়া চরানোর উপযুক্ত হয়ে উঠল, তখন সে শীতকালে তার কোনো বাপের সঙ্গে নীচের জঙ্গলে যেতে শুরু করে। কিন্নরেরা প্রকৃতির নিষ্করুণতার হাত থেকে মুক্তিলাভের, জন্যে অনেক আগেই বুঝতে পেরেছিল যে সন্তান-সন্ততি বৃদ্ধি করা মানেই দারিদ্র্য ও ক্ষুধার তাড়না বৃদ্ধি করা। পাণ্ডববিবাহ প্রথাকেই তারা এর একমাত্র সহজ সমাধান বলে ভেবেছে, ঠিক যেমনটি তাদের দেশের মতো একই ভূ-প্রকৃতি বিশিষ্ট অন্যান্য দেশও এই প্রথাটির গুরুত্ব স্বীকার করে নিয়েছে। তাই সেখানে ঘরে ঘরে পঞ্চপাণ্ডব আর ঘরে ঘরে দ্রৌপদী একটা মামুলী ব্যাপার। সব ভাই মিলে একটিই বিয়ে হবে, যদি কোনো ভাই তা মানতে রাজী না হয়, তাহলে সে তার পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারবে না —সরকারও এই সামাজিক প্রথাটি মেনে নিয়েছে। সেজন্য সেখানে বাপ-কাকা-জ্যাঠা না বলে বড় বাপ, ছোট বাপ বলার রেওয়াজ। কনম্‌-এর ওপরের দিকে ও নীচের দিকে যেসব জঙ্গল আছে, সেখানে বিস্নুনের বসন্ত আর বর্ষার দিনগুলো কাটে। উপজাতির প্রাণচাঞ্চল্য তাদের শিরায় শিরায়। নাচ-গানের ভেতর দিয়ে যেন অজান্তেই দিন কেটে যায় তাদের। বর্ষাকাল শেষ হতেই —তাদের গাঁয়ে তো বড় জোর দশ-বারো ইঞ্চি বৃষ্টি হয় —তখন তারা ঘরে ঘরে এক-আধজন লোক রেখে আবার যাত্রা শুরু করে নীচের দিকে।

যদিও তিব্বতের সীমান্তের এই ভারতীয় অধিবাসীদের কাছে ভবঘুরেমি সুপরিচিত, তার মানে এই নয় যে তাদের সবাই ভবঘুরে, সবাই শুকনো পাতার মতো হাওয়ার স্রোতে ভেসে বেড়ায়। তাদের ভ্রমণ একটা পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, সেই পরিধির কেন্দ্র হলো তাদের নিজেদের গ্রাম। পাণ্ডব-বিবাহ প্রথায় একজন দ্রৌপদীরই বিয়ে হওয়ার ফলে সেখানে অনেক মেয়েরই বিয়ে না হওয়া স্বাভাবিক, তাদের জন্যে বৌদ্ধধর্ম ভিক্ষুণী হওয়ার পথ বাতলে দিয়েছে। কনম্‌-এ তারা নিজেদের একটি পৃথক মঠ বানিয়ে নিয়েছে, সেখানে তারা যৌথভাবে স্বাবলম্বী জীবন-যাপন করে। বাড়ির কিংবা গাঁয়ের লোকের দয়ার ওপর নির্ভর করতে হয় না তাদের। ওরা নিজেরাই ক্ষেতে-খামারে কাজ করে, ফসল ভাগ-বণ্টন করে নেয়। পুজো-পাটও সেরে নেয় তারা —সকলেই তো ধর্মচারিণী। প্রায় প্রতি বাড়ি থেকে দু-একজনকে ভিক্ষুও হতে দেখা যায়, তাদের অনেকেই বিদ্যাচর্চার জন্যে লাসা পর্যন্ত দৌড়ায়। বিস্নুনদের প্রতিবেশীর কয়েকটা ছেলে তিব্বতে পড়াশুনো করতে গিয়েছিল, তাদের কেউ কেউ ফিরে এসে গাঁয়ের বড় গুম্বায় (বিহারে) রয়েছে।

বিস্থন ভিক্ষু হলো না কেন? কারণটা বোধ হয়, গুম্বার চেয়ে গাঁয়ের আনন্দময় জীবনের প্রতি তার অত্যধিক আকর্ষণ। দশ-বারো বছরের ছেলে মাথা মুড়িয়ে লাল কাপড় পরে শ্রমণ (গেছুল) হলেই উৎসবমুখর কিন্নর-জীবন থেকে বঞ্চিত হতে হয়। বিস্থন অতোটা ত্যাগ স্বীকার করতে রাজী নয়।

বারো-তেরো বছর বয়সে বিস্থনকে কারবারের উদ্দেশে তার বড় বাপের সঙ্গে সর্বপ্রথম তিব্বত যেতে হয়। নীচের সবুজ-শ্যামল প্রান্তর সে অনেকবার দেখেছে, কিন্তু তিব্বতের প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে তখনও অপরিচিত। স্থমনম থেকে বয়ে আসা নদী পেরোবার সময় সে লক্ষ্য করল যে তারা গাছপালাশূন্য পার্বত্য ভূমিতে এসে উপনীত হয়েছে। এ-ব্যাপারে সে তার বাপকে জিজ্ঞেসও করল, কিন্তু তার বাপ আর কি জবাব দেবে, বলল —'এখানকার মাটি ঐ রকমই।' জলীয় বাষ্পপূর্ণ মেঘ দক্ষিণের দূর সমুদ্র থেকে ভেসে আসতে থাকে, পথে বড় বড় পাহাড় তাদের গতি রোধ করে, ফলে অবশিষ্ট যে এক-আধটু মেঘ সামনের দিকে এগোতে সমর্থ হয়, তার মধ্যেও বেশির ভাগটাই খুব উঁচুতে উঠে যাওয়ার জন্য বৃষ্টিপাত ঘটাতে সক্ষম হয় না। কম বৃষ্টিপাতের দরুণ এখানে গাছপালার অভাব। এসব কথা তার বাপের জ্ঞানগম্যির বাইরে। গাধা-ছাগল-ভেড়া সঙ্গে নিয়ে ব্যাপারীদের হাঁটা ঢিমে চালে। পথ চলতে চলতে তারা কোনো গাঁয়ের মধ্যে বিশ্রাম নিতে চায় না, কারণ সেখানে তাদের গবাদি পশুর চরে বেড়ানোর অসুবিধে। কিন্তু রাস্তার ওপর গ্রাম পড়লে গ্রামের ভেতর দিয়েই যেতে হয়। প্রথম স্পু গ্রামে বিস্থন দেখল, তাদের ভাষা কেউ বোঝে না। চার-পাঁচটি শীতকাল সে নীচে কাটিয়েছে, তাই কিছু কিছু হিন্দী শব্দও তার জানা আছে, তারই সাহায্যে সে স্পু-র দু-একজনের সঙ্গে কথা বলতে পারল। নমগ্যা পর্যন্ত তার ভাঙা-চোরা হিন্দীই তাকে যথেষ্ট সাহায্য করল, কিন্তু শিপ্‌কীতে পৌঁছতেই তার বোবা হয়ে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর রইল না —ভাষাই তো মানুষকে বাচাল করে তোলে। বিস্থন ভাবল, যদি সে, গুম্বায় (বিহারে) যেত, তাহলে সে সেখানকার লোকজনের সঙ্গে মিলেমিশে তিব্বতী ভাষাটা শিখে নিতে পারত। কিন্তু সেই সঙ্গে গুম্বায় যেতে যে ত্যাগ স্বীকার করতে হয়, তাতে সে রাজী নয়। এখন তো ভাষাটা তাকে যাওয়া-আসার পথেই শিখে নিতে হবে।

শিপ্‌কী সীমান্ত এলাকার পর এখন তারা পুরোপুরি তিব্বতের মাটিতে। সেখানে গ্রামগুলো চোদ্দ-পনেরো হাজার ফুট উঁচুতে, যেন আকাশে মাঝপথে ঝুলছে। ঠাণ্ডাকে সে ভয় করে না, কারণ কনৌরদের বারোমাসই পশমী কাপড় পরা অভ্যেস। বাপ এবং তাদের গাঁয়ের আরও কিছু লোক কোনো একটা গাঁয়ের বাইরে তাদের সুতী তাঁবু খাটিয়ে নিলো, তাঁবুর ধারে ধারে দশ-দশ সের করে শস্যদানার এক-একটা বস্তা পর পর সাজিয়ে ফেলল। তারপর তারা তাদের জিনিসপত্রের বিনিময়ে পশম কিনতে শুরু করল। পরিচিত লোকজন এবং ইয়ার

বন্ধুরা সাহায্য করতে লাগল এ-কাজে। ভেড়ার পশম থেকে তারা নিজেদের হাতে সুতো কাটে। বিসুনও সাহায্য করে তার বাপকে। সেখানে অধিকাংশ কথাবার্তা চলে তিব্বতী ভাষায়, ফলে এক-আধটা শব্দ তার কানে এসে আটকে যায়। দু'মাস পরে যখন তারা তিব্বত থেকে ফিরল, তখন বিসুনের মনে হলো, সত্যিই সে দেশ ভ্রমণ করতে গিয়েছিল। সীমান্ত এলাকার সবাই —তা তারা ব্রাহ্মণদের মতো নীতি-আদর্শের বালাই এবং জাতপাতের কড়াকড়ি যতই মেনে চলুক্ না কেন —তিব্বতে গেলে সেখানকার লোকজনের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করে, যদিও তারা জানে যে তিব্বতীদের কাছে গো-মাংস নিষিদ্ধ নয়! কনৌর, নেলঙ্গ, দবুমা ইত্যাদি জায়গার লোকেরা —যারা এখনও বৌদ্ধ ধর্ম অনুসরণ করে, তারা এসব ছোঁয়াছুঁয়ি খাদ্যাখাদ্যের কথা মনেও রাখে না। তিব্বত থেকে ওদের বড় বড় গুরুরা আসেন, তাঁদের দেবতার মতো পুজো-অর্চনা করাটাকে ওরা ওদের পবিত্র কর্তব্য বলে মনে করে, সুতরাং তাঁরা ওদের ম্লেচ্ছ বলতে পারেন কি? বিসুন তো এ-ব্যাপারে খুবই উৎসাহী।

যাদের জীবন অত্যন্ত স্বাভাবিক, তাদের শৈশব-যৌবন বেশি দীর্ঘস্থায়ী হয়। কারণ নাচ-গান ও আমোদ-প্রমোদের বিভিন্ন উপায়গুলিই তাদের জীবনের অঙ্গ হয়ে ওঠে। সেদিক দিয়ে বিসুনকে তার বর্তমান বয়স থেকে পাঁচ বছরের ছোটই বলা যায়। সে ফিরে এসে তার ভ্রমণের নতুন নতুন অভিজ্ঞতার কথা সঙ্গী-সাথীদের কাছে খুব বাড়িয়ে-চারিয়ে বলে বেড়াতে লাগল। যাদের এখনও তিব্বত যাওয়ার সুযোগ হয়নি, তাদের কাছে সে তার গোনা-গুনতি তিব্বতী শব্দ বিকৃতভাবে বারবার উচ্চারণ করে প্রমাণ করতে চাইল, সে হুণিয়াদের ভাষা জানে। কিন্নরেরা আমাদের সীমান্তের এদিকের তিব্বতী ভাষাভাষীদের 'জাড়্' (জাঠ) বলে, আর সীমান্তের ওপারের তিব্বতীদের বলে হুণিয়া বা হুণ। তিব্বতীদের সঙ্গে হুণদের নাম জড়ানো হলো কেন? বস্তুত হুণরা ভারতবর্ষে কোনো কালেই আসেনি। জাড়্ ও হুণ উভয়েই মধ্য এশিয়ার উত্তরে ছিল এবং উত্তরেই থেকে যায়। যে যক্তা বা হেপ্‌তাল ভারতে এসেছিল, তাদের শ্বেত-হুণ নামের এটাই তাৎপর্য যে হুণদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক বহু দূরের।

তিন

বিসুন কয়েক বছর ধরে তার বাপের সঙ্গে তিব্বত যাওয়া-আসা করছে। এখন সে চব্বিশ বছরের যুবক। যদি সে ভাইদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ হতো, তাহলে সম্ভবত পরবর্তী জীবন কিভাবে কাটাবে সে-কথা ভাববার ফুরসৎ হতো না তার, সংসার দেখাশোনার দায়িত্ব পড়ত তার ওপরেই। তার এই তিব্বত-ভ্রমণের ফলে সে তিব্বতীদের ভাষা এবং তাদের চাল-চলন সম্বন্ধে বেশ অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছে।

কৈলাস ও মানস সরোবরের দিকে যাত্রা করার সময়টির জন্যে সে বড় উৎসুক-ভাবে প্রতীক্ষা করে থাকে। পশ্চিমে তিব্বতের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করার জন্যে কনৌরদের মতো শুধু স্থায়ী বাসিন্দারাই নেই, খম্‌বারাও রয়েছে। তাদের জন্ম তো কেবল এই কারবারের জন্যেই। খম্‌বা শব্দের অর্থ খাম্‌-বাসী —খাম্‌ চীনের সীমানাতে অবস্থিত তিব্বতের পূর্ব রাজ্য। এদের কোনো পূর্বপুরুষ কোনো এক সময় খাম্‌ থেকে এসেছিল, সে-সম্ভাবনা খুব কম, কারণ এদের ভাষা ও বেশ-ভূষায় তার কোনো প্রভাব লক্ষ্যগোচর হয় না। খম্‌বারা পুরোদস্তুর ভবঘুরে। শীতকালে ওরা দিল্লী, অমৃতসর ইত্যাদি সমভূমির বিভিন্ন শহরে গিয়ে হাজির হয়, গ্রীষ্মকালে মানস সরোবর অঞ্চল ওদের পায়ের তলায় থাকে। হালকা সুতী তাঁবু ওদের বারো মাসের ঘরবাড়ি। ঘড়ির কাঁটার মতো ওদের পা প্রত্যেক মাসেই এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় গিয়ে হাজির হয়। ওরা কার প্রজা, বলা মুসকিল। সমভূমির যাযাবরেরা হাজার বছর ধরে এশিয়ার বিভিন্ন দেশে বানর, ভল্লুক ইত্যাদি ছোট-বড় বেচাকেনার জিনিস নিয়ে ঘুরে বেড়াত। যতদিন রাজ-নৈতিক এবং অন্যান্য বাধা-নিষেধ চীনের মহাপ্রাচীরের মতো প্রতিবন্ধক হয়ে ওঠেনি, ততোদিন নিজেদের জন্মভূমির সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ছিল, পিছনে পূর্বদিকে সিন্ধু অতিক্রম করার বদলে পশ্চিম দিকে এগিয়ে গিয়েছিল ওরা। মধ্য এশিয়া ও ইরানে লোলী, রাশিয়ায় সিগান, ইউরোপের অনেক দেশেই রোম্‌নী, ইংলণ্ডে জিপ্‌সী, আর স্বয়ং নিজেদের ভাষায় রোম (ডোম) নামে প্রসিদ্ধ হয়ে উঠেছিল। যদিও চেহারায় গঠনে খম্‌বা ও রোমের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে, কিন্তু উভয়ের জীবনধারায় মিলও আছে বিস্তর। খম্‌বারা চীন কিংবা ভারত — কোনো দেশেরই নাগরিক হিসাবে নিজেদের চিহ্নিত করার এখনও কোনো প্রয়োজন বোধ করেনি। কিন্তু এখন আমাদের সীমান্তে লাল রেখা টেনে দেওয়া হয়েছে, তাই ওদের স্বচ্ছন্দ জীবন-প্রবাহ আর আগের মতো চলা সম্ভব নয়। মধুপুরীতে খম্‌বাদের বারো-চোদ্দটি পরিবার বসবাস শুরু করেছে। ওরা তিব্বতের হস্তশিল্পের কিছু কিছু জিনিস নিয়ে এসে, গ্রীষ্মকালে এখানে দেশ-বিদেশের যেসব লোক বেড়াতে আসে তাদের বিক্রী করে, আর শীতকালে দিল্লীর কোনো রাস্তার ধারে ওরা ওদের পণ্য সামগ্রী বিছিয়ে দেয়। তিব্বতে নতুন পরিবর্তন ঘটতেই আমাদের পুলিশের দৃষ্টি পড়ে ওদের ওপর। প্রথম বছরেই দিল্লীতে মঙ্গোলীয় মুখ-চোখের যে দশ-বিশজন পুলিশের চোখে পড়ে তাদের জোর-জবরদস্তি করে বিদেশী আখ্যা দিয়ে ফটো-সমেত পাসপোর্ট তৈরি করে দেয়। সে-বছর মধুপুরীর এইসব লোকের মধ্যেও যথেষ্ট আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছিল। তাদের তিব্বত কিংবা চীনের নাগরিক বলা হয়েছিল। ঘরে তারা তিব্বতী ভাষায় কথা বললেও তাদের অনেকেই তিব্বত কখনো চোখেই দেখেনি।

তিব্বত সরকারের সঙ্গে খম্‌বাদের সম্পর্ক এইটুকুই যেন তিব্বতে গেলে ওরা

সেখানকার অফিসারদের ভারতের কোনো সামগ্রী উপহার দিয়ে থাকে। ভারতে সেটাও করা যায় না। কিন্তু তার মানে এই নয় যে ওদের কোনো সরকার নেই। ওদের রাজা হলো ওদের নিজেদের গোওয়া (প্রধান), তাঁকে মানা না-মানার ব্যাপারে প্রত্যেকেই স্বাধীন। কিন্তু ওরা সব সময় নিজেদের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখতে পারে না। গোওয়া ওদের শাসন-ব্যবস্থার নিরঙ্কুশ প্রধান নন, তাই খম্‌বা জনসাধারণ অযোগ্য গোওয়াকে পদচ্যুত করতে পারে। তাহলেও ওদের সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনো অরাজকতা ছড়িয়ে পড়তে পারে না। কোনো ধনী ব্যবসায়ীই সাধারণত গোওয়া হয়ে থাকেন। ওদের চাষভূমির কোনো সীমারেখা নেই, সেটাই ওদের স্থায়ী ঘরবাড়ি না থাকার একমাত্র কারণ নয়। যখন যে-দেশের মাটি ওদের পায়ের নীচে এসেছে, তখন সেটাই ওদের দেশের মাটি হয়ে উঠেছে। শত শত বছরের অভিজ্ঞতা এবং কলহ-বিবাদের ফলে ওরা নিজের নিজের বাসভূমির সীমানা বেঁধে নিয়েছে। কনৌর-খম্‌বা ওরা, যারা মানস সরোবর থেকে শুরু করে শতদ্রু হয়ে সিমলা ও মণ্ডী অর্থাৎ নীচে পর্যন্ত যাওয়া-আসা করে। ওদের নিজেদের পৃথক গোওয়া আছে। এইভাবে গঙ্গোত্রী থেকে বেরিয়ে আসা ভাগীরথীর তীরে তীরে, তারপর নৈলঙ্গের পথে যে খম্‌বারা তিব্বত যায়, তাদের আলাদা গোওয়া রয়েছে। ভারত থেকে পশ্চিম তিব্বতে ভ্রমণকারী সমস্ত অঞ্চলের খম্‌বাদেরই আলাদা আলাদা মণ্ডল ও সংগঠন ছিল, এখনও রয়েছে।

খম্‌বার জীবন বিস্নুনের খুব ভালো লাগে। তাদের কোনো একটা গাঁয়ের খুঁটিতে বেঁধে রাখার কেউ নেই, জোতজমি চাষাবাদে আটকে রাখার ক্ষমতাও নেই কারোর। এক খম্‌বা যুবকের কথায় —'আমরা যখন তিব্বতে যাই, তখন সেখানে ভাত খাই, মিষ্টি খাই, ওসব ওখানকার লোকের কাছে দুর্লভ বস্তু। আর যখন নীচে যাই তখন সেখানেও দামী-দামী খাবারও আমাদের কাছে ফেলাছড়ার জিনিস। আমাদের মতো খাওয়া-পরার কথা না মানস সরোবরের লোকে ভাবতে পারে, না নীচের লোকে।' বিস্নুনের কাছে কোনো খম্‌বা যুবক তাদের জীবনের মহিমা কীর্তন করেছিল কি করেনি, বলা যায় না। কোনো নোংরা গাঁয়ে না থেকে তারা বাইরে খোলামেলা জঙ্গলে কিংবা উন্মুক্ত প্রান্তরে ডেরা পাতে। মোটা কাপড়ের তাঁবুই তাদের কাছে যথেষ্ট, কারণ বেশি বৃষ্টিপাত হয় এমন জায়গায় তারা বর্ষাকালে থাকেই না। খম্‌বাদের সঙ্গে বিস্নুনের পরিচয় তাদের গাঁয়েই। ওপরের দিকে যাওয়ার সময় কিংবা নীচে ফিরবার সময় কনম্‌-এ ওদের তাঁবু বছরে দু'বার পড়বেই। সে-সময় তারা টুকটাক জিনিস বিক্রী করতে গাঁয়েও আসে। কিন্তু এই জানাশোনা খম্‌বাদের সঙ্গে বিস্নুন (কিসন)-এর কোনো লেন-দেনের ব্যাপার নেই, কারণ সে কনৌর ছেড়ে দূর-দিগন্তে ডানা মেলে দিতে চায়। গুহায় ভিক্ষু হয়ে সে তিব্বত যাত্রা করতে পারে, যদিও তিব্বতের সীমান্ত তাদের গাঁ থেকে দু'দিনের পথ, কিন্তু ভিক্ষুদের পড়াশোনার যেসব বড় বড় বিহার রয়েছে, সেগুলো

সবই লাসায়, আর তিব্বতের ভেতর দিয়ে সেখানে যেতে মাসাধিক কাল লেগে যায়। সেজন্যে লাসার যাত্রীও নীচে নেমে রেলগাড়িতে শিলিগুড়ি পৌঁছয়, সেখান থেকে কালিম্পং হয়ে তিব্বতের পথ ধরে। গাঁয়ের লোকজনের মধ্যে কেউ কেউ তীর্থযাত্রার নিমিত্ত বুদ্ধগয়া কিংবা বেনারস গেছে, কিন্তু যাদের যথেষ্ট পয়সা আছে, কেবল তারাই। বিস্থনের সেরকম কোনো বন্ধুও নেই, তার কোনো প্রয়োজনও বোধ করে না সে। প্রতি বছরের মতো একবার সে তার বাপের সঙ্গে চাঁগথাঁগ গিয়েছিল ভবঘুরে মেষপালকদের কাছ থেকে পশম খরিদ করতে। চাঁগথাঁগ হলো —পশ্চিম তিব্বতে যেখানে তিব্বত শুরু হয়েছে, তার উত্তরে বিশাল নির্জন প্রান্তর। ভেড়া, পশম আর অন্যান্য জিনিস বেচাকেনার জন্যে গ্যানিমা ইত্যাদি বহু হাট-বাজার রয়েছে, সেখানেও কনৌর এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের ব্যাপারীদের মতো খম্‌বারাও যায়। বিস্থন যুবক হিসেবে দেখতে শুনতে বেশ ভালোই। তার চোখে মঙ্গোলীয় মুখচোখের ছাঁচ রয়েছে। চেহারা তো খারাপ নয়ই, বরং আমাদের মাপকাঠিতে তাকে বেশ সুদর্শন যুবকই বলা যেতে পারে। বলিষ্ঠ শরীর, চেহারায় মাঝারি গড়নের চেয়ে একটু বেশিই লম্বা। কয়েক দফা যাত্রার পর এখন সে তিব্বতী ভাষাতেও মাতৃভাষার মতো অনর্গল কথা বলতে পারে। গ্যানিমায় কয়েক দিন থাকতে থাকতে এক খম্‌বা তরুণীর সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা হয়ে গেলো, সেটা প্রেমে পরিণত হতে দেরী হলো না। বাপের কি তা পছন্দ হয় ? ঘরে সমস্ত ছেলে মিলিয়ে তাদের একটি বউ আগে থেকেই রয়েছে। যদি কোনো তরুণ-তরুণী তাদের সমাজের বাইরে কাউকে বিয়ে করে বসে, তাহলে সেটা খম্‌বাদের কাছে খুব একটা গর্হিত কাজ নয়, অবশ্য সেটা মনঃপূত নয়।

একদিন রাত্তিরে দুই তরুণ-তরুণী গ্যানিমা থেকে পালাল। যেখানে কুড়ি মাইল অন্তর গ্রাম, চলতে চলতে দুটি পথের মোড়ে এসে দাঁড়ালে যেখানে পথ বলে দেওয়ার কেউ নেই, সেখানে এটা দুঃসাহসই বলা যায়। তবু দুঃসাহসী বিস্থন তাতে সাহস হারাবার পাত্র নয়। সে আগেও কৈলাস-মানস সরোবর তীর্থযাত্রা করেছে দুটি তীর্থক্ষেত্রই ভারতীয় হিন্দুদের কাছে যতটা পবিত্র, তিব্বতের বৌদ্ধদের কাছেও ততোটা। ওরা ঠিক করে রেখেছিল, এমন সময় ওরা পালাবে, যখন ওদের দু'জনেরই লোকজন নীচে রওনা হওয়ার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠবে। ফলে, ওরা যখন চম্পট দিলো, তখন সঙ্গের লোকজনেরা যদি ওদের খোঁজার চেষ্টা করত, তাহলে প্রথম তুষারপাতেই মানুষ-পশু সকলেরই প্রাণ বিপন্ন হয়ে পড়ত।

চার

শারীরিক পরিশ্রম করতে সে অভ্যস্ত। শুধু বিস্থন নয়, তার প্রেমিকাও মনের মতো বোঝা পিঠে ফেলে গলা ছেড়ে গান গাইতে গাইতে হাঁটতে পারে। গাধা-ছাগল

ভেড়া কি করে পালতে পুষতে হয়, কিভাবে তাদের পিঠে মাল বোঝাই করতে হয়, সে-সবও ওরা ভালো করেই জানে। সাতাশ-আঠাশ বছর আগেকার কথা। তখন গর্ব্যাঙ্গের কারবারীরা এবং খম্‌বারাও মানস সরোবর অঞ্চল থেকে অনেক বেশি পরিমাণে পশম, সোহাগা, চামর ইত্যাদি নানারকম দ্রব্য নীচে নিয়ে যেত বিক্রী করতে। বিস্থন আর তার বউয়ের মজুরের কাজ পেতে কোনো অসুবিধে ছিল না। দেওয়ালীর কাছাকাছি সময়ে তারা গিয়েছিল আলমোড়ার এক মেলায়। মালিকের ছাগল-ভেড়ার পাল দেখাশোনা করার দায়িত্বের সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের পিঠেও পঁচিশ-তিরিশ সেরের একটা করে বোঝা ফেলে নিয়েছিল তারা। তাতে তাদের বিক্রী করার মতো জিনিসপত্র ছিল। নীচের পাহাড় মাঠ-ঘাট তাদের কারোর কাছেই অপরিচিত নয়। আর ভবঘুরেরা তো পরিচিত জায়গার চেয়ে অপরিচিত জায়গাই বেশি পছন্দ করে। মালিকের কাজ শেষ করে মজুরি নিলো তারা। তারপর রানীক্ষেতের পথ ধরে কাশীপুরে গিয়ে হাজির হলো। সেখানে নিজেদের জিনিসপত্র বিক্রী করে যে টাকা হলো, তার সঙ্গে নিজেদের টাকা মিলিয়ে সমস্ত টাকা দিয়ে আবার মালপত্র কিনে ফেলল। পথে অন্য খম্‌বাদের সঙ্গে দেখা হলো, তাদের কাছ থেকে জিনিসপত্রের বদলে একটা সস্তা দামের গাধার বাচ্চা নিয়ে নিলো। কাপড়ের তাঁবু ছাড়া পুরোপুরি খম্‌বা হওয়া যায় না, কোনো এক খম্‌বার কাছ থেকে সস্তা দামে একটা পুরনো তাঁবুও কিনে ফেলল। এবার তারা পাকা খম্‌বা-দম্পতি সেজে মানস সরোবর যাত্রার জন্যে তৈরি হলো।

যতক্ষণ নিয়ম মাফিক কোনো খম্‌বা-দলের মধ্যে সামিল না হওয়া যায়, ততোক্ষণ নানারকম অসুবিধের মুখোমুখি হতে হয়। বিস্থন তার এক কাল্পনিক খম্‌বা বাপের নাম বলল। আর তার বউ তো খম্‌বারই মেয়ে, কিন্তু তার আপনজন খম্‌বারা কোথায়? সেজন্য প্রথা মতো বিবাহ এবং সমাজে প্রবেশ লাভের জন্য গোওয়া ও অন্যান্য খম্‌বা-প্রধানদের স্বীকৃতি আদায় করে নেওয়াটা ওদের খুবই প্রয়োজন, তার অর্থ হলো, মদ-মাংসের একটা খুব জোরালো ভোজ দিতে হবে। প্রথম বছর তাদের অবস্থা এমন ছিল না যে একটা ছোট-খাটো ভোজও দিতে পারে। কিন্তু খম্‌বা মাতব্বরদের অতো তাড়াও নেই। তারা ভবিষ্যতের জন্যে ভোজটা তুলে রেখে দিলো।

বিস্থন খম্‌বা-জীবন কাটাচ্ছে যথারীতি। অনেক বছর ধরে তারা মানস সরোবর থেকে নীচে দিল্লী পর্যন্ত যাচ্ছে ব্যবসা করতে। ভোজও দিয়েছে। গাধা এবং অন্যান্য আসবাবপত্র বন্ধুদের হেপাজতে রেখে বুদ্ধগয়া ও বেনারস গিয়ে তীর্থদর্শন করেও এসেছে। খম্‌বারা যদিও পঞ্চাশ হাঁড়ির ভাত খেয়ে বেড়ায়, তবু তারা ছল-চাতুরী, ঠকবাজি জানে না। তাদের কাজ এদিক থেকে ওদিকে টুকটাক জিনিসপত্র বিক্রী করে বেড়ানো আর আরামে জীবন কাটানো। খুব কম লোকই

গোওয়ার মতো ধনী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে। বাড়ির লোকজনের সঙ্গে দেখা হওয়ার ভয় নেই বিস্নুনের, কারণ তার বিচরণ-ক্ষেত্র তাদের পথ থেকে বহুদূরে। বাপ তো কিছুদিন পরই মারা গিয়েছিল, নইলে সে নিজের ছেলেকে খোঁজাখুঁজির চেষ্টা অবশ্যই করত। বিস্নুন যেমন তার ছোট-বড় ভাইদের ভুলে গেছে, তেমনি তারাও তাকে ভুলে গেছে। কনম্-এ খুব চমৎকার বাড়ি ছিল তাদের, যথেষ্ট জমিজমা ছিল, অনেক গরু-ছাগল-ভেড়াও ছিল। কিন্তু বিস্নুনের কাছে ওসবের কোনো আকর্ষণ নেই। বর্তমান জীবনটা তার এতই পছন্দ যে কনম্-এর কথা তার মনেই পড়ে না।

পাঁচ

গর্ব্যাঙ্গের খম্‌বা হয়ে থাকাটা বিস্নুনের খুব বেশি দিন ভালো লাগল না। একবার সে তিব্বতী হস্তশিল্পের কিছু কিউরিও-সামগ্রী দিল্লী নিয়ে গিয়েছিল বিক্রী করতে। সেখানে গঙ্গোত্রী-নেলঙ্গের খম্‌বাদের সঙ্গে তার দেখা হয়ে যায়। অমনি তার মনে হয়, মানস সরোবর থেকে দিল্লী পৌছনোর এটাই সবচেয়ে সরল ও সুগম পথ। তখন সে ঐ খম্‌বা দলটিতে ঢুকে পড়ে। এক জায়গার খম্‌বা তার নাগরিকতা অন্য জায়গায় বদলে ফেলতে সক্ষম। বিস্নুন বুদ্ধিমান যুবক, স্বভাবটাও তার মিশুকে, তাই ঐ দলটার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলতে অসুবিধে হলো না তার। নতুন খম্‌বা-দলে সামিল হওয়ার ফলে শীতকালে দিল্লীতে ইংরেজ ও অন্যান্য বিদেশীদের কাছে তার কিউরিও-সামগ্রী বিক্রী করার শুধু সুবিধেই হলো না, মধুপুরীতে যাওয়াটাও তার কাছে সহজ হয়ে উঠল। কয়েকটি খম্‌বা-পরিবার ভবঘুরে-জীবন ত্যাগ করে মধুপুরীতে বসবাস করতে শুরু করেছে। তারা মানস সরোবরের দিকে দৌড়ায় না, বরং তারা তাদের পরিচিত অন্য খম্‌বাদের কাছ থেকে জিনিস কিনে নিয়ে সীজনে মধুপুরীতে বিক্রী করে, শীতকালে দিল্লীতে। বিস্নুন ঘুরে-ফিরে মধুপুরী দেখে নিলো, দু-চারদিন রাস্তার ধারে ছাতা খাটিয়ে পশরা সাজিয়ে কিছু জিনিসপত্রও বিক্রী করল। কিন্তু যে ভবঘুরে-জীবনের জন্যে সে বাড়িঘর ত্যাগ করে এসেছে, সেই ভবঘুরে-জীবন ছেড়ে সে মধুপুরীর খুঁটিতে বাঁধা পড়তে রাজী হবে কেন?

কখনো কখনো অবাঞ্ছিত ঘটনাও ঘটে যায়। পার্বত্য পথ বিপজ্জনক। একবার ছাগল-ভেড়া যাতায়াত করা রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে বিস্নুনের পা পিছলে যায়, অমনি সে একশো হাত নিচে গর্তে গিয়ে পড়ে। খবর পেতেই অন্যান্য খম্‌বারা এসে উদ্ধার করে তাকে। ভবঘুরেদের নিজস্ব চিকিৎসক থাকে, নিজস্ব ওষুধপত্রও। ওদের চিকিৎসায় থাকার কালে বিস্নুনের শুধু প্রাণটাই বেঁচে গেলো না, শরীর-স্বাস্থ্যও ভালো হয়ে উঠল। কিন্তু উরু-সন্ধির হাড় ঠিক হলো না।

চিরকালের জন্যে খোঁড়া হয়ে গেলো সে। খোঁড়া হলেও তাতে কিছু যেত-আসত না, যদি সে দ্রুত হাঁটতে পারত। এমন ধীর গতিতে হেঁটে দিল্লী থেকে মানস সরোবর পাড়ি জমানো অসম্ভব। সে-বছরই সে মধুপুরীতে স্থায়ীভাবে বসবাস করার সিদ্ধান্ত নিলো।

মধুপুরীতে এক ডজন খম্‌বা-পরিবারে আরও একটি পরিবার বাড়ল। এখানকার সবচেয়ে পুরনো বাজারে চার হাত চওড়া একটি দোকান-ঘর ভাড়ায় নিয়ে বিস্নুন আর তার বউ ডেরা পাতল। খাওয়া-দাওয়া আমোদ-প্রমোদই হলো খম্‌বাদের জীবন। লাভ যদি কিছু বেশি হয়ে যায়, তাহলে সেই অনুপাতে খরচাও বেড়ে যাবে, তাই খম্‌বারা কারবারে খুব একটা পুঁজি বাড়াতে পারে না। বিস্নুন যথেষ্ট খরচ করে, কিন্তু বাজে খরচ করে না। আশপাশের পাহাড়ী লোক আর শৈলবিহারীদের যেসব জিনিসপত্র দরকার হয়, সেইসব জিনিসে সে তার ছোট্ট দোকানটি সাজিয়ে ফেলল। তার মধ্যে রয়েছে তিব্বতী পেয়ালা, ঢাকনা-ওয়ালা টি-পট, মূর্তি, আবার সেই সঙ্গে চীনের শিল্পকলারও নানারকম ছোট ছোট জিনিসপত্র। ছুঁচ-সুতো, বোতাম, চাকু, আয়না, চিরুণী, মাথার রঙ-বেরঙের ফিতে থেকে শুরু করে গাধা-খচ্চরের গলায় বাঁধার ঘুঙুর পর্যন্ত সবকিছু সেখানে পাওয়া যেতে পারে। ঘরটার ভেতর দিকে চার হাত দৈর্ঘ্য তিন হাত প্রস্থ আর একটা কুঠরি রয়েছে, তারপর ঐরকমই আর একটা কুঠরি। তারপর একটুখানি বারান্দা, সেখানে কয়লার উনুনে তারা রান্নাবান্না সেরে নেয়। ধান-চালের দেশে বিস্নুনদের গ্রাম নয়, সেখানে গম-যবের রুটি চলে, আলু হয় খুব। শাক-সব্জীও পাওয়া যায়। কিন্তু ভবঘুরে জীবনের মানুষ কি আর এক জায়গার খাদ্যাভ্যাসে সন্তুষ্ট থাকতে পারে? তিব্বতে গেলে বিস্নুনকে যবের ছাতু খেতে হতো, আবার নীচে গেলে সে ভাতও খেতো। মাংস রোজই এক-আধটু চাই তার। এখন তো সে নিতান্তই নাচার, মধুপুরীতেই থাকতে হয় তাকে, কিন্তু এখনও সেই আগেকার ভবঘুরে জীবনের কথা ভেবে হা-হুতাশ করে সে।

এখানে পাকাপাকিভাবে বসবাস করতে লাগার বছর দু'য়েক পরেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়। মধুপুরীর কপাল ফিরে যায়। বহু ইংরেজ আর মার্কিন সৈন্য আসতে শুরু করে, তিব্বত-চীনের শিল্প-সামগ্রী তাদের খুব প্রিয়। বিস্নুন দোকানে বসে, তার বউ জিনিসপত্রের বাক্স পিঠে ফেলে হোটেলে হোটেলে ফেরি করে বেড়ায়। হোটেলের কাছাকাছি সে তার দোকান সাজিয়ে বসে, রোজ পনেরো-বিশ টাকা লাভ হয় তাতে। বিস্নুন একা নয়, তার মতো আরও অনেক খম্‌বা ব্যবসায়ী মধুপুরীতে বসবাস শুরু করেছে, আবার কিছু কিছু লোক কেবল সীজনের সময়েই এখানে এসে রাস্তার ধারে বসে জিনিসপত্র বিক্রী করে। যুদ্ধের সময় যেরকম সুযোগ পাওয়া গিয়েছিল, বিস্নুন যদি ইচ্ছে করত, তাহলে দশ-পনেরো হাজার টাকা জমিয়ে ফেলতে পারত সে।

১৯৪৭ সালের আগস্ট এলো, ইংরেজরা চম্পট দিলো এখান থেকে। এখন কিছু বিদেশী লোক আর দিল্লীর দূতাবাসগুলির অল্প-স্বল্প শ্বেতাঙ্গ নর-নারীই কেবল সীজনের সময় এখানে আসে। শুধু তাদের ভরসায় বিস্নুনের মালপত্র আর কতটা কাটতে পারে? মধুপুরীর আর সব দোকানদারদের মতোই খম্বাদের ওপরেও শনির দৃষ্টি পড়ল। এখানে থাকার সময় পুঁজি ভেঙে খেতে হয়, তবু মনে মনে আশা করে, শীতকালে দিল্লী গেলে হয়ত কিছু হতে পারে। অথচ, দিল্লী গিয়েও সেখানে তার অবস্থার বিশেষ কিছু হের-ফের হলো না। কারুকার্য করা চায়ের সরঞ্জাম এবং অন্যান্য জিনিস, খম্বারা যেগুলি তিব্বত-চীনের বলে বিক্রী করে, সেগুলির অধিকাংশই অমৃতসর-দিল্লীতেই তৈরি হয়। আসল জিনিসের চেয়ে সেগুলির সৌন্দর্য ও উৎকর্ষতা কোনো অংশেই কম নয়। তবে হ্যাঁ, কেউ যদি দাম দিতে রাজী থাকে, তাহলে আসল জিনিসও বের করে দিতে পারে ওরা।

ইংরেজরা চলে যাওয়ার পর মধুপুরীতে অন্যান্য ব্যবসায়ীদের মতো খম্বাদের জীবনেও সংকট দেখা দেয়। নিজেদেরই শরীরের চর্বি গলিয়ে গলিয়ে কোনোরকমে টিকে আছে ওরা, খাওয়া-পরার মানও যথেষ্ট নেমে গেছে। কিন্তু, যেদিন থেকে চীনের লাল রঙ তিব্বতে গিয়ে পৌঁছেছে, সেদিন থেকেই তাদের জীবনের সংকট আরও ঘনীভূত হয়ে উঠেছে। আমাদের সীমান্তে খুব কড়াকড়ি শুরু হলো, আর তার প্রতিক্রিয়া গিয়ে পড়ল মধুপুরীর যেসব খম্বা দিল্লী যায়, তাদের ওপর। যে-বউটা বিস্নুনকে খম্বা বানিয়েছিল, সে একটা ছেলে রেখে চলে যায়। তারপর বিস্নুন আর একটা খম্বা মেয়েকে বিয়ে করে। বিস্নুনের শাশুড়ী, শালা এবং অন্যান্য জ্ঞাতিরাও খুব কষ্টের মধ্যে রয়েছে। ঠিক এমন সময় ১৯৪৯ সালে বিস্নুন (কিসন) যখন দিল্লী গেলো, তখন পুলিশ তাকে জোর-জবরদস্তি চীনের নাগরিক বলে ফটো সমেত বিদেশী পাসপোর্ট অর্থাৎ প্রমাণপত্র দিয়ে দিলো। সে-বছর খম্বারা শীতকাল কাটিয়ে মধুপুরী ফিরে আসতেই তাদের মধ্যে দারুণ আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল। দিল্লীতে তারা পুলিশ-অফিসারকে বলেছিল—'আমরা চীনেরও নই, তিব্বতেরও নই। আমরা তো এখানকারই বাসিন্দা। মধুপুরীতেই আমাদের অনেকেই জন্মেছে।' পুলিশ-অফিসারের বক্তব্য—'না, তোমাদের চেহারাই বলে দিচ্ছে যে তোমরা আমাদের দেশের নও, বরং তিব্বতের হতে পারো। অতএব চীনের নাগরিক। তোমরা এই কাগজ নিয়ে ওখানকার পুলিশকে দেখাবে, ওদের নজরের মধ্যেই থাকতে হবে তোমাদের।' ব্যাপারটা শুধু মধুপুরীর খম্বাদের নিয়েই নয়, লাদাক ও স্পিতীর লোকদের নিয়েও। মঙ্গোলীয় মুখ-চোখের গড়নই যে কোনো লোকের বিদেশী বা চীনা হওয়ার পক্ষে যদি যথেষ্ট হয়, তাহলে তো লাদাক থেকে আসাম পর্যন্ত আমাদের লক্ষ লক্ষ মানুষের নাগরিকতা বিষয়ে হাত ধুতে হয়। মধুপুরীতে যেসব খম্বা জন্মগ্রহণ করেছে, তারা আর পাঁচজনের দেখাদেখি নিজেদের কিছু কিছু ছেলেকে লেখাপড়া শিখিয়েছে। দু'জন এফ. এ.

পাস করেছে, একজন বি. এ. পর্যন্তও পড়েছে। ওরা তপসিলী জাতির লোক, কিন্তু ওরা চাকরি-বাকরির জন্যে দরখাস্ত করলে যেসব প্রমাণপত্র চাওয়া হয়, তা দেখলে সেই প্রবাদবাক্যটি মনে পড়ে যায়—'ন' মণ তেলও জুটবে না, রাধাও নাচবে না।'

যে জীবনের আকর্ষণে ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে এসেছিল বিস্থন, নিতান্ত নিরুপায় হয়ে যে জীবন ত্যাগ করে মধুপুরীতে শেকড় গাড়তে হয়েছে তাকে, আজ সে-জীবন পঞ্চাশোধ্ব বিস্থনের কাছে স্বপ্নলোকের কথা বলে মনে হয়। এ-জীবনের চেয়ে 'ভিক্ষে করে খাওয়া গাছের তলায় শোওয়া' যেন বহুগুণে শ্রেয়। এ-বছর ছ'মাস থেকে সে অসুখে শয্যাশায়ী। কয়েকটা ইঞ্জেকশন নিয়েছে, ডাক্তার কবিরাজেরা অনেক ওষুধ গিলিয়েছে, কিন্তু দাদ সারাতে কুষ্ঠব্যাধির মতো অসুখের পেছনেই চার-পাঁচশো টাকা উড়ে গেলো তার। বউ তো একরকম ভেঙেই পড়েছিল, কিন্তু বিস্থন সে-বার যমদূতকে দরজা থেকে ভাগিয়ে দিলো। তখনও সে খুব দুর্বল, কিন্তু কিছু রোজগারপাতির আশায় সে নভেম্বর মাসে সপরিবারে দিল্লী গেলো এবং ১লা এপ্রিল ১৯৫৪ তারিখে কিসন সিং ওরফে বিস্থন সেখানেই তার জীবনলীলা সাঙ্গ করল।

বিস্থনের সারা জীবন সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে নিরুদ্বেগে কাটেনি, কিন্তু সারা জীবনই তার মনটা ছিল খুব উঁচু। অতিথি-সৎকার করাটা সে তার কর্তব্য বলে মনে করত। নিজের লোকজনের কিংবা অপরের বিপদে-আপদে যথাসাধ্য সাহায্য করার চেষ্টা করত সে। তার চারদিকে যখন শুধু নৈরাশ্যের অন্ধকার, তখনও সে তার এই আদর্শ ত্যাগ করতে চায়নি।

গেছোবাবা

উত্তর ভারতের অন্যান্য জায়গার মতো মধুপুরীতেও বর্ষাকাল পনেরোই জুন থেকে পনেরোই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত, কিন্তু তার মানে এই নয় যে পনেরোই জুনে বর্ষা আরম্ভ হয়ে যাবেই, আর পনেরোই সেপ্টেম্বর মেঘ আর একবিন্দুও বৃষ্টিপাত ঘটাবে না বলে হলফ করে বসবে। অথচ এবার ঠিক পনেরোই জুনেই বর্ষা শুরু হলো, আর পনেরোই সেপ্টেম্বরের পরেও লাগাতার বৃষ্টি চলল। পাহাড় না হলে হয়ত এত ঘন বর্ষায় প্রবল বন্যা দেখা দিত, মানুষের দুর্দশার অন্ত থাকত না। মধুপুরীতে এক নাগাড়ে প্রবল বর্ষণের পরিণাম হলো ধ্বস-নামা, কিন্তু এবার তার পরিমাণও খুব কম। পাহাড়ে রাস্তাঘাট তৈরি করা বেশ ব্যয়সাধ্য কাজ। সব সময় নজর রাখতেও হয়। রাস্তাঘাট মেরামতীর ব্যাপারে হয়ত আর পাঁচটা পৌরসভার মতো মধুপুরীর পৌরসভারও অভিমত একটু অন্যরকম। সামান্য ভাঙাচোরা রাস্তা কম খরচে মেরামত করা তাদের পছন্দ নয়। রাস্তায় ফাটল দেখা দিয়েছে, হয়ত এক-আধটু জলও ভেতরে ঢুকতে শুরু করেছে, কিন্তু সেই ফাটলে ধ্বস ছেড়ে আধখানা রাস্তা যতক্ষণ না নীচে নেমে যাচ্ছে, ততোক্ষণ মেরামতের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। একশো টাকার মেরামতীর কাজ যদি হাজার টাকা দিয়ে না করা হবে, তাহলে ঠিকেদার এবং অন্যান্য লোকের লাভ হবে কি করে? এবারে এ রকম দু-চারটি মেরামতের কাজ অবশ্যই হয়েছে, কিন্তু নীচে থেকে মোটরগাড়ি আসা দু-একদিনের বেশি বন্ধ থাকেনি।

মধুপুরীতে বৃষ্টি মানেই ঠাণ্ডা বেড়ে যাওয়া। যখন দু-তিন দিন অবিরাম বৃষ্টি হয়, কিংবা আকাশ মেঘে ঢেকে থাকে আর সেই সঙ্গে এক-আধটু জোর হাওয়াও দেয়, তখন 'পোষের শীত না মাঘের শীত, যখন হাওয়া তখন শীত' প্রবাদ বাক্যটি সার্থক হয়ে ওঠে। এত উঁচুতে শীত বেড়ে যাওয়া মানে সাধারণ শীত নয়। লোকে তোরঙ্গে তুলে-রাখা গরম জামা-কাপড় বের করে পরতে বাধ্য হয়। এমনিতে এটা শৈলবিহারীদের মরশুম নয়, কিন্তু পাঞ্জাবের লোকেরা বর্ষাকে যতটা ভয় পায়, গরমকে ততোটা ভয় পায় না, সেজন্য তারা এই সময় ফাঁকা মধুপুরীকে ভরে তুলতে এখানে আসে, তাই বলে প্রথম সীজনে যত লোক আসে, ওদের সংখ্যাটা তার কাছাকাছি যায়, তা নয়। তবু একথা বলতে হবে, বর্ষার মাস ক'টায় যা এক আধটু জাঁকজমক, তা ঐ পাঞ্জাবী ভদ্রলোক-ভদ্রমহিলাদের দৌলতেই।

বর্ষার জুলাই-আগস্ট মাস দুটিকে আড়ম্বরবহুল করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আরও একটি বিষয় আছে। মধুপুরীতে তিনটে বাজার, তার মধ্যে পূর্বদিকের শহরতলির বাজারটি কেবল শৈলবিহারীদের ভরসায় না থেকে আশপাশের পাহাড়ী লোকের ওপরও কম-বেশি নির্ভর করে। সেজন্যে সেটা বারোমাস একই রকম চলে। বাকি দুটি বাজার বেশির ভাগই শৈলবিহারীদের ওপর নির্ভরশীল। এদের মধ্যে বিচ্‌লা বাজারটা এমন যে সেখানে শীতকালেও প্রায় অর্ধেক দোকানপাট খোলা থাকে। শৈলবিহারীরা মধুপুরী ছেড়ে চলে যেতেই শৌখীন কিংবা দামী জিনিস বিক্রেতারা বুঝে ফেলে যে মধুপুরীতে আপাতত তাদের কাজ শেষ। কিন্তু যারা ডাল-চাল বিক্রী করে, প্রথমত মধুপুরী ছাড়া আর কোথাও তাদের ঠাঁই নেই, দ্বিতীয়ত মাঝে-মাঝে কিছু-কিছু বেচা-কেনা হবেই, এই আশায় পড়ে থাকে তারা। অন্য শহরতলির বাজারটায় শীতকালে দোকানপাট আরও কম খোলা থাকে। বিচ্‌লা বাজার শহরের মাঝখানে, সেটাকেই প্রধান বাজার বা বড় বাজার বলা যেতে পারে। জুলাই মাসে তার জাঁকজমকে এইটুকুই পার্থক্য দেখা যায় যে তখন আর খদ্দেরের অতো ভিড় থাকে না। জায়গাটা শহরের কেন্দ্রস্থলে অর্থাৎ মধুপুরীর যাবতীয় ঘরবাড়ি, বাংলো আর বাজারের মধ্যিখানে অবস্থিত, তাই দোকানদার এবং খদ্দের উভয়ের কাছেই তার গুরুত্ব যথেষ্ট। পাহাড়ের ধারে ধারে হালকা রেখার মতো সড়কের ওপর বাজারের ঘরগুলো তৈরি হয়েছে, তার ফলে খানিকটা দূরেই জঙ্গল হওয়াটা স্বাভাবিক।

কয়েকদিন ধরে বৃষ্টি-বাদলা চলছে। সেজন্যেও বটে, তাছাড়া ঠাণ্ডার জন্যেও, নিতান্ত দরকার পড়লেই মানুষ বাইরে বেরোয়। বাজারের পেছন দিকের রাস্তায় এমনিতেই লোকজন কম চোখে পড়ে। একদিন কে একজন দেখে যে রাস্তা থেকে একটু নীচের দিকে একটা গাছের ওপর গেরুয়া কাপড় টাঙানো রয়েছে, একটা ছাতাও খাটানো রয়েছে। শুধু তাই নয়, ছাতার নীচে গাছের কাণ্ড থেকে যেখানে মোটা মোটা দুটো ডাল দুদিকে বেরিয়ে গেছে, সেখানে কাঠের তক্তা পেতে বসার জায়গা তৈরি করা হয়েছে, চারদিকে দড়ি দিয়ে এমন মজবুত করে ঘিরে দেওয়া হয়েছে যাতে সেখানে বসে থাকলে পড়ে যাওয়ার ভয় না থাকে। ভালো করে দেখতে গিয়ে চোখে পড়ল, গেরুয়া কাপড়ে আপাদমস্তক ঢেকে সেখানে একজন চুপচাপ বসে রয়েছে। মুখে মুখে খবর ছড়িয়ে পড়তে দেরী হলো না, কিন্তু দু-একদিন পর্যন্ত লোকে সেটাকে মোটেই গুরুত্ব দিলো না, যদিও এমন ভীষণ বৃষ্টিতে ঠাণ্ডায় গাছের ওপর দিনরাত বসে থাকাটা রীতিমতো অবাক কাণ্ড। দেখার জন্যে কখনো-সখনো এক-আধজন স্ত্রী-পুরুষ গাছের কাছে যায়, দেখে, পাথরের মূর্তির মতো বসে আছে লোকটা, নড়ন-চড়ন নেই। তিন-চার দিনের মধ্যেই হাওয়ায় খবর ছড়িয়ে পড়তে লাগল, একজন সাধু মহাত্মা বড় বাজারের কাছে গাছে বসে তপস্যা করছেন, কিছু খান না, কারোর সঙ্গে কথাও বলেন না।

সকাল থেকে সন্ধ্যের অন্ধকার ঘনিয়ে আসা পর্যন্ত বহু লোক সেখানে গিয়ে দেখে এলো, গেছোবাবা গাছের মতোই স্তব্ধ অটল হয়ে বসে আছেন। মুখখানা কেমন, কেউ দেখেনি। সপ্তাহ কাটতে-না-কাটতেই গেছোবাবার অলৌকিক কীর্তি-কলাপ ও নানা গল্প-কাহিনী লোকের মুখে মুখে ঘুরতে লাগল —কিছু খান না তিনি, তাঁর প্রাতঃকৃত্যেরও দরকার হয় না, সব সময় ধ্যানে মগ্ন থাকেন।

কিছু না খেয়ে সপ্তাহ খানেক কাটিয়ে দেওয়া এমন কিছু কঠিন নয়। কে একজন সন্দেহ প্রকাশ করেছিল, হয়ত রাত্তিরবেলা গেছোবাবার কাছে খাবার টাবার পৌঁছে দেওয়া হয়, তাতে কয়েকজন তো হলফ করার জন্যে এক পায়ে খাড়া —'আমরা রাত জেগে পাহারা দিয়েছি; দেখেছি, গেছোবাবা ঐরকমই তাঁর আসনে বসে থাকেন।' বর্ষার দিন, তেষ্টা মেটানোর জন্যে ভিজে কাপড় থেকেই জল পাওয়া যেতে পারে, তবুও ভক্তরা বলে বেড়ান, তিনি না-কি জলও খান না।

দুই

প্রথম সপ্তাহের পর দ্বিতীয় সপ্তাহ কাটল। গেছোবাবা সেই একই রকম তাঁর আসনে নিশ্চল হয়ে বসে আছেন। এখন মধুপুরীর ঐ নির্জন খাঁ-খাঁ করা রাস্তাটায় যেন মেলা বসে গেছে। যখন বৃষ্টি হয় না, তখন তো মনে হয়, সারা মধুপুরী যেন হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। মেয়েরা ফুলের মালা ও অন্যান্য পুজোর সামগ্রী নিয়ে বসে থাকে, পুরুষেরাও তেমনি ভিড় জমায়। সাধারণ অশিক্ষিত লোকের সংখ্যা খুব কম। বাইরে থেকে আসা আপ-টু-ডেট তরুণ-তরুণীরা নীচে থেকে কিংবা ওপর থেকে গেছোবাবার কাছে যাওয়ার রাস্তাগুলোয় ভিড় জমায়। গেছোবাবা যখন একটা মেলাই বসিয়ে দিয়েছেন, তখন মেলার সব জিনিস এসে জড়ো হওয়া তো দরকার। চেঙারিতে করে খাবার নিয়ে খাবারওয়ালা এসে হাজির। তেমনি পানওয়ালাও এসে জুটল। গরম গরম ছোলা-ভাজার ফেরিওয়ালা এখন রাস্তা ছেড়ে এখানে এসে গলায় সুর তুলে হাঁকতে আরম্ভ করেছে। চিত্রতারকাদেরও হার মানিয়ে দেয় এ রকম সুন্দরী তরুণীরা তাদের হ্যাণ্ডব্যাগ থেকে আয়না বের করে ঠোঁটের লিপস্টিক ঘন ঘন ঠিক করে নেয়। গম্ভীর প্রকৃতির লোকেরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অন্য কিছু আলোচনা করে। মধুপুরীতে প্র্যাক্টিস করা দু'জন ভালো উকিল কোট-প্যাণ্ট পরে আর মাথায় ফেল্ট-হ্যাট লাগিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গেছোবাবাকে দেখছেন। এমন সময় তাঁদের কাছ দিয়ে একজন পরিচিত ব্যক্তি যাচ্ছিল, তাকে দেখে উকিল দু'জন আর নিজেদের সামলাতে পারলেন না, গেছোবাবাকে দেখিয়ে তাঁরা ইংরেজিতে কথা বলে থামালেন তাকে। তারপর গেছোবাবার মাহাত্ম্য কীর্তন শুরু করলেন। কোট, প্যাণ্ট, হ্যাট যাই হোক,

আধুনিক খাদ্যাখাদ্যের ব্যাপারেও হয়ত খেয়াল থাকে না, কিন্তু উকিল সাহেব দু'জনই সনাতন ধর্মের পূজারী। গেছোবাবার গেরুয়া কাপড় ঝুলছে না তো যেন সনাতন ধর্মের বিজয় পতাকা উড়ছে। লোকে চোখের সামনে ধর্মের মহাশক্তি লক্ষ্য করছে। সাধারণ মানুষ বলাবলি করছে —'এমন মহাত্মা না থাকলে দুনিয়া চলছে কি করে?' তাদের মতো একই ভাবায় উকিল সাহেব দু'জনও বলছিলেন — 'হ্যাঁ, ধর্মকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে সাধু-সন্ন্যাসীরা এখনও রয়েছেন, পৃথিবী একেবারে ফাঁকা হয়ে যায়নি।'

এমন ঠাণ্ডায় চব্বিশ ঘণ্টা গাছের ওপরে বসে বসে ভিজতে থাকাটা তো আশ্চর্য বটেই, তার ওপর, এসব কথায় বিশ্বাস না থাকলে এত লোকজন তাঁকে দেখতে আসছে কেন? আমার এক বন্ধু নিজেই কয়েক বছর কঠোর তপস্যা করেছেন। ঋষিকেশে গঙ্গার পারে, যেখানে জঙ্গলে এখনও বুনো হাতি ঘুরে বেড়ায়, সেখানে এক নির্জন স্থানে গেছোবাবা হয়ে তিনি কয়েকমাস কাটান। হাতিরা হয়ত গেছোবাবাটিকে নিজেদের মর্জি মাফিক পুজো করত, কিন্তু ধর্মপরায়ণ হওয়া সত্ত্বেও গেছোবাবা খুব মোটা একটি গাছ বেছে নিয়েছিলেন। গাছের যেসব ডালপালায় তিনি শোওয়া-বসার জন্যে মাচা তৈরি করিয়ে নিয়েছিলেন, সেগুলো তেমনি বড়-সড় হাতিরও শুঁড়ের নাগালের বাইরে। হাতি রাত্তিরবেলা ওদিকে যেত, কারণ গঙ্গা কাছেই, মানুষের ভয় আছে। একবার নদীর ধারে একটি ছোট হাতির বাচ্চা পাথরের ফাঁকে আটকে গিয়েছিল। হাতিরা কয়েক ঘণ্টা ধরে তাকে বের করে আনার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু বের করতে পারেনি। সকাল হয়ে আসতে দেখে হাতির পাল বাচ্চাটাকে ওখানেই ফেলে রেখে পালিয়ে গিয়েছিল। গেছোবাবার নিজের মাহাত্ম্য কাউকে দেখানোর ইচ্ছে ছিল না, নইলে ঋষিকেশ শহরের কাছেই তিনি কোনো একটা গাছ বেছে নিতেন। ঐ জঙ্গলে কিছু দূরে দুধ-বিক্রেতা গোয়ালাদের ডেরা ছিল। ওদের কাছে গেছোবাবার দুধের ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছিল। তিনি কেবল দুগ্ধাহারী ছিলেন। নির্জন জঙ্গলে থাকা গেছোবাবার কীর্তি-কাহিনী ঋষিকেশেও গিয়ে পৌঁছেছিল। বোম্বাইয়ের এক ভক্তিমান শেঠ তাঁকে দর্শন করতে এসেছিলেন। তিনি কিছুতেই শুনলেন না, গোয়ালাদের কাছে দুধের পাকাপাকি ব্যবস্থা করে আগাম টাকা-পয়সা দিয়ে গেলেন তিনি। সেই গেছোবাবাটি অত্যন্ত নিষ্ঠা-সহকারে হিন্দুধর্মের যাবতীয় জপ-তপ ধ্যান-যোগ চালিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর দোকান চলেনি। আর ষাট বছর বয়স অতিক্রম করে এখন তিনি ঘোর নাস্তিক।

ভূতপূর্ব গেছোবাবাও এই নতুন গেছোবাবাকে গিয়ে দেখলেন। ভেতরের কথা ফাঁস করে দেওয়ার জন্যেই হোক, কিংবা যাতে তিনি নিজে অসফল হয়েছেন, অন্যকে তাতে সিদ্ধিলাভ করতে দেখে মনে মনে ঈর্ষা বোধ করেই হোক, তিনি বললেন, 'তপস্যা করার ইচ্ছে থাকলে কোনো জঙ্গলে যেত। এখানে মধুপুরীর

সবচেয়ে বড় বাজার থেকে একশো পা দূরে গেছোবাবা হওয়া কেবল ধাপ্পাবাজী।'

তাঁর বন্ধু বললেন, 'ভারতে যেখানেই যান না, উত্তর থেকে দক্ষিণ, পুব থেকে পশ্চিম—সর্বত্রই দেখতে পাবেন, ধর্মের ছোট-বড় দোকান খোলা রয়েছে। এইসব ধর্মের শেঠরা তাদের পণ্যের প্রচারের জন্য নতুন নতুন পদ্ধতি প্রয়োগ করছে। এখন তো যারা নিজেদের পণ্য ইংরেজি কায়দায় মানুষের কাছে হাজির করতে পারে, তাদের দোকানের সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। ওদের শিষ্যদের ভেতর ইংরেজি ডিগ্রীধারী স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যা যথেষ্ট। দু-চারজন শ্বেতাঙ্গ-শ্বেতাঙ্গিনী ভক্ত যদি জুটে যায়, তাহলে কি আর কিছু বলার আছে? কোটিপতি শেঠরা জানে, ধর্ম আর অন্ধবিশ্বাসের পাল্লা যত ভারী থাকবে, ততোই মঙ্গল তাদের। এজন্যেই তারা তাদের পত্র-পত্রিকায় এই সব সাধু-সন্ন্যাসীদের মহিমা কীর্তন করার জন্যে বিভাগ খোলে।'

এই দুই বন্ধু এবং তাঁদের মতো স্বাধীন চিন্তা-ভাবনা করেন এ রকম আরও কিছু কিছু মানুষও মধুপুরীতে রয়েছেন। যদি তাঁদের কথা চলত, তাহলে গেছোবাবাকে মাস খানেক চুপচাপ গাছে ঝুলে থেকে খালি হাতে নেমে পালাতে হতো। কিন্তু আজকাল যারা 'ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ' নীতি মেনে চলে তারাও চার্বাকের মতো নাস্তিক হয় না। গেছোবাবা কথা বলেন না, এমন কোনো ব্যবস্থাও নেই যে তাঁর সঙ্গে একান্তে ইশারা-ইঙ্গিতে কথাবার্তা চলতে পারে, নইলে এদের অনেকেই তাঁর কাছে গিয়ে নিজেদের ভাগ্য দেখিয়ে নিত, কিংবা এমন কোনো মন্ত্র-তন্ত্র লাভ করার চেষ্টা করত যা দিয়ে তাদের আধিদৈবিক, আধিভৌতিক এবং আধ্যাত্মিক—সবরকম ব্যাধিই দূর করা যায়। গেছোবাবা জানেন, মধুপুরীর মতো শহরেও ভক্তিমানের অভাব নেই, বরং মধুপুরী ভক্তিমানে থৈ থৈ করছে। দু-এক ডজন নাস্তিক তাঁর কিছুই করতে পারবে না, তাদের কথাবার্তা শুনে ভড়কে যাবে না কেউ। ভক্তিমানেরা তাদের মুখের মতো জবাব দিতে পারে, 'যদি কিছু না হয়, তবে যাও না তুমিও একটা গাছে উঠে চব্বিশ ঘণ্টা এই বৃষ্টি আর ঠাণ্ডায় বসে থাকার চেষ্টা করে দেখো না একটু!'

তারপর হয়ত আর হপ্তা খানেকও কাটেনি; খবর পাওয়া গেলো, গেছোবাবা দিনে একবার কয়েক মিনিটের জন্যে মুখের আবরণ উন্মোচন করে তাঁর ভক্ত স্ত্রী পুরুষদের দর্শন দিচ্ছেন। এর জন্যে তিনি সময় ঠিক করেছেন দুপুরবেলা। গেরুয়া কাপড়ে ঢাকা মূর্তি কয়েক মিনিটের জন্যে রাস্তার দিকে তাঁর মুখখানা খুলে দেন। ভক্তরা গদগদ কণ্ঠে জয়ধ্বনি দেওয়ার জন্যে উন্মুখ হয়ে ওঠে। কিন্তু তাদের প্রথমেই সাবধান করে দেওয়া হয়েছিল, বাবা মৌনাবস্থায় ধ্যানে মগ্ন থাকেন, এ রকম হৈ-হট্টগোল শুনতে চান না তিনি। গেছোবাবা যে সিদ্ধ পুরুষ, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তাঁর ঠাঁই-ঠিকানা সম্বন্ধে কোনো কিছু জানা যাবেই বা কার কাছে? কোনো সাধু-সন্ন্যাসীকে গাছটির কাছাকাছি আসতেই দেখা

যায় না। তবুও বাবার চব্বিশ ঘণ্টার আচার-অনুষ্ঠানের কথা মধুপুরীর পথে-ঘাটে শোনা যায়। বাবা অমুক সময় দর্শন দেন —সেকথা লোকজনকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। একথাও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে বাবা পুরো এক মাস এখানে তপ করবেন। তারপর তিনি ব্রত উদ্‌যাপন করে চিরদিনের মতো উত্তরাখণ্ডে চলে যাবেন। হিমালয়ের কোনো এক গুহা থেকে তিনি না-কি এসেছেন। তাঁর বয়স না-কি হাজার বছরের ওপর, একথা বলার এবং বিশ্বাস করার মতো লোকেরও অভাব নেই। সত্যি-সত্যিই এক মাস মধুপুরীতে ধর্মের প্লাবন দেখা দিয়েছে, আর্যসমাজীদের মুখ-চোখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। এখানকার দোকানদারদের মধ্যে সনাতন ধর্ম পন্থী এবং আর্যসমাজী উভয়ই রয়েছে। আর্যসমাজীরা যুক্তি-তর্কে সনাতন-পন্থীদের একেবারে ধরাশায়ী করে দিতে চায়, আর এখানে গেছোবাবা অচল-অটল ও মৌন হয়ে থেকে ওদের হাজার হাজার যুক্তি-তর্কের জবাব দিয়ে চলেছেন। আর্যসমাজের গৃহিণীরাও ভক্তি প্রদর্শন করার দিক দিয়ে পিছিয়ে নেই। এই মুহূর্তে পরিষ্কার দেখা গেলো যে মৌখিক প্রোপাগাণ্ডা ব্যবহারিক প্রোপাগাণ্ডার চেয়ে অনেক দুর্বল। যেভাবে গেছোবাবাকে সত্যযুগের মুনি-ঋষি বলা হচ্ছে, ঠিক তেমনি তাঁর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যকেও অনন্ত বলে উল্লেখ করা হচ্ছে। কারণ মৌন হয়ে থাকলে মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধির কি আর হদিস পাওয়া যায়?

তিন

গেছোবাবার এক মাসের তপ পূর্ণ হলো। তিনি কখন গাছ থেকে অবতরণ করবেন, সেটা আগে থেকেই ঠিক ছিল। সে-সময় কাছের পাহাড়টার ওপর তিল ধারণের জায়গা রইল না। সমস্ত জায়গাটা জেণ্টলম্যান এবং লেডী, সাধারণ মানুষজন, ছেলে-মেয়েতে লোকারণ্য হয়ে উঠল। এক-আধজন পা পিছলে পড়েও গেলো, কিন্তু গেছোবাবার অদ্ভুত ক্ষমতায় কারোর অঙ্গহানি হতে দেখা গেলো না। গেছোবাবাকে দর্শন করার জন্যে হিন্দু কিংবা ভারতীয়রাই শুধু নয়, এমনকি এই সময় মধুপুরীতে থাকা ইউরোপীয় নর-নারীরাও নিজেদের আর সংযত রাখতে পারল না। গেছোবাবার প্রচার এমন নিঃশব্দে সুব্যবস্থার সঙ্গে চলছিল যে, পৌর প্রধান নির্বাচনের প্রচারও তার কাছে হার মানে। সমস্ত ব্যাপারেই এক ধরনের ব্যবস্থাপনা ও নিয়ম-শৃঙ্খলা লক্ষ্য গোচর হচ্ছিল। গাছ থেকে অবতরণের সময় কে জানে কোত্থেকে বাজনা এসেও হাজির। বর্ষার এই কয়েক মাস মধুপুরীতে নানারকম ফুল পাওয়া যায়, লোকের হাতে হাতে সেইসব ফুলের মালা চোখে পড়ছে। গেছোবাবা এখনও তাঁর মুখের আবরণ উন্মোচন করেননি। মধ্য এশিয়ার জনৈক সিদ্ধ পুরুষ তাঁর মুখখানা সব সময় সবুজ কাপড়ে ঢেকে রাখতেন, লোকে তাঁর চেহারার জ্যোতি সহ্য করতে পারবে না বলে। সম্ভবত গেছোবাবাও এই রকমই কিছু ভেবে

থাকবেন। বড় বাজারে গেছোবাবার গাছের কাছেই নতুন একটি বাড়ি তৈরি হয়েছে। বিশাল বাড়ি। তাতে দোকানের জন্যে বড় বড় হল-ঘর রয়েছে। হাজার হলেও মধুপুরীর বাড়িওয়ালারাও তো ধর্ম-কর্ম মেনে চলেন। নতুন বাড়িটায় তখনও দোকানপাট বসেনি। গেছোবাবাকে একটি হল-ঘরে আনা হলো। মুখ ঢাকা অবস্থায় এক পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। তাঁকে সম্পূর্ণ ভাগবত পাঠ শোনাতে হবে, পাঠ শেষ হলে এক হাজার ব্রাহ্মণকে ভোজন করাতে হবে। মধুপুরীর স্থায়ী বাসিন্দারা এমনিতেই আজকাল সব সময় মন্দা বাজারের দোহাই পাড়ে, কিন্তু গেছোবাবার জন্যে তাদের সেই খালি হাতে না-জানি কোত্থেকে অঢেল টাকা-পয়সা এসে গেছে। গেছোবাবার যজ্ঞে হাত উপুড় করে পয়সা দিলো তারা। এক ডজন ব্রাহ্মণকে বসিয়ে দেওয়া হলো ভাগবত পাঠ করতে। দু'বেলা তাঁদের লুচি-মিষ্টি আর ভালো ভালো খাবার জোটে, তার ব্যবস্থাপনার ভার দেওয়া হয়েছে ময়রাদের ওপর। গেছোবাবা এক পায়ে সারাদিন দাঁড়িয়ে থাকেন, যারা খোঁজ-খবর রাখে, তারা বলে, রাত্তিরেও তিনি না-কি দাঁড়িয়ে থাকেন ঐভাবে। তাঁর তেজ এবং তপস্যার প্রচারে লুচি-মিষ্টি খাওয়া ব্রাহ্মণরাই সকলের আগে। দেখতে দেখতে লোকে পাঁচ হাজার টাকা জমিয়ে ফেলল। পাঠ ও যজ্ঞের উদ্দেশ্যে যে থালা পেতে দেওয়া হয়েছে, তাতেও টাকা-আধুলি-সিকির বৃষ্টি হচ্ছে যেন।

গেছোবাবার যজ্ঞ ও দর্শন থেকে যারা ফায়দা ওঠানোর সুযোগ পেয়েছে, তারা প্রচার করে বেড়াচ্ছে, গেছোবাবার কাছে গেলেই মানুষের মনে দিব্য ভাব জেগে ওঠে। যাঁরা গীতা পড়েছেন, তাঁদের কেউ কেউ বলেন—'ওখানে কোনো আসুরিক সম্পদ থাকতে পারে না, কেবল দৈব সম্পদেরই স্থান ওটা।' মধুপুরীতে শুধু বিলাসী লোকেরাই আসে, তা নয়, এখানে এই শ্রেণীটাকে উদ্ধার করার দায় সামলাতে বহু হিজ হোলিনেস্, শঙ্করাচার্য ও সিদ্ধকাম পুরুষেরাও আসেন। বিশেষ করে যখন থেকে মধুপুরী শ্বেতাঙ্গদের হাত থেকে কৃষ্ণাঙ্গদের হাতে এসেছে, তখন থেকে এখানে গেরুয়াধারী কিংবা জটাধারী সাধু-সন্ন্যাসীর অভাব নেই। এখন তো শঙ্করাচার্যের লোকেরা এসেও এখানে সারা বছর বসবাস করছেন। আর যখন সত্যযুগেও রাজপ্রাসাদ মহাত্মাদের বাণী ও চরণধূলি থেকে বঞ্চিত হতো না, তাহলে কলিযুগের এই চলমান তীর্থ আমাদের সাধু-সন্ন্যাসীরা কি করে সংসার-পাঁকে আবদ্ধ বিলাসী লোকগুলোকে ডুবে মরার জন্যে ছেড়ে দিতে পারে? কিন্তু অন্যান্য সাধু-সন্ন্যাসী ও গেছোবাবার মধ্যে বিস্তর ফারাক। মধুপুরীর শৈলবিহারীরা প্রায় সকলেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর, শুধু শিক্ষিত নয়, তাদের শতকরা প্রায় একশো জনই ইংরেজি জানা লোক—মহিলাদের মধ্যেও সম্ভবত খুব অল্প সংখ্যক শেঠানীই রয়েছে, যারা ইংরেজি জানে না। এইসব লোকের ওপর মোটা দাগের বুজরুকিতে কাজ হয় না। এদের ওপর প্রভাব খাটাতে হলে কিছু বিদ্যা-বুদ্ধির দরকার।

সেজন্যে যেসব সাধু-সন্ন্যাসীদের আপ-টু-ডেট টেকনিক আছে, কেবল তাঁরাই ওদের নিজেদের দিকে টানতে পারেন। যখন গেছোবাবার আসার খবর মধুপুরীতে প্রথম ছড়িয়ে পড়ে, তখন অনেকেই—যারা একেবারে ভক্তিশ্রদ্ধাহীন নয়, তারাও বলতে শুরু করে, 'এটা অত্যন্ত ক্রুড টেকনিক (মোটা দাগের বুজরুকি)। গাছের ওপর বসে বসে আজকাল বহু বাঁদরই ভিজছে, তাই বলে কেউ তাদের পেছনে পেছনে হা-পিত্যেশ হয়ে ঘুরে বেড়ায় না।' ভদ্রলোকদের বিশ্বাস অদ্বৈত-ব্রহ্মের ওপর যাঁর চমৎকার সারমন দেওয়ার ক্ষমতা আছে, তিনিই কেবল শিক্ষিতদের আকর্ষণ করতে পারেন। গেছোবাবা যদি হপ্তা খানেকের মধ্যে সিদ্ধিলাভ করতে চাইতেন, তাহলে অবশ্য তাঁকে নিরাশ হতে হতো। কিন্তু তাঁর মহামন্ত্র—'এসেছি যখন তোমার দ্বারে, কিছু না নিয়ে যাব না ফিরে।'

গেছোবাবা যে কিছু একটা বটে, সে কথা সন্দেহবাতিকরাও স্বীকার করতে বাধ্য হলো। তিনি মধুপুরীতে যখন থেকে আছেন, বরাবর মৌন অবলম্বন করেই আছেন। কিন্তু তাঁর সান্নিধ্যে যাওয়া মাত্রই লোকে ভীষণ লাভবান হয়েছে। লোভ তাঁকে স্পর্শও করতে পারেনি। টাকার বৃষ্টি হয়ে চলেছে, কিন্তু তা হাতে ছোঁয়া তো দূরের কথা, ওদিকে তাকানোর ইচ্ছেও নেই তাঁর। যা কিছু এসেছে, সবই দান-ধ্যানে চলে গেছে। এই দান-ধ্যানের সবচেয়ে বড় পাত্র মধুপুরীর ব্রাহ্মণ দেবতারা—যাঁরা এখানকার সবচেয়ে দুর্গত মানুষ। যদি না মধুপুরীতে কিছু সেকেলে ধরনের দোকানদার থাকত, তাহলে তো তাদের না খেয়েই মরতে হতো। ব্রাহ্মণদের ভোজন করালে দক্ষিণা দিলে যে ফল লাভ হয়, হা-ভাতে কাঙালদের ভোজন করালে কি তা হতে পারে!

এমনিতে প্রথম সপ্তাহেই গেছোবাবার প্রতি যারা নাস্তিক মনোভাব পোষণ করত, তাদের জোর কমে গিয়েছিল। কিন্তু গাছ থেকে নেমে তাঁর এক পায়ে দাঁড়িয়ে ভাগবত-পাঠ শোনার সপ্তাহ কাটতে না কাটতে এমন অবস্থা হলো যে, কোনো নাস্তিকের পক্ষে আর মধুপুরীতে থাকা যেন মঙ্গলজনক নয়। শিক্ষিত অশিক্ষিত, যুবক-বৃদ্ধ, স্থায়ী বাসিন্দা, শৈলবিহারী—সকলের মধ্যেই ভক্তির বন্যা বয়ে গেলো। চারদিকে ভক্তির প্রখর কিরণচ্ছটা এমন বিকীর্ণ হতে লাগল যে লোকের চোখ ধাঁধিয়ে গেলো। সিনেমা-হল কিংবা ক্লাব-ঘর রাস্তা কিংবা বাংলো—সর্বত্রই গেছোবাবার আলোচনা। শুধু ভারতীয়দের ঘরেই নয়, অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান এবং ইউরোপীয়ান পরিবারেও গেছেবাবাকে নিয়ে চর্চা চলেছে—কিছু কিছু লোক টীকা-টিপ্পনীও কাটে, কিন্তু পরস্পর একমত হয়ে নয়। ক্যাথলিকেরা সাধুদের কেরামতিতে বিশ্বাস রাখে। এই তো এই বছরই ইটালীর কোনো এক গ্রামে ম্যাডোনার মাটির মূর্তির চোখ দিয়ে কয়েকদিন ধরে জল গড়িয়েছে। হাজার হাজার নর-নারী স্বচক্ষে তা দেখেছে। তাছাড়া খবরের কাগজগুলো মিথ্যে কথাই বা বলতে যাবে কেন? তাদের বক্তব্য অনুযায়ী রাসায়নিক

বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, ম্যাডোনার সেই চোখের জল ঠিক মানুষের চোখের জলের মতোই। ক্যাথলিকদের মধ্যে গেছোবাবা সম্পর্কে এক-আধটু সন্দেহ যদি থাকেই, তা শুধু এই কারণে প্যাগান (বিধর্মী) সাধু এমন কেরামতির ক্ষমতা লাভ করলেন কি করে?

ভাগবত-সমাপ্তির সময় কাছিয়ে আসছে। ব্যাখ্যান-সহ পাঠ করলে আরও সময় লাগত। কেবল দ্রুত পাঠ করে শেষ করা হচ্ছিল ওটা, গেছোবাবা সর্বজ্ঞ বলেই তা বুঝতে পারছিলেন, নইলে যাঁরা ভাগবত পাঠ করছিলেন, তাঁদের নিজেদেরও খুব একটা বোধগম্য হচ্ছিল না। সকলেরই ইচ্ছে, পাঠ যেন তাড়াতাড়ি শেষ না হয়, গেছোবাবা যাতে আরও কিছুদিন তাদের মধ্যে থাকেন।

যজ্ঞ সমাপনের দিন এলো। সেদিন মধুপুরীর নাগরিকেরা তাদের ভক্তির চরম প্রকাশ দেখাতে চাইল। যত ব্যাণ্ড বাজনা রয়েছে, সমস্ত ভাড়া করে আনা হলো। বাবাকে নিয়ে আজ শোভাযাত্রা বেরোবে। সাধারণ দোকানদারদের তো কথাই নেই, পাশ্চাত্ত্য রঙ-ঢঙের আধুনিক শিক্ষা-সভ্যতায় মোড়া ফ্যাশন ও শখ-তামাশার দামী-দামী জিনিস বিক্রী করে যেসব দোকানদার, তারা প্রায় সবাই নিজের নিজের দোকানকে সাজালো সেদিন। রাস্তায় কয়েক জায়গায় তোরণ নির্মাণ করা হলো। যদিও মধুপুরীর মালপত্র বওয়া রাস্তায় ম্যাজিস্ট্রেটের বিনা অনুমতিতে গাড়ি চালানো যায় না কিন্তু গেছোবাবার কার্যে ম্যাজিস্ট্রেট কেন লাটসাহেবের অনুমতিও সহজেই মিলে যেতে পারে। রাজ্যের লাটসাহেব স্বয়ং এক ধর্মপ্রাণ মহাপুরুষ। তিনি সব সময় হিন্দুধর্ম, হিন্দু সংস্কৃতি ও হিন্দু গৌরবের কথা বলতে বলতে আপসোস করেন, শেষনাগের মতো তাঁর যদি সহস্র জিহ্বা থাকত! কিন্তু গেছোবাবার ওসব পছন্দ নয়। গাড়ির কি দরকার তাঁর? তিনি মৌন হয়ে রয়েছেন, কিন্তু তাঁর হাব-ভাবে লোকে আপনা-আপনি বুঝে ফেলল যে, তিনি বলছেন—'আমার সবচেয়ে বড় গাড়ি আমার এই পা দু'খানি। এই পায়ের সাহায্যে আমি হিমালয়ের সর্বোচ্চ শিখরে বিচরণ করি।' বাবার জন্যে গাড়ি নয়, রিকশার ব্যবস্থা করা হলো। তিনি সেই রিকশায় চড়ে কখনো মুখ ঢেকে, কখনো-বা মুখখানা একটুখানি খুলে, নরনারীর ভিড়ের মধ্যে মধুপুরীর একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত পথ পরিক্রমণ করলেন। পথে সর্বত্র পুষ্পবৃষ্টি, পদে পদে কর্পুরের আরতি। ভক্তরা কোথাও তাঁর পায়ে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে, কোথাও-বা তাঁর পদধূলি নিয়ে চোখে ও মাথায় স্পর্শ করে। গেছোবাবা একই রকম মৌন হয়ে থেকে কয়েক ঘণ্টা সেই শোভাযাত্রায় কাটালেন। সত্যি-সত্যিই কোনো অলৌকিক ক্ষমতার চেয়ে সেটা কম নয়। গেছোবাবা যদি কথা বলতেন, তাহলে তাঁকে তাঁর একটি মুখেই কথা বলতে হতো, অথচ সেখানে হাজার হাজার মুখ প্রস্তুত হয়ে আছে তাঁর হয়ে কথা

বলার জন্যে। সব জায়গায় 'গেছোবাবা কী জয়' ধ্বনি দেওয়া হচ্ছিল, কিন্তু শোভাযাত্রা যখন আর্যসমাজের মন্দিরের কাছে এসে পৌঁছল, তখন সমস্ত লোক খুব জোরে জোরে 'সনাতন ধর্ম কী জয়' ধ্বনি দিতে শুরু করল। আর্যসমাজের কাছে এটা চ্যালেঞ্জ, তাতে সন্দেহ নেই। এখন তো সনাতন ধর্মের তুঙ্গে বেস্পতি, আর তা থেকে ফায়দা তুলতে হিন্দু সংস্কৃতির ইজারাদারেরাও কারো চেয়ে পিছিয়ে নেই।

ভোজ হলো। সরকার আইন করে ভোজে নিমন্ত্রিতের সংখ্যা সীমাবদ্ধ করে দিয়েছেন। গেছোবাবার ভোজে সেই সংখ্যায় একটি শূন্য নয়, আরও দুটি শূন্য যোগ হলো। আইনের ধ্বজাধারী সরকারী অফিসার মধুপুরীতেই রয়েছেন, কিন্তু তাঁর কি সাধ্যি আছে যে এতে বাধা দিয়ে তিনি নিজেকে হিরণ্যকশিপুর সন্তান বলে চিহ্নিত করবেন! ময়রাদের আগেই টাকা-পয়সা দিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তারা নানারকমের পিঠে তৈরি করল। তাদের দোকানে এত বিক্রি মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর সম্ভবত কদাচিৎ হয়েছে। আনন্দে গদগদ হয়ে উঠল তারা। বস্তুত আনন্দে গদগদ হয়ে-ওঠা লোক বলতে তো মধুপুরীর ময়রা আর ব্রাহ্মণ —এই দুটিই, নইলে এমনিতে পুণ্যলাভের আনন্দে গদগদ হয়ে-ওঠা লোক মধুপুরীর সবাই। এখন সেই গাছটা ফাঁকা। ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিরা ভাবনা-চিন্তা করছিল, বাবার তপস্যার প্রতীক হিসেবে গাছটিকে একটি অবিস্মরণীয় কীর্তির চেহারা দেওয়ার কোনো ব্যবস্থা করা যায় কি-না। বুদ্ধ অশ্বত্থ বৃক্ষের নীচে ধ্যান করে পরমজ্ঞান লাভ করেছিলেন, সেজন্য অশ্বত্থ যুগ-যুগান্তরের জন্য পবিত্র বৃক্ষে পরিগণিত হয়েছে। মধুপুরীর বান বৃক্ষটিরও সেই রকমই কিছু গুরুত্ব রয়েছে। বান বৃক্ষের গোটা জাতটাকেই গেছোবাবার বৃক্ষে পরিণত করা ভক্তদের সাধ্যের বাইরে, কারণ গাছগুলো এমন জায়গায় জন্মায়, যেখানে বছরে অন্তত এক-আধবার তুষারপাত ঘটবেই, আর তা-ও যদি না হয়, বেশ কয়েক রাত্রি তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নীচে থাকবে। বাবার গাছটিকে ফাঁকা দেখে মানুষের মনে দুঃখ হয়, তাই কে একজন সেখানে একটি গেরুয়া কাপড়ের ঝাণ্ডা টাঙিয়ে দিয়েছে। এখন তো সেই বাড়িটাও শূন্য হতে চলেছে, যেখানে এতদিন ধরে হরি-কথা শোনানো হয়েছে, জয়-জয়কার ঘোষিত হয়েছে, সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত হাজার হাজার নর-নারীর ভিড় উপচে পড়েছে।

প্রত্যেক উৎসব-মহোৎসব এক সময় না এক সময় শেষ হয়েই থাকে। হঠাৎ মানুষের কোলাহল ও আনন্দ-প্লাবনের পর নিস্তব্ধতা ছড়িয়ে পড়ার ফলে চারদিক বিষণ্ণ বিধুর বলে মনে হয়। গেছোবাবার মধুপুরী ত্যাগ করার দিন এলো। ভক্ত নারী-পুরুষেরা আর একবার তাদের আরাধ্য দেবতাকে দর্শন করতে চাইল। বাবা ঘর থেকে বেরিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ালেন। সামনেই সিনেমা হল। আজকাল সিনেমা সবচেয়ে বড় তীর্থ, তার সামনে যাবতীয় ধর্মের দেবালয়ই

ম্লান হয়ে গেছে। কোনো দেবীর চেয়ে সিনেমার নগ্ন চিত্রতারকাদের ছবি ভক্তদের কম আকৃষ্ট করে না। কিন্তু সেদিন সিনেমা আর তার চিত্রতারকারাও গেছোবাবার কাছে ম্লান হয়ে গেলো। কেউ সেদিকে উঁকিও মারতে চায় না। সবাই গেছোবাবার গেরুয়া কাপড়ে ঢাকা দীর্ঘ মূর্তিটির দিকে চেয়ে রয়েছে। গেছোবাবা মৌন হয়ে থাকা সত্ত্বেও কিছু লোক তাঁর খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। যার মনে ভক্তি বেশি, সে তো দেবতার সান্নিধ্য লাভ করে থাকেই। গেছোবাবার সাজ-সরঞ্জাম বলতে কিছু নেই, সেই গেরুয়া কাপড় আর একখানা কালো ছাতা, যা নিয়ে তিনি প্রথম গাছের ওপর বিরাজমান হয়েছিলেন। বাবার নিজের ইচ্ছেতেই যদি সবকিছু হতো, তাহলে তিনি মধুপুরী থেকে নীচের শহর পর্যন্ত পায়ে হেঁটেই যেতেন, কিন্তু কখনো কখনো ভক্তের আগ্রহের কাছে ভগবানকেও নতি স্বীকার করতে হয়। তাঁর জন্যে গাড়ি ঠিক করা এমনকি কঠিন? মধুপুরীতে খুঁজলে গাড়িওয়ালা লোক পঞ্চাশ জন পাওয়া যাবে। প্রত্যেকেই মনে মনে ভাবছে, বাবা যদি তার গাড়িতে পা রাখেন, তাহলে সেটা তার পরম সৌভাগ্য। একজন পুণ্যাত্মা তার গাড়ি দিয়ে বাবার সেবা করার সুযোগ পেলো। বাবা মধুপুরী থেকে বিদায় নিচ্ছেন। তিনি বীতরাগ পুরুষ—সুখ-দুঃখ, লাভ-লোকসান, জয়-পরাজয়, সবকিছুতেই অবিচল। কিন্তু তাঁর সান্নিধ্যে যাদের আত্মা পবিত্র হয়েছে, জন্ম-জন্মান্তরের পাপ দূরীভূত হয়েছে, তারা তো আর বীতরাগ নয়। সকলের চোখ আর্দ্র বললে ঠিক বলা হয় না, বর্ষার বৃষ্টি ধারার মতো অশ্রু বয়ে যাচ্ছে তাদের চোখে। আমাদের পূর্বপরিচিত হ্যাট-পরা দুই উকিল সাহেবও সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁদের চোখও অশ্রুসিক্ত। কতজন মুখে এবং কতজন তাদের নীরব হৃদয়ে বারবার প্রার্থনা করছে—'বাবা, মধুপুরীকে ভুলবেন না, আমাদের মতো পাপীদের আর একবার এসে দর্শন দেবেন।'

গাড়িতে চড়ে বাবা নীচের শহরে গিয়ে পৌঁছলেন। সেখানেও তাঁকে সংবর্ধনা জানানোর জন্যে লোকেরা তৈরি। কিন্তু তারা শহরের সাধারণ নর-নারী নয়, বরং ডজন খানেক সেপাই সঙ্গে নিয়ে পুলিস-ইনস্পেক্টর এবং থানার দারোগা। তাঁরা টেলিফোনে আগেই খবর পেয়েছিলেন। পাহাড় থেকে নেমে আসতেই তাঁর গাড়িটাকে পেছনে পেছনে আর একখানা গাড়ি অনুসরণ করতে শুরু করল। শহরে ঢুকতেই ইনস্পেক্টর গাড়ি থামাতে হুকুম দিলেন। গাড়িটা তখনও পুরোপুরি থামেনি, পুলিসের লোক চারদিকে ঘিরে ফেলল সেটাকে। ইনস্পেক্টর তাঁর হাত ধরে হেঁচকা টান মেরে নীচে নামাতে নামাতে বললেন—'গেছোবাবা, মধুপুরীর লোকগুলোকে তো উদ্ধার করে দিয়েছ, এখন চলো, আমাদের জেলটাকে উদ্ধার করো।'

শেষ পর্যন্ত বেরিয়ে পড়ল, গেছোবাবা ডাকাত-দলের সর্দার। কিন্তু কে বলতে পারে মধুপুরীকে তিনি মুক্তির বার্তা দিয়ে যাননি?

শহরই বলুন আর শৈলাবাসই বলুন, কোনোটাই আপনাআপনি সুসজ্জিত হয়ে ওঠে না। উপকরণগুলি ভোগ করার জন্যে যত লোক দরকার হয়, তার চেয়ে বহুগুণ বেশি লোক দরকার হয় তাকে সাজিয়ে তোলার জন্যে। খাদ্যসামগ্রীর জন্যে প্রয়োজন হয় হোটেল, রেস্তোরাঁ, পাচক, খানসামা, সব্জীওয়ালা, মাংসওয়ালা, ময়রা ইত্যাদির। মধুপুরীকে সর্বালঙ্কারে ভূষিত করে তুলতে যাদের দরকার, তাদের মধ্যে দর্জি এবং ধুনুরীও অন্যতম। এখানে বেড়াতে আসা সৌখিন ব্যক্তিদের শুধু হংসধবল বিছানা হলেই চলে না; নরম তুলোর তোশকও দরকার। তারপর কখন নীচের পোষ-মাঘ এখানে শুরু হয়ে যায় কোনো ঠিক নেই, তখন শীত কাটানোর জন্যে কম্বলের চেয়েও অধিকতর আরামদায়ক লেপ চাই, বালিশ চাই। এইসব কারণেই ধুনুরীরাও মধুপুরীর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে। তাই বছরে আট মাস যদি সুলতানকে মধুপুরীতে দেখা যায়, তাহলে তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। ওদের হাতে তুলো ধোনার ধনুক আর ডাম্বেলের মতো কাঠের মুগুর দেখলে পুরনো গল্প মনে পড়ে যায়। এক ধুনুরী অতি প্রত্যুষে তার প্রভাবশালী বেশ-ভূষায় কাজের খোঁজে বেরিয়েছে। পথে এক শেয়ালের সঙ্গে দেখা। শেয়াল ভাবল, লোকটা নিশ্চয়ই কোনো ব্যাঘ্র-শিকারী, তার প্রাণ বিপন্ন। এখন একমাত্র বাঁচার উপায় ওর তোষামোদ করা। সে রাজসভার কবিদের ভাষায় বলল—

কোথায় চলেছেন দিল্লীর সুলতান। হাতে ধনুক-তীর কামান॥

ধুনুরীর ধড়ে প্রাণ এলো। সে ভেবেছিল, ওটা বনের রাজা বাঘ, তাকে না খেয়ে ছাড়বে না। খুশি হয়ে সে বলল—

বড়র কথাই বড়র প্রমাণ।

কিন্তু সুলতানকে দেখে এই পুরানো গল্পটি মনে পড়লেও মনে একটু ব্যথাও লাগে।

মাঝারি গড়নের চেয়ে সুলতান বেশ একটু বেঁটে, কিন্তু চেহারায় বামন বলে মনে হয় না। বর্তমানে তার বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি, কিন্তু বয়সের তুলনায় তাকে বেশি বুড়ো দেখায়। শুধু বয়সের জন্যেই সে রোগা-পাতলা নয়। সম্ভবত যৌবনেও তার দেহে মোটা পেশী কোনোদিনই গড়ে ওঠেনি। ছেলেবেলাতেই

গুটি বসন্তে তার একটা চোখ প্রায় নষ্ট হয়েছে, তাই রীতি অনুযায়ী তাকে নবাব বলার অধিকার সকলেরই আছে, অথচ সুলতানের মর্যাদা নবাবের চেয়ে একটু ওপরেই। আল্লা-রসুলকে মানে বলে তার মুখে ছোট ছোট ছাগল-দাড়িও রয়েছে। ধনুকখানা তার শরীরের চেয়ে একটু বেশি বড় বলে মনে হয়, কিন্তু সেটাকে নিয়ে হাঁটাহাঁটি করতে কোনো অসুবিধে হয় না। মধুপুরীতে সে কোথায় থাকে, বলা কঠিন। হয়ত তার মতোই ধুনুরীর কাজ করে যারা, তাদের সঙ্গে কিংবা অন্য কারোর সঙ্গে কোথাও একটা ঘর নিয়ে থাকে। কিন্তু মাঝে মাঝেই তাকে সূর্যোদয় হতেই শহরের কেন্দ্র থেকে দু-তিন মাইল দূরে কোনো একটা পাড়ায় দেখা যায়, হাতে তীর-ধনুক। দূরের কাছের সমস্ত বাংলোর লোকই মনে-প্রাণে তার মঙ্গল কামনা করে। সুলতান না থাকলে ছ'মাইল দীর্ঘ এলাকা জুড়ে গড়ে ওঠা মধুপুরীর আনাচে-কানাচে ধুনুরী খুঁজে বেড়াতে হতো। অথবা লেপ-তোশক ধোনার জন্যে তিন মাইল দূরের দোকানে পাঠাতে হতো, মজুরি বেশি দিতে হতো, অনিশ্চয়তাতে ভুগতে হতো, তার ওপরেও সন্দেহ থেকে যেতো, অন্তত বছর খানেক লেপ-তোশকের তুলো ঠিক থাকবে কি-না। সুলতান যে লেপ-তোশক ভরে দেয়, কাপড় ছেঁড়ার আগে তার তুলো জড়ো হয়ে যাবে, সাধ্যি কি! একদিক দিয়ে বলতে গেলে সেটা তার লোকসান, কারণ যত তাড়াতাড়ি তুলো জড়ো হয়ে যাবে, ততোই বেশি কাজ জুটবে তার। সুলতানের তুলো ধোনার মজুরি আট আনা সের। কিন্তু এত লোকসান করেও সুলতান তার পসার জমিয়ে ফেলেছে —যে একবার তাকে দিয়ে কাজ করায়, অন্য ধুনুরীর কাজ তার চোখেই ধরে না।

সে কাছেরই সমভূমির কোনো জেলার লোক। গ্রামের না শহরের বলা সম্ভব নয়। কসাই-ধুনুরী-খানসামা গ্রামের লোক হলেও নিজেকে শহরের লোক বলাটাকে গর্বের বলে মনে করে। এক কসাই, যে মাথায় মাংসের ঝাঁকা নিয়ে মধুপুরীর গলিঘুঁজিতে ঘুরে বেড়ায়, সে-ও নিজেকে শুধু শহরের লোকই বলে না, একদিন কথায় কথায় সে বলে ফেলেছিল, 'আমাদের বাড়ির মেয়েরা সিনেমা দেখতে যায় না।' শহরে বাস করেও কোনো কসাইয়ের বউ সিনেমা দেখতে যাবে না, কথাটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। দুনিয়ার কোনো ধর্মই সিনেমাকে নিষিদ্ধ বলে ফতোয়া দেয়নি। সে আরও বলেছিল যে তাদের বাড়ির মেয়েরা ঘর থেকে বাইরে বেরোয় না। এ থেকে অবশ্য ধারণা করা যায় যে সে শহরের বাসিন্দা। গ্রামে বাস করে কোনো মজুর-খাটা মুসলমানের পক্ষে এসব মেনে চলা সম্ভব নয়, তা সে কসাইয়ের কাজই করুক আর যাই করুক। যদিও ইসলাম-ধর্ম অনুশাসন হিসেবে এবং হিন্দু-ধর্ম রেওয়াজের দোহাই পেড়ে পর্দার দারুণ প্রচার চালিয়েছে, তবুও তার প্রভাব পড়েছে শুধু বড় লোকদের ওপরেই, গরিবেরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজগার করে খায়, তারা কি এই বিলাসিতা করতে গিয়ে খাটা-খাটুনির অর্ধেক হাত নিষ্ক্রিয় করে দিতে পারে? সুলতানের এ রকম কোনো দম্ভ নেই।

তার চেহারা দেখলেই লোকের মনে করুণার উদ্রেক হয়, কাজকর্ম না থাকলেও তাকে কিছু একটা কাজ দেওয়ার কথা চিন্তা করে। অথচ তুলো ধোনা ছাড়া সুলতান আর কোনো কাজ শেখেনি। যদি সে গদির চেয়ার মেরামত করতে পারত, চেয়ারের বেত বুনতে পারত কিংবা তাতে রঙ-বার্নিশ লাগাতে পারত, তাহলে তার আরও কাজ জুটত সন্দেহ নেই।

দুই

১৯৪৭-এর আগস্টে যখন ভারত বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলো, এবং তার ফলে বহু জায়গায় সীমান্তের উভয় দিকেই নিরীহ নর-নারীরা নির্মমভাবে নিহত হলো, তখন তার প্রতিক্রিয়া মধুপুরীতেও না পড়ে যায়নি। বিভাজনের আগে মধুপুরী ভেদাভেদ-জ্ঞানশূন্য হয়ে সব রকম শৈলবিহারী নর-নারী এবং সেই সঙ্গে তাদের অনুচরবর্গকে স্বাগত জানানোর জন্যে প্রস্তুত থাকত। বর্তমান শতাব্দীর গোড়ায় ভারতীয়দের উচ্চবর্ণের সমাজে যা-ও বা ছোঁয়াছুঁয়ি ছিল, দুটি মহাযুদ্ধের পরে তা একেবারে মুছে যায়। কন্যায় না হোক, অন্নে এক হয়ে যায় সবাই। মধুপুরী ছোট-বড় কোনো সরকারেরই গ্রীষ্মকালীন রাজধানী নয়, তাতে তার ক্ষতি কিছু হয়নি, কারণ সরকারী বাতাবরণ না থাকায় এখানে বিশুদ্ধ পর্যটনকারীরাই আসত, তাদের মধ্যে শ্বেতাঙ্গের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। এর পরেই রাজা-নবাবের স্থান। ক্লাব-হোটেল-রেস্তোরাঁয় তাদের পরস্পরের দামী দামী মদের পাত্রে ঠোকাঠুকি লাগত। শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে কৃষ্ণাঙ্গদের মেলামেশার ততো স্বাধীনতা ছিল না, কেবল কোনো মন্ত্রীরই কখনো কখনো এ ধরনের সৌভাগ্য লাভের সুযোগ হতো। ভারতবর্ষে সবচেয়ে ভালো এবং বেশি মাইনের পাচক খানসামা হলো চট্টগ্রামের বড়ুয়া বৌদ্ধ কিংবা গোয়ার খ্রীষ্টান। কিন্তু তাদের রাখার সামর্থ্য সব শ্বেতাঙ্গের ছিল না। তাই বলতে গেলে এই পেশায় মুসলমান-দেরই একরকম আধিপত্য ছিল। হিন্দু রাজা, মুসলমান নবাব, ইংরেজ বনিক অথবা আমলা, যিনিই হোন না কেন, তাঁদের সকলেরই বেয়ারা-খানসামা মুসলমান। হিন্দু, বিশেষ করে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা এই পেশায় হাতই দিত না। যদি কোনো রানী একটু বেশি ধর্মশীলা হতেন, তাহলে তাঁর রান্নাঘরে ব্রাহ্মণ পাচকেরই ব্যবস্থা থাকত, তার কাজ ছিল রান্নাবান্নার সঙ্গে সঙ্গে বাংলোর ঘরগুলো এবং আসবাবপত্র নোংরা করে ফেলা। মুসলমান বেয়ারা সাহেবের জন্যে কোনো অখাদ্য মাংস রান্না করলেও সেটা বাইরে কারোর কাছে ফাঁস করত না। অবশ্য ভোজনে অংশীদার হওয়া তার পক্ষে অসম্ভব। চার-পাঁচ পুরুষ ধরে এই কাজ করতে করতে তারা রান্নাবান্না এবং টেবিলে পরিবেশনের কাজে বেশ পটু হয়ে উঠেছিল। কাচ ও চীনেমাটির দামী বাসনপত্র তাদের হাতে খুব কমই ভাঙত। মালিকের

সামনে খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, বকের পালকের মতো ধবধবে সাদা পোশাক পরে থাকাটা তাদের অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। নিজেদের ধর্মের প্রতি খুব অনুরাগ ছিল তাদের। অধিকাংশ লোকই রোজ নামাজ পড়ত। জুমার দিন (শুক্রবার) আজকাল মধুপুরীর মসজিদগুলো খালি পড়ে থাকে, তখনকার দিনে কিন্তু সেগুলো লোকে গিজগিজ করত। এত সত্ত্বেও অন্য ধর্মের প্রতি তাদের ঘৃণা ছিল না, আর শুধু মুসলমান হওয়ার জন্যেই তারা জোর-জবরদস্তি আলাদা জোট বাঁধার চেষ্টা করত না। মধুপুরীর ঘরবাড়ি এবং রাস্তাঘাট তৈরি করার অধিকাংশ মজুরই ছিল বালতী (কাশ্মিরী) মুসলমান, এখানকার লোকে ওদের লাদাকী বলত। ছোঁয়াছুঁয়ির ব্যাপারে ওরা হিন্দুদের চেয়ে কোনো অংশেই কম ছিল না। নিজেদের দেশে তো হিন্দুর হাতের দুধও ওদের অস্পৃশ্য ছিল। অথচ, খুব সাদাসিধে ছিল ওরা, মধুপুরীর সবচেয়ে ভীতু দোকানদারটাও ওদের দু-চারটে গালাগালি শুনিয়ে দিতে পারত। বিভাজনের পঁচিশ বছর আগে দেখলে মালুম হয়ে যেতো যে মধুপুরীতে সাম্প্রদায়িকতা বা ধর্মীয় তিক্ততার নাম-নিশানা নেই কোথাও।

মুসলিম লীগের লোকেরা মুসলমানদের পৃথক জাতি বলে প্রচার শুরু করে দেয়, এগোতে এগোতে তারা দেশ-বিভাগের দাবি জানায়। লীগের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নেতারা মধুপুরীতে আসতেনই, ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের ফলে মুসলমান ব্যবসায়ীদের ওপর, এবং তারপর মুসলমান জনসাধারণের ওপর তাঁদের প্রভাব পড়তে শুরু করে। 'মুসলীম লীগ জিন্দাবাদ', 'কায়েদে আজম জিন্দাবাদ', 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' ইত্যাদি ধ্বনি এখানেও যখন-তখন শোনা যেতে থাকে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হতে না হতেই পাকিস্তানের আন্দোলন অত্যন্ত তীব্র হয়ে উঠল। ভাগ বাঁটোয়ারার এক বছর আগেই এমন অবস্থার সৃষ্টি হলো যে মধুপুরীর হিন্দুদের চোখের সামনে পাকিস্তান ভাসতে লাগল। এখন লাদাকী মুসলমানরাও মুসলিম লীগের পতাকাতলে এসে দাঁড়ালো। মধুপুরীতে বেড়াতে আসা লোকজনের মধ্যে নিরামিষাশী খুব কম। এখানে যে পরিমাণ মাংস লাগে, সেই অনুপাতে মাংস-বিক্রেতারও দরকার হয়। পশু হালাল করা হয় বলে শিখরা মুসলমানদের হাতের মাংস ভক্ষ্য বলে মনে করত না। অথচ বাকি সবাই, তা হিন্দুই হোক অথবা খ্রীষ্টান, হালাল করা মাংস কি-না, খাওয়ার বেলা ওসব বাছ-বিচার করত না। এত লোকের জন্যে মাংসের ব্যবস্থা করতে এখানে যথেষ্ট সংখ্যায় কসাই থাকত। কসাইরা হিন্দুদের সেইসব সম্প্রদায়ের লোক, ভারতবর্ষে ইসলাম-ধর্ম আসতেই যারা তার ঝাণ্ডার নীচে চলে গিয়েছিল। হাড় মাংসের শরীরের ওপর কিভাবে ছুরি চালাতে হয়, তাতে তারা ছেলেবেলা থেকেই অভ্যস্ত, কিন্তু তার মানে এই নয় যে তারা খুব বীর যোদ্ধা। অথচ হিন্দুরা ওদের খুনোখুনিতে ভয় পায়। মানুষের আন্দোলন চরম সীমায় এসে পৌঁছেছিল। প্রথমে মাংস খুব

ঢাকাঢাকি করে নিয়ে যেতে হতো। পশুর স্বাস্থ্যের কথা ভেবেও সব জায়গায় পশু-হত্যার অনুমতি দেওয়া হতো না। কসাইরা হিন্দুদের ভয় দেখালো, 'আমরা শহরের চৌরাস্তায় গরু হালাল করব।' হিন্দুদের কিছু করার ক্ষমতা নেই, ইংরেজ লীগপন্থীদের পিঠ চাপড়াচ্ছে। কয়েক দিনে পরিস্থিতি এমন হয়ে উঠল যে সত্যিসত্যিই বেনেরা তাদের চৌরাস্তার কাছের দোকানপাট ছেড়ে পালিয়ে গেলো। চারদিকে ভীষণ আতঙ্ক। মুসলমান জনসাধারণ ভেবে দেখত না যে পাকিস্তান মধুপুরী থেকে বহু দূর। পাকিস্তান হলেও তাতে মধুপুরীর মুসলমানদের কোনো লাভ হবে না, করণ সেখানে যাওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। পাকিস্তানের সমর্থকদের কাছে তারা এ প্রশ্ন কখনও রেখেছিল কি-না জানি না। রাখলে তারা নিশ্চয়ই জবাব দিয়েছিল, 'সে রকম পরিস্থিতি এলে আমরা সবাই পাকিস্তান চলে যাব।' তাদের কথা অনুযায়ী তখন পাকিস্তান যেন পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্বর্গ নেমে আসছে।

তখনও দেশ-ভাগের সীমারেখা নির্ধারিত হয়নি, কিন্তু পশ্চিম পাঞ্জাবের সম্পন্ন হিন্দুরা আগে থেকেই চলে আসার জন্যে তৈরি হতে লাগল। তাদের কাছে সবচেয়ে সস্তা এবং আরামে থাকার জায়গা হিমালয়ের প্রমোদ-নগরীগুলো, বিশেষ করে যেগুলো পাঞ্জাব থেকে খুব দূরে নয়। সে-বছর (১৯৪৭ খ্রীঃ) বর্ষায় লাহোর ও অন্যান্য শহর থেকে হাজার হাজার পরিবার মধুপুরীতে পালিয়ে এলো। সমস্ত বাড়ি, এমনকি আউট-হাউসগুলো পর্যন্ত লোকে ঠাসাঠাসি। নিজেদের রাজ্যে মুসলমানদের সঙ্গে লড়াই করার অভিজ্ঞতা ছিল পাঞ্জাবী হিন্দুদের, তাই সেখানকার দোকানদাররাও মধুপুরীর দোকানদারদের মতো অতো ভীতু নয়। নিজেদের লোক-বলের ওপরও তাদের পুরোপুরি আস্থা ছিল। কোথায় এখানকার লীগপন্থী মুসলমানরা চৌরাস্তায় গরু হালাল করার হুমকি দিয়ে কাছা-খোলা দোকানদারদের চোখের ঘুম কেড়ে নেবে, না পাঞ্জাবীরা এসে মারের বদলে পাল্টা মার দিতে শুরু করে দিলো। হপ্তা দু'হপ্তার মধ্যেই যখন দু-চার জায়গায় পাঞ্জাবী শিখ কিংবা হিন্দুরা মুসলমানদের বেশ পিটুনি দিলো, তখন হাড়ে হাড়ে টের পেলো ওরা, কোথাও আর টুঁ-শব্দটি শোনা গেলো না। রোঁয়া গুটিয়ে চুপ করে রইল তারা। 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ'-এর জায়গায় 'পাকিস্তান ভাগো' ধ্বনি জোরালো হয়ে উঠল।

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লীগপন্থী মুসলমানদেরও সাহস ভেঙে পড়ল, কিন্তু তাদের ভরসা—'আমরা পাকিস্তান চলে যাব।' মধুপুরীতে আসা পাঞ্জাবী হিন্দু-শিখ কান খাড়া করে থাকে, লাহোর কোন দিকে পড়ছে—তাদের অধিকাংশই লাহোর শহরের বাসিন্দা। তাদের মনের মধ্যে ভীষণ আশা, রাবী পশ্চিম পাকিস্তানের সীমা হবে, অর্থাৎ লাহোর অবশ্যই ভারতে চলে আসবে। শেষ মীমাংসা ঘোষণা করার আগেই পাঞ্জাবে রক্তের বন্যা বইতে শুরু করল। রেডিওতে যখন ঘোষণা

করা হলো যে লাহোর পাকিস্তানকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে, তখন শরণার্থীদের রক্ত টগবগ করে ফুটতে লাগল। মধুপুরীর হতভাগ্য মুসলমানরা এখন বুঝতে পারছে, পাকিস্তান সৃষ্টি হলেও তাতে তাদের কিছু পাওনা-কড়ির ব্যাপার নেই। এখানেই তারা জন্মেছে, এখানেই মরতে হবে তাদের, যেখানে তাদের অগণিত পূর্বপুরুষেরা চিরনিদ্রায় শায়িত রয়েছে। তাদের অধিকাংশ মালিক যেখানে আছে, সেখানেই তাদের জীবিকার সংস্থান হতে পারে। এখন তারা নিজেদের ভুল পুরোপুরি বুঝতে শুরু করেছে, কিন্তু, কে শোনে সে-কথা। পাকিস্তানে যখন আমাদের জাতভাইদের রক্তের নদী বয়ে যাচ্ছে, তখন এখানেও তার বদলা না নিয়ে ছেড়ে দেওয়া আমাদের উচিত নয়—ঠিক গোষ্ঠী-শাসনব্যবস্থার যুগের মনোভাব জেগে উঠল মানুষের মনে—অপরাধী কোনো ব্যক্তি নয়, বরং তার পুরো গোষ্ঠী। মধুপুরীতেও সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হওয়ার উপক্রম হলো। এখানকার শাসনকর্তা খুব চেষ্টা করলেন যাতে সে রকম কিছু না ঘটে। কিছু মামুলী ধরনের জোর হাওয়া নয়, সেটা বরং বলা যেতে পারে তুফান, কি করে তা আটকানো সম্ভব? শেষ পর্যন্ত এখানকার মুসলমানদের পনেরো-বিশ জন—বেশির ভাগই মজুর শ্রেণীর—বলির পাঁঠা হলো। মধুপুরীর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বাড়িগুলোয় তাদের রাখা নিরাপদ নয়, সেজন্য মধুপুরীর এক প্রান্তে অবস্থিত একটি এস্টেট, যেখানে বহু বাংলো রয়েছে, সেখানে ওদের প্রত্যেককে নিয়ে গিয়ে রেখে দেওয়া হলো।

সুলতান কখনও 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' ধ্বনিতে সামিল হয়নি। সে ভেবেই কূল-কিনারা পাচ্ছিল না যে পাকিস্তানটা যদি তাদের গাঁয়েই না হয়, তাহলে তাতে তার কি লাভ? খুব বোলচালের লোক নয় সে, নইলে তাকে কাফের বলতেও লোকে কুণ্ঠিত হতো না। সে ভাবে, আমি যদি কারোর কোনো মন্দ না করি, তাহলে লোকেই বা আমার মন্দ করবে কেন?

কিন্তু যখন তার পাড়াতেই পাঁচজন মুসলমান কৃপাণের ঘায়ে কাটা পড়ল, তখন তার বিশ্বাসও টলমল করে উঠল, পুলিশ প্রহরায় সে-ও শরণার্থীদের ক্যাম্পে গিয়ে হাজির হলো। সরকার খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করেছে, কিন্তু আগে থেকে কোনো প্রস্তুতি ছিল না, তাই আধপেটা খাবারও জোটে না। মধুপুরীর চার পাঁচ জন হিন্দু এই ডামাডোলে ব্যবসায়ী হয়ে উঠল। মুসলমানদের অস্থাবর সম্পত্তির বেশির ভাগটাই তাদের হাতে চলে গেলো। শান্তি-রক্ষার জন্যে যে পুলিশ ও মিলিটারী এসেছিল, তারাও, পাকিস্তানে হিন্দুদের ওপর সংঘটিত অত্যাচারের অতিরঞ্জিত খবর শুনে মধুপুরীর নিরীহ মুসলমানদের প্রতি অনুকম্পা দেখাতে ইচ্ছুক হলো না। সেনাবাহিনীর চোখের সামনেই দোকান থেকে দামী দামী কার্পেট, কাপড়-চোপড়, ফার্নিচার ও অন্যান্য জিনিসপত্র লুট হয়ে গেলো, কেউ কাউকে বাধা দিলো না। বড়লোকেরা তো লাখ টাকার মালিক থেকে দশ লাখ টাকার মালিক হওয়ার জন্যে যা করার করেছিল, তারপর কম-বেশি লুটের মাল

কিছু দিন বাদেই জলের দরে তাদের হাতে এসে গেলো। কারণ ঐসব মাল রাখার জন্য খানাতল্লাসী ও গ্রেপ্তারের আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল।

মন্দের ভালো বলতে এই, মধুপুরীতে সেই ঘূর্ণিঝড় দু-তিন দিনের বেশি থাকেনি। মানুষ অন্যায় খুন-খারাবি ছেড়ে দিলো, পুলিশ-মিলিটারীও পরিস্থিতি আয়ত্তে আনতে সক্ষম হলো। এই ঝড়-ঝঞ্ঝায় মধুপুরী তার উপযুক্ত সর্বজনপ্রিয় পরিবেশের ঐতিহ্যটি হারালো। মানুষকে যখন ক্ষেপামিতে পেয়ে বসে তখন তারা কি মেনে নেওয়ার জন্যে প্রস্তুত হতে পারে যে মুসলিম ঘরে কারোর জন্ম হওয়া সত্ত্বেও তাকে ধর্মীয় পক্ষপাতিত্ব স্পর্শ করতে পারেনি! সুলতান তার অন্যান্য জাত ভাইদের মতো যদিও এস্টেটের আউট-হাউসে থাকতে বাধ্য হয়েছিল, তবু নিষেধ করা সত্ত্বেও যে লোকটা সকলের আগে বাইরে বেরিয়েছিল, সে হলো সুলতান। হ্যাঁ, আর একজন বৃদ্ধ মুসলমানও অবশ্য রয়েছেন। ব্রিটিশ সরকারের খুব বড় একজন অফিসার হয়ে পেন্সন নিয়ে তিনি মধুপুরীকেই নিজের বাসস্থান হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। মধুপুরীর বিলাসিতার আকর্ষণে নয়, সেখানে যে চিরবসন্ত বিরাজ করে, তারই আকর্ষণে। তিনি মনে মনে ভেবেছিলেন, 'আমার অন্তরের অন্তস্তলেও যখন এতটুকু সাম্প্রদায়িকতা-বোধ নেই, তখন কারোর দিক থেকে আমার কোনো আশঙ্কা থাকবে কেন? আর যদি আশঙ্কাও থাকে, তাহলেও মৃত্যুর চেয়ে বেশি আর কি হতে পারে! সত্তর বছরে পা দিয়ে আরও বেশি দিন বেঁচে থাকার লোভ করাটা আমার পক্ষে ঠিক নয়।' ঝড়-ঝঞ্ঝা যখন চরম অবস্থায় গিয়ে পৌঁছেছিল, তখনও সেই বৃদ্ধ একা একা মধুপুরীর রাস্তায় ঘুরে বেড়াতেন। তাঁর হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুরা অনেক বুঝিয়েছিল, কিন্তু তিনি কারোর কথায় কর্ণপাত করেননি। অবশেষে মধুপুরীর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা গোপনে তাঁর পেছনে পেছনে ঘোরার জন্যে দু-তিন জন লোকের ব্যবস্থা করে দিলো। তিনি যদি জানতে পারতেন যে এই লোকগুলো তাঁকে পাহারা দেওয়ার জন্যে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাহলে তিনি কখনও সেটা বরদাস্ত করতেন না।

তিন

পাকিস্তান হয়ে গেলো। তুফানের আগের বছরই মধুপুরীর বেয়ারা-খানসামাদের অনেকেই পাকিস্তান চলে গেছে। মধুপুরীর বেয়ারা-খানসামারা হিমালয়ের শৈলাবাসে থাকতে অভ্যস্ত, তাই তারা পাকিস্তানে ঐ রকমই কোনো জায়গা খুঁজে নিতে চেয়েছিল: কিন্তু সেখানে ও রকম একমাত্র জায়গা মরী। সেখানে যাওয়ার পর তাদের কি অবস্থা হয়েছিল, ১লা আগস্ট ১৯৫০ অর্থাৎ তুফানের তিন বছর পরে লেখা একখানি চিঠি থেকে সে-কথা বোঝা যাবে।

'বখিদমতশরীফ ভাই সবীর বক্স আপনার ভাইয়ের সালাম ও

দোয়া কবুল করিবেন (।) তারপর আপনার ভাবীর দিক হইতেও সালাম কবুল করিবেন (।) বাদ আরজ এই যে আমার সালাম দুই হাত পাতিয়া কবুল করিবেন (।) তারপর ভাইজান এখানে সকলে ভালো আছে (।) আমরা খোদার নিকটে সব সময় আপনার কুশল কামনা করি (।) তিনি যেন আপনাকে খোশহালে রাখেন শান্তিতে রাখেন (।) তারপর আপনার ৩১. ৭. ৫০ তারিখের পত্র পাইয়াছি (।) পাঠ করিয়া মনে খুব খুশি হইল (।) খোদা আপনারও মঙ্গল করিবেন (।) আমার মনে হইতেছে যেন আমার ভাই সবীর বক্স আমার নিকটে বসিয়া আছে (।) তারপর আপনি বহিনের জন্য যেরকম করিয়াছেন আপনার পত্র মারফৎ যাহা জানিতে পারিলাম যে আপনি সমস্ত জায়দাদ বহিনের নামে লিখিয়া দিয়াছেন তাহা হইলে ভাইজান আপনি খুব ভালো করিয়াছেন (।) ইহাতে আমি বহুৎ খুশি হইয়াছি (।) আপনি খুব ভালো কাজ করিয়াছেন (।) খোদা আপনার মঙ্গল করিবেন (।) তারপর আপনি যখন পাঁচদিনের ছুটি লইয়া গিয়াছিলেন, তখন নিশ্চয়ই বাড়িও গিয়াছিলেন (।) তারপর ভাইজান সকলের আগে বাড়ির কথা খেয়াল রাখিবেন (।) যা কিছু হোক নিজের ছোট ভাইকেও সব সময় দেখিবেন (।) আপনি জানেন যে আমি চেষ্টা করিতেছি (।) বাঁচিয়া থাকিলে ইনশাল্লাহ্‌ আবার নিশ্চয়ই মোলাকাত হইবে (।) আপনি কোনো রকম চিন্তা করিবেন না (।) এই ছাড়াছাড়ি কপালের লিখন (।) খোদার ইচ্ছায় আপনি ও আমি ভালো থাকিলে আবার আমাদের মোলাকাত হইবে (।) তারপর আপনার ভাবী তো দিনরাত এই বলে যে চলো বাড়ি চলো (।) যদি পারো তাহা হইলে আমাকে সবীর বক্সের কাছে রাখিয়া এসো (।) সে এই কথাই বলে (।) তা ভাইজান কোনো চিন্তা করিবেন না (।) কিন্তু ঘর-সংসারের কথা খেয়াল রাখিবেন (।) ঘর-সংসারেই নিজের মান-ইজ্জত (।) আর সকলকে নিজের চেয়েও ভালো মনে করিবেন (।) তারপর যদি ভুল ত্রুটি মার্জনা করেন, তাহলে পত্র-লেখককে আমার বহুৎ বহুৎ সালাম জানাইয়া দিবেন (।) আর চিঠি যেন একটুকু পরিষ্কার করিয়া লেখে কারণ আমার বুঝিতে খুব কষ্ট হয় (।) তারপর ভাইজান ওখানে আপনার কাজ যখন শেষ হইয়া যাইবে তখন সোজা বাড়ি চলিয়া যাইবেন (।) খবরদার এদিকে সেদিকে নজর দিবেন না (।) সবুরে মেওয়া ফলে (।)

'আপনার সঙ্গে যাহারা দেখা-সাক্ষাৎ করিতে আসে তাহাদের সকলকে আমার সালাম বলিয়া দিবেন (।) আর আমি দিল্লীতেও একখানি পত্র দিয়াছি (।) জবাব আসিলে সেখানকার হাল হকিকত লিখিব (।) হাজার হাজার সালাম আপনাকে (।) ।'

১৯৪৭-এর আগস্টে মধুপুরীর মুসলমানদের মধ্যে যে-আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছিল, তার ফলে তাদের অনেকেই পাকিস্তান চলে যায়। তারা ভেবেছিল যে সেখানে গিয়েও তারা নতুন ঘর-সংসার পেতে নেবে। শীতকালে পাহাড়ের নীচে কোনো গ্রামকে নিজেদের গ্রাম করে নেবে, আর গ্রীষ্মকালে পাকিস্তানের শৈলাবাস তাদের কাজ যোগাবে। অথচ ভারতে যতগুলি শৈলাবাস রয়েছে, সেগুলির প্রত্যেকটিতে যে-পরিমাণ শৈলবিহারীর সমাগম হয়, কোনো মরী-তে তা হয় না। তার ফলে তাদের অনুতাপ করতে হয়েছিল, ওপরের চিঠি থেকেই সে কথা বোঝা যাবে। যার পক্ষে পাকিস্তান যাওয়া সম্ভব হয়নি, সে চার বছর মধুপুরীর দিকে উঁকি-ঝুঁকি মারতেও সাহস পায়নি। সব সময় প্রাণের আশঙ্কা বোধ করছিল তারা। তিনটি বাজারে মুসলমানের একটি দোকানও চোখে পড়ত না, রাস্তায় চলাফেরা করতেও দেখা যেত না তাদের। কিন্তু সুলতানের মন থেকে ভয় দূর হয়ে গিয়েছিল সে বছরই। ক্যাম্প থেকে মুসলমান নারী-পুরুষদের যখন লরীতে লরীতে করে নীচে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছিল, তখনও নীচে যাওয়াটা তার মনঃপূত হয়নি। নভেম্বর পর্যন্ত মধুপুরীতেই সে তার তীর-ধনুক নিয়ে ঘুরে বেড়ালো। সেবার বর্ষায় যে তাণ্ডব হলো, তার ফলে দ্বিতীয় সীজনটা ভালো জমতে পেলো না। শৈলবিহারীদের অভাব থেকেই গেলো, কিন্তু তাদের চেয়ে কয়েকগুণ বেশি শরণার্থী এসে জুটল মধুপুরীতে। সুলতানের কাজের অভাব নেই, কারণ শরণার্থীরা তাদের থাকার কোনো ঠাঁই-ঠিকানা তখনও জানাতে পারেনি, অথচ শীত কাটাতে হবে এখানেই, সেজন্যে লেপ তৈরী করা দরকার।

চার

ঝড়-ঝঞ্ঝাই মধুপুরীর লক্ষ্মী লুটে-পুটে নিয়ে গেছে, একথা সমর্থনযোগ্য নয়। মধুপুরী শ্রীহীন হতে শুরু করে উনিশ শো ছেচল্লিশেই, যখন দূরদর্শী ইংরেজরা—দোকানদার কিংবা যাই হোক না কেন —তাদের সম্পত্তি জলের দরে বিক্রী করে দিতে লাগে। সে-বছর গ্রীষ্মকালে খুব কম সংখ্যক ইংরেজই এখানে বেড়াতে আসে। আগস্টের ঝড়-ঝঞ্ঝা যদি না-ও হতো, তাহলেও মধুপুরীর অদৃষ্টে এটাই লেখা ছিল, যা এখন চোখে পড়ছে। ধীরে ধীরে টাকাওয়ালা পর্যটকের সংখ্যা কমে যেতে লাগল। সবচেয়ে বেশি নির্ভর করা হতো যাদের ওপর, সেই শ্বেতাঙ্গ নারী-পুরুষেরা ডালে নুনের ছিটের মতো রয়ে গেলো। দেশীয় রাজা এবং জমিদার

তালুকদারদের আমদানির ওপরেও বজ্র হানা হয়েছে। সরকারের উদারতায় যে পেন্সন বা ক্ষতিপূরণ তাঁরা লাভ করেছেন, যদিও তা কম নয়, তবু সামন্তরা তাঁদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত বলে ভাবছেন, সেজন্যে যাঁরা বুদ্ধিমান, তাঁরা প্রতিটি পয়সা হিসেব করে খরচ করছেন। আগেকার মতো আর দরাজ হাতে তাঁদের খরচ করতে দেখা যায় না। এর প্রতিক্রিয়া মধুপুরীর সমগ্র জীবনযাত্রার ওপর পড়াটাই স্বাভাবিক।

সুলতান সপ্তাহ খানেকই আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে ছিল, আর ক্যাম্পে নজরবন্দী হয়ে থাকাটা তো সে দু-তিন দিনের বেশি মেনে নেয়নি। তার ঘরে বুড়ি ছাড়া আর কেউ নেই। তুফানে তার ছেলে আর ছেলের বউ ছিটকে চলে গেছে। হয়ত লাহোরে কোথাও শুকনো রুটি কামড়াচ্ছে তারা। সেখানে যেভাবে ছেলে জীবন কাটাচ্ছে, তাতে সে চায় না; বাপকে কাছে ডেকে এনে তার গ্লানিময় জীবনের অংশীদার করে তোলে। যদি সে যাওয়ার জন্যে লেখেও, তবু সুলতান মধুপুরী ছেড়ে যেতে রাজী নয়। অনেকের তো চোখের সামনে স্বর্গ ভাসছিল, কিন্তু ও রকম স্বর্গে সুলতানের কোনোদিন বিশ্বাস হয়নি। এখন সে আর আগেকার মতো সাত-তাড়াতাড়ি ভোরবেলা দূরের বাংলোগুলোয় গিয়ে হাজির হয় না, আটটার সময় রুটি খেয়ে তবেই ঘর থেকে বেরোয়। খুব কমই সে রুমালে রুটি বেঁধে হাতে করে নিয়ে যায়। জিনিসপত্রের চড়া দাম এবং তার চেয়েও বেশি, কয়েক বছর ধরে চিনির আকাল মানুষের মনের উদারতা নিঃশেষ করে দিয়েছে, হয়ত ক্বচিৎ-কদাচিৎ এক-আধজন বাবু সুলতানকে এক কাপ চা খাওয়ার কথা বলে। সুলতান তার বাঁধা দরে কাজ করে। দু' ঘণ্টায় পাঁচ সের তুলো ধুনে লেপ তৈরি করে দেওয়া তার বাঁ-হাতের খেলা, তার মানে আড়াই টাকা মজুরি, যদি সেলাই দিতে হয় তাহলে আরও বারো আনা। কিন্তু তাই বলে এই নয় যে, সে দিনে আট ঘণ্টা কাজ করে চব্বিশ টাকা কামিয়ে নেয়। দিনে একটা কাজ পেলেই সে খোদার কাছে হাজার হাজার কৃতজ্ঞতা জানায়।

সুলতানের চেহারা খুব সরল প্রকৃতির। তার সাদা-মাটা কথাগুলো বড় চিত্তাকর্ষক। কিন্তু তার কথাগুলো যে খুব মিষ্টি তা নয়, কারণ তার চেহারা এবং কথাবার্তা উভয়ের মধ্যেই কিরকম যেন একটা দুঃখের ভাব রয়েছে। সুলতান নিজের সম্বন্ধে কিছু বলতে চায় না, হয়ত সে মনে করে, কি হবে ওসব বলে, তাতে কি তার দুঃখ-কষ্ট লাঘব হবে কিছু! তার বৃদ্ধা স্ত্রী গাঁয়ে থাকে, ছেলের জন্যে সব সময় কান্নাকাটি করে, আর তার ভালো-মন্দ জানার জন্যে নিয়মিত চিঠি-পত্র দেয়। আজ থেকে ছ' বছর আগে লাহোর কত কাছে ছিল, সন্ধ্যেবেলা গাড়িতে চড়লে সকালবেলা সেখানে গিয়ে হাজির। ছেলে আর ছেলের বউ লাহোরে রয়েছে, কিন্তু এখন তারা বুড়ির কাছে পর, মরে গেলেও সেখানে তার যাওয়ার সম্ভাবনা নেই। সুলতান একটা ছোটখাটো দার্শনিক। নিজের মনকে

সে কোনো রকমে বোঝায়। যদি তার জাতভাই কবীরের কিছু শব্দ তার জানা থাকত, তাহলে এ-সময় বড় সান্ত্বনা পেত সে।

সুলতান ধর্মের ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন, একথা বলা যায় না, কিন্তু যারা প্রতি শুক্রবার নিয়মিত মসজিদে যায়, সে তাদের দলে নয়। রোজা রাখে, সেটা তার অবস্থার সঙ্গে খাপ খায় বলেই। সমস্ত গরিব লোকের কাছেই ওটা সহজ ব্যাপার, কারণ পুণ্যলাভের আকাঙ্ক্ষা না থাকা সত্ত্বেও তাদের ঘরে বরাবর রোজা লেগে থাকে। তার সবচেয়ে বেশি মেলামেশা তার মতোই যারা খাটিয়ে লোক, তাদের সঙ্গে। কাজ না হলে সে ধোপার ঘরে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কি সব গল্প-সল্প করে। সুলতানের মুখে যদি কখনো হাসি দেখতে হয়, তাহলে সেই সময়। নাপিত, মালী, দারোয়ান, ঝাড়ুদার ইত্যাদিরা হলো তার নিজের লোক, তা তারা হিন্দুই হোক, আর মুসলমান কিংবা খ্রীষ্টানই হোক, তাদের মাঝখানে বসে সে নিজেকে তাদের একেবারে আত্মীয় বলে মনে করে। তাকে কাজকর্ম জুটিয়ে দিয়েও সাহায্য করে তারা, সে-ও তাদের কাজ কম মজুরীতেই করে দেয়। তার থাকার জায়গাটা যদি তিন মাইল দূরেও হয়, তবু সন্ধ্যের পরই সে ফেরার কথা ভাবে।

একদিন সুলতানকে দেখা গেলো, সে রিকশা টানছে। ধুনুরী হলো কারিগর, আর রিকশা টানা লোক মানুষ নয়, পশুর পর্যায়ে পড়ে। সুলতানকে রিকশা টানতে দেখে এক বাবু মনে মনে প্রচণ্ড ধাক্কা খেলেন। কিন্তু সুলতান মান-অপমানের বাইরে। বাবুকে তার দিকে গভীর দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতে দেখে সে মুখে জোর করে হাসি টেনে আনার চেষ্টা করল। বলল, 'কাজ নেই। তা আমার এই ভাই বললে, আমার সঙ্গের লোকটা চলে গেছে, তুমি চলে এসো।' সুলতানের যদি তুলো-ধোনার কাজ জুটত, তাহলে কি সে রিকশা টানতে যেত? তার জাতভাইদের কখনও ওটা পছন্দ নয়। মধুপুরীতে মুসলমান রিকশা-টানা লোক একটাও খুঁজে পাওয়া যাবে না, অবশ্য সমভূমির শহরগুলোতে মুসলমান কুলি মজুররা অনেকেই সাইকেল রিকশা কিংবা হাতে-টানা রিকশা চালিয়ে থাকে। তাহলে কি সুলতান এখন ঐ অবস্থায় এসে পৌঁছেছে? কারিগরীর কাজ ব্যতিরেকে এখন দু' মুঠো খাবার যোগাড় করার জন্যে তার গায়ের শক্তি ছাড়া আর কোনো অবলম্বন নেই? সে যুবকও নয়, শক্তিশালীও নয়। যদি কোনো চড়াইয়ের ওপর রিকশা টেনে নিয়ে যেতে হয়, তাহলে সেটা নিশ্চয়ই তার পক্ষে নিতান্তই দুষ্কর হয়ে উঠবে। ডাক্তারদের মতামত নেওয়ার আবশ্যক হয় না মজুরদের, কিন্তু সুলতান যদি মিউনিসিপ্যালিটির ডাক্তারকে তার বুক দেখাতো, তাহলে নিশ্চয়ই তিনি বলতেন—'রিকশা টানা ছেড়ে দাও, নইলে যে কোনো সময় মরবে!' সুলতান মৃত্যুকে ভয় পায়নি কখনও। যতক্ষণ সে বেঁচে থাকবে, ততোক্ষণ উদরান্নের কোনো ব্যবস্থা করতেই হবে তাকে। ওপর

থেকে নীচের স্তরে নেমে যাওয়ার লোক সুলতান একা নয়। মধুপুরীতে তো বটেই, সারা দেশে এ রকম লোকের সংখ্যা লক্ষ লক্ষ, আর সংখ্যাটা কোটি স্পর্শ করতে দেরী নেই, যদি দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা এই রকমই থাকে। সুলতানের মতো লোকের অবস্থা তো লেখাপড়া শেখা লোকের চেয়ে হাজার গুণে শ্রেয়, কারণ লেখাপড়া শিখে তারা নিজেদের কর্মক্ষেত্র সীমাবদ্ধ করে ফেলে, কলম চালানো ছাড়া আর কোনো কাজ তারা জানেও না, করতেও চায় না। সুলতানের পতন দেখে তার পরিচিত ব্যক্তিদের হাসা উচিত নয়। তীর-ধনুক সে তার কুঠরীতে তুলে রেখেছে, সেখান থেকে যে কোনো সময় ওগুলো নিয়ে সে আবার বেরিয়ে পড়তে পারে কাজের খোঁজে।

পাহাড়ের লোকেরা খুব কমই নীচের সমভূমিতে গিয়ে বাস করার সাহস পায়। সমুদ্রতল থেকে অনেক উঁচুতে হওয়ার ফলে সমস্ত পাহাড়ের আবহাওয়াই যে শীতল, তা নয়। বস্তুত চার-পাঁচ হাজার ফুট উঁচুতে তুষার-গলা জলের নদী প্রবাহিত হয়—এ রকম স্থান হিমালয়ে খুব অল্পই, আর সেইসব জায়গার আবহাওয়াকেই ঠাণ্ডা বলা যেতে পারে। পাহাড়ে প্রবাহিত নদীগুলোর তট থেকে ওপরের অধিকাংশ গ্রামই দু-তিন হাজার ফুট বেশি উঁচুতে। তিন হাজার ফুট পর্যন্ত তো গরম থাকে। সমস্ত পাহাড়ই যে ঘন সবুজ গাছপালায় ঢাকা থাকবে এবং সেখানকার মানুষের জীবিকার্জনের পথ সুগম হবে, তার কোনো মানে নেই। পাহাড়ে জন্মানো শিশুরা প্রথম থেকেই বন্ধুর পথে চলা-ফেরা করতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। পাহাড়ী লোকেরা সাধারণত অভিযোগ করে, পাহাড়ে আমরা দিনে বিশ-তিরিশ মাইল দিব্যি হেঁটে যেতে পারি, কিন্তু সমভূমিতে দশ মাইল হাঁটতেই আমরা নেঙচাতে শুরু করি। কথাটা হয়ত খানিকটা অতিশয়োক্তি। তেমনি আবার সমভূমির লোকেরা উল্টো কথা বলে। একশো দু'শো গজের একটা মামুলী চড়াই ভাঙতে গিয়ে তারা হাঁসফাঁস করতে করতে দেশটার চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করতে লাগে। এখানকার লোকের জীবন পাহাড়ের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত বলে অন্য কোথাও যাওয়ার কথা যে তারা ভাবতেই পারে না তা নয়। অদৃষ্টবাদীরা বলে থাকেন, 'অন্ন রয়েছে যেখানে যেতে হবে সেখানে।' এই বাক্যের তাৎপর্য হিসেবে আমরা বলতে পারি, দু'মুঠো অন্নের জন্য মানুষ কোথায় না যেতে পারে। আমাদের লোকেরা উদরান্নের খোঁজে কুলি-মজুর হয়ে ফিজি, মরিশাস, দক্ষিণ আফ্রিকাই নয়, এমনকি দক্ষিণ আমেরিকার গায়ানা, ত্রিনিদাদ দ্বীপগুলিতে পর্যন্ত গিয়ে হাজির হয়েছে। হিমালয় পর্বতমালা শেষ হওয়ার পর কোথাও কোথাও তার সঙ্গে সংলগ্ন, আবার কোথাও-বা তার থেকে বিচ্ছিন্ন শিবালিকের ক্ষুদ্র পর্বতশ্রেণী। একস্থানে এই উভয় পর্বতশ্রেণীর মাঝখানে যথেষ্ট ব্যবধান, অতএব সেখানে চারদিকে ঘেরা এক বিস্তৃত ভূখণ্ড রয়েছে, এক সময় সেখানে নিবিড় জঙ্গল ছিল, হাতি বাঘ সিংহ ঘুরে বেড়াত। এ রকম জায়গাকে সংস্কৃতে দ্রোণী এবং হিন্দীতে দুন বলা হয়। যদিও এই দ্রোণীতে ভয়ঙ্কর বন্যজন্তুর ভয় ছিল, এবং তার চেয়েও ভয়ঙ্কর ম্যালেরিয়ার মশা, কিন্তু যখন

মানুষের জীবিকানির্বাহে সঙ্কট দেখা দিলো, তখন তারা সেখানে এসে সমস্ত জঙ্গল কেটে সাফ-সুতরো করে ধাপে-ধাপে ক্ষেত তৈরি করে ফেলল। জঙ্গল কেটে ফেলার জন্যে কত ঝরণা শুকিয়ে গেলো, কত জায়গায় ধ্বস নামল। মানুষের এক থেকে দুই, দুই থেকে চার, চার থেকে আট হিসেবে বেড়ে যাওয়াটা মামুলী ব্যাপার। অন্নসংস্থান না হওয়ার ফলেই মানুষ পাহাড় থেকে দ্রোণীর ভয়ঙ্কর জঙ্গলে এসে প্রবেশ করে।

দ্রোণীতে এসে বসবাসকারী পাহাড়ী লোকদের মধ্যে বহু ব্রাহ্মণ পরিবার ছিল। অনেক অচ্ছুত, হরিজন, কারিগরও ছিল। সবচেয়ে বেশি শোষিত-নিপীড়িত মানুষ সবচেয়ে বেশি ক্ষুধা কষ্ট সহ্য করতে পারে। এখানকার এই জীবন-সংগ্রামে তাদের ছেলেপিলেরা অনেকেই জ্ঞানবুদ্ধি জন্মানোর আগেই কেটে পড়ে। ফলে দ্রোণীতে পাহাড়ী লোকের সংখ্যা বাড়তে পারেনি। পাহাড়ের লোকজনের ক্ষেত্রে যে-কারণে দ্রোণীর প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল, সেই একই কারণ ঘটেছিল টিলা বা ছোট ছোট পাহাড়ের নীচে সমভূমিতেও, সেখানকার গ্রামগঞ্জ-শহরেও সন্তান-বৃদ্ধি হচ্ছিল আরও দ্রুত হারে। এইভাবে অষ্টাদশ শতাব্দীর উত্তরার্ধে ওপর নীচ উভয় দিক থেকেই লোকেরা অনাদিকাল থেকে সুরক্ষিত দ্রোণীর মহা অরণ্যের দিকে ছুটে আসতে থাকে, উভয়ের মধ্যে রেষারেষি শুরু হয়ে যায়। সমভূমির লোকের জনসংখ্যা বেশি, সেজন্য প্রবাসেও বেশি সংখ্যায় আসে তারা। এইভাবে কোনো এক সময় পাহাড়ীরা যে প্রথম জনবসতি গড়ে তুলেছিল দ্রোণীতে, সেখানে দেশোয়ালীরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে ওঠে—পাহাড়ী লোকেরা শিল্পাঞ্চলকে দেশ বা মধেশ আর সেখানকার অধিবাসীদের দেশোয়ালী বা মধেশিয়া বলে।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদেই দ্রোণীতে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। ইংরেজরা এখানে বসবাস করার জন্যে খুব আগ্রহ দেখায়, অবশ্য তার একটি কারণ, নেপাল থেকে কর্তিত হিমালয়ের এই অংশে অবস্থিত জায়গাটির ঠাণ্ডা আবহাওয়া। তারা ভেবেছিল এখানকার শীতল জলবায়ুতে শ্বেতাঙ্গরা স্বচ্ছন্দ জীবন-যাপন করতে পারে ; অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা, কানাডা, নিউজিল্যাণ্ড ইত্যাদির মতো এখানেও তারা তাদের উপনিবেশ গড়ে তুলতে পারে। ইংরেজরা মনে করত, তাদের নতুন নতুন অস্ত্রশস্ত্র রয়েছে, সেগুলো সব সময় তাদের কাছেই থাকবে, আর নেটিভরা (কৃষ্ণাঙ্গরা) তাদের গোলামি করার জন্যে সব সময় প্রস্তুত থাকবে। উনবিংশ শতাব্দীর উত্তরার্ধের পুরো সময় তারা আসাম থেকে কাংড়া-কাশ্মীর পর্যন্ত সমগ্র এলাকা জুড়ে এই স্বপ্ন দেখছিল। তখন তাদের সামনে শুধু একটিই সমস্যা : এখানে শ্বেতাঙ্গ উপনিবেশ পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব তখনই, যখন এখানে তাদের জীবন-জীবিকার সংস্থান সুনিশ্চিত হবে। শ্বেতাঙ্গদের জীবন-যাপনের মান খুব উন্নত, আর পরাধীন দেশে তারা তো নিজেদের দেবতুল্য প্রমাণ করার জন্যে জীবনের মান আরও উন্নত করে রাখতে চায়। ইংলণ্ডে না খেয়ে মরা গরিবের

সংখ্যা কম নয়, কিন্তু কৃষ্ণাঙ্গদের দেশে তারা আসুক, ইংরেজরা তা চাইত না। শ্বেতাঙ্গদের পাচক খানসামা হয়ে এখানে আসাটা তাদের মনঃপুত নয়। জীবিকার্জনের সংস্থান করতে তারা এখানে-ওখানে চায়ের বাগিচা তৈরি করল, ফলের বাগান করল, তামা লোহার খনি চালু করল। খনিজ দ্রব্যে ইংলণ্ডের কারখানাগুলোর সঙ্গে প্রতিযোগিতা ছিল, তাদের সস্তা জিনিসপত্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় এখানকার এই কারখানাগুলো সাফল্য অর্জন করতে পারছিল না, কারণ দূর পথে পরিবহণ ব্যয়ের আধিক্য। তবু ইংরেজরা তাদের প্রচেষ্টা বিসর্জন দিতে রাজী হয়নি। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ শেষ হওয়ার সময় উপনিবেশ স্থাপন করার উদ্যোগে আর একবার জোর হাওয়া লাগল। হগ্‌সন বারংবার প্রস্তাব দিয়ে হতাশ হয়ে পড়েছিলেন, কারণ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ণধারেরা উপনিবেশের পক্ষে ছিলেন না। বৃদ্ধ হগ্‌সন এবার তাঁর প্রচেষ্টাকে সাফল্যের দিকে এগিয়ে যেতে দেখে খুশি হয়ে উঠলেন।

কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে সাতচল্লিশ সালের ভয়ঙ্কর বিদ্রোহ শুরু হলো। বিদ্রোহের তিক্ত অভিজ্ঞতা ইংরেজদের মস্তিষ্ক থেকে হিমালয়ে শ্বেতাঙ্গ উপনিবেশ গড়ে তোলার স্বপ্ন চিরকালের জন্য মুছে দিলো। এখন তাদের একমাত্র লক্ষ্য, হিমালয়ের ঠাণ্ডা জায়গায়, যেখানকার জলবায়ু এবং গাছপালা ইংলণ্ডের মতোই, সেখানে মধুপুরীর মতো যেসব প্রমোদনগরীর সূচনা হয়েছে, সেগুলিকে আরও উন্নত করে তোলা।

প্রমোদনগরীর জন্যে শুধু সমাজসেবীদেরই প্রয়োজন হয় না, খাওয়া-পরার অন্যান্য বহু জিনিসই যত কাছাকাছি পাওয়া সম্ভব, ততোই ভালো। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদেই দ্রোণীর জঙ্গল কাটা শুরু হয়েছিল, এখন তার গতি আরও তীব্র হয়ে উঠল।

আগেকার একটি গ্রাম এখন বাড়তে বাড়তে শহরের রূপ নিতে চলেছে, দাঁড়ি-পাল্লা ধরার কাজ নিয়েছে দেশোয়ালী বেনেরা, সুদের কারবারও চলে গেছে তাদের হাতে। দ্রোণীতে দেশোয়ালীদের প্রাধান্য, না পাহাড়ীদের প্রাধান্য সেটা সেখানকার ভাষা থেকেই মালুম হয়ে যায়। পাহাড়ী লোকেরাও এখানে এসে এখন সমভূমির ভাষায় কথা বলতে শুরু করে, কেবল বিয়ে-টিয়ের ব্যাপারেই চাল-চলনের পাহাড়ী প্রথা ভাবে তারা। কৃষিকার্যেও দেশোয়ালীদের মোকাবিলা করতে পারে না, কারণ কৃষক ও ক্ষেতমজুরদের অধিকাংশই নীচে থেকে আসা লোক। ভীষণ ভীষণ প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও দৈব-দুর্ঘটনা সহ্য করে কঠোর পরিশ্রমে পাহাড়ীরা যেসব শস্যক্ষেত তৈরি করেছিল, সে-সব অনেকই দেশোয়ালী মহাজনদের কবলে চলে গেছে, গ্রামের বহু লোক জীবিকার অন্বেষণে দ্রোণীতে স্থাপিত নতুন শহরের দিকে পালিয়ে যাচ্ছে।

দুই

একটি পাহাড়ী ব্রাহ্মণ পরিবার দ্রোণীতে এসে বাস করতে শুরু করেছিল। মাসে চার টাকা মাইনের চাপরাসিগিরি তখনকার দিনে খুব সৌভাগ্যের ব্যাপার বলে মনে করা হতো। বস্তুত ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের চার টাকা, ১৯৪০-এর ষোলো টাকা এবং ১৯৫৩-র চৌষট্টি টাকার সমান ; যদি গমের দরে টাকার হিসেব করা যায়। তবু, চার টাকায় সেই ব্রাহ্মণ-পরিবারের —মা-বাপ আর তাদের চারটি ছেলে-মেয়ের ভরণ-পোষণ কি করে হতো, বুঝে ওঠা দুষ্কর। এই পরিবারের দুটি ছেলের বড়টি হলেন আমাদের মাস্টারমশাই। বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দশকে তাঁর জন্ম। সে-সময় স্কুলের সংখ্যা বেড়ে চলছিল। মাস্টারমশাইয়ের বাবা কোনোরকমে সই করতে পারতেন, কিন্তু শিক্ষার গুরুত্ব বুঝতেন তিনি। পাড়াতেই স্কুল। তিনি তাঁর ছেলেদের স্কুলে ভর্তি শুরু করে দিলেন। মাস্টার-মশাই সাধারণ মেধার ছাত্র, তবু কয়েক বছর যে তিনি কোনো পরীক্ষায় ফেল করলেন না, সেটা কম কথা নয়। বাপ না খেয়ে কষ্ট করে বড় ছেলেটিকে হিন্দী মিড্‌ল স্কুল পাস করালেন। শহরে না হলে সম্ভবত তাঁর লেখাপড়া প্রাইমারীর পর আর এগোতো না। বাপ ভেবেছিলেন —ছেলে মিড্‌ল পর্যন্ত পড়ে ফেললে নিশ্চয়ই কোথাও ছেলেপিলে পড়িয়ে নিজের রুজি-রোজগারের একটা ব্যবস্থা করে নেবে।

মাস্টারমশাই ষোলো বছর বয়েসে মিড্‌ল স্কুলে পাস করেন, কিন্তু মা-বাপ চার বছর আগেই বিয়ে দিয়ে ছিলেন তাঁর। দেরী করে বিয়ে দেওয়াটা ওদের পছন্দ নয়, আর যাদের ঘরে মেয়ে রয়েছে, তারাই বা দেরী করতে চাইবে কেন ? গ্রাম হলে পাঁচ-দশ ক্রোশ দূরের গ্রামে বর খুঁজতে যেতে হয়, কিন্তু এই শহরে নানা গোত্র-বর্ণের পাহাড়ী ব্রাহ্মণ-পরিবার রয়েছে। মাস্টারমশাইয়ের বাপ-মা কনেটিকে বরাবর দেখে এসেছেন, ওরা তাঁদের দূর সম্পর্কের জ্ঞাতি। উভয়ের বয়েসে পাঁচ-ছ' বছরের তফাৎ, কিন্তু বয়সের গোড়ার দিকে ছেলে মেয়ে পরস্পর জ্ঞানবুদ্ধির প্রতিযোগিতা শুরু করে দেয়, তাতে শেষ পর্যন্ত মেয়েদেরই এগিয়ে যেতে দেখা যায়।

হিন্দী মিড্‌ল স্কুল পাস করার পর গরিব ছেলেকে কিভাবে ইংরেজি স্কুলে ভর্তি করা যায় ? মাইনে মকুব করিয়ে বাপ কষ্টেসৃষ্টে ছেলেকে কোনোরকমে মিড্‌ল স্কুল পর্যন্ত পড়িয়েছেন। এরপর আর পড়ানোর ক্ষমতা নেই তাঁর। ছেলেটিও এমন মেধাবী নয় যে মিড্‌ল স্কুল পাস করে সে ছাত্রবৃত্তি পাবে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অর্থনৈতিক সঙ্কটের মধ্যে মানুষ বড় কষ্টে কোনো মতে দেহের সঙ্গে প্রাণটিকে ধরে রাখতে পেরেছে। শতাব্দীর শুরুতে কে একজন মিড্‌ল পাস

শিক্ষিতের পাচকগিরি করার ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, কিন্তু এখনও সে ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়নি, বিশেষ করে এই শ্রেণীতে। আমাদের মাস্টারমশাইও একটা প্রাইমারী স্কুলে কাজ পেয়ে গেলেন। চাপরাশি বাপের এই কৃতিত্ব মূলত তার সাহেবের সুপারিশের জোরেই। মাস্টারমশাই ছেলে পড়াতে শুরু করলেন। সতেরো বছর বয়স। ছোট-খাটো চেহারা, তদুপরি শরীরটাও রোগা-পাতলা বলে তাঁকে মাস্টারমশাই বলে মনেই হয় না। নিজের পদের গুরুত্ব প্রমাণ করার জন্যে তাঁকে প্রয়োজনের তুলনায় ছড়ির সাহায্য নিতে হয় বেশি করে। সে-সময়ের বহু-পূর্বেই শিক্ষা-বিশেষজ্ঞরা স্বীকার করে নিয়েছিলেন যে মগজে শিক্ষা ঢোকানোর জন্যে ছড়ি যে কেবল অনাবশ্যক, তাই নয়, ক্ষতিকারকও বটে। শিক্ষা-বিভাগ তত্ত্বটির খুব প্রচারও চালাচ্ছে। অথচ পড়া মুখস্থ না করে কোনো ছেলে যখন মেজাজ খারাপ করে দেয়, কিংবা অনবরত কামাই করতে থাকে, তখন ছড়িতে হাত না দিয়ে উপায় কি ? শিক্ষা বিভাগের ছোট-বড় কর্তারা যখন স্কুল পরিদর্শন করতে আসেন, তখন খুব খেয়াল রাখতে হয় যাতে স্কুলের ভেতরে কোথাও ছড়ি চোখে না পড়ে।

মাস্টারমশাই চাকরি পেয়েছিলেন তাঁদের শহর থেকে দূরে জঙ্গলের কাছে কোনো একটা গ্রামে। সেখানে চাকরিতে ঢোকার প্রথম বছরেই তাঁকে ম্যালেরিয়া ধরাশায়ী করল, আর তার ধাক্কায় গায়ে যেটুকু মাংস ছিল, সেটুকুও ঝরে গেলো। বাপ এবং শ্বশুরবাড়ির লোকেরাও চিন্তিত হয়ে উঠলেন, কিন্তু শহরে তো আগে থেকেই লেখা-পড়া জানা লোক শিক্ষকতার কাজের জন্যে প্রার্থী হয়ে আছে। গ্রামের স্কুলেই দু' বছর পড়ে থাকতে হলো মাস্টারমশাইকে। তবে চেষ্টা-চরিত্র করার ফল হলো এই, আপাতত শহরের মিউনিসিপ্যালিটির স্কুলে ঠাঁই হলো না বটে, তবে ট্রেনিং স্কুলে পাঠিয়ে দেওয়া হলো তাঁকে। সেখান থেকে ফেরার পর মিউনিসিপ্যালিটির স্কুলে জায়গা পেয়ে গেলেন তিনি।

শহরের স্কুলে ঢুকতে পেরে মাস্টারমশাইয়ের খুব আনন্দ হলো। বাড়িতে থেকে স্কুলে পড়ানো যাবে, শুধু সেই জন্যেই নয়, বউকেও কাছে পাওয়া যাবে এখন। পাহাড়ী ব্রাহ্মণ-রাজপুত শ্যামবর্ণ খুব কমই হয়। মাস্টারমশাইয়ের গায়ের রঙ ফরসা তার চেয়েও ফরসা তাঁর বউ। শুধু ফরসা বললেও তার প্রতি অবিচার করা হয়। ষোলো বছরে পা দিয়ে সে শুধু সুন্দরী নয়, অনন্যসুন্দরী হয়ে উঠল। মাস্টারমশাই তার কাছে কিছুই না। অথচ সেজন্যে সে কখনও অসন্তোষ প্রকাশ করেনি। শহরে এসে এখন কেবল দিনরাত্রি আনন্দ আর আনন্দ, গরিব পরিবারে সেটা কি আশা করা যায় ? মাস্টারমশাইয়ের জন্মের সময় বাপ যে মাইনে পেতেন, এখন সেই টাকাই পেন্সন পান তিনি। মাস্টারমশাই মাইনে পান পনেরো টাকা। কোনো টিউশনি পেয়ে গেলে আরও চার-পাঁচ টাকা হাতে আসে। কিন্তু শহরে শুধু হিন্দী জানা শিক্ষকের টিউশনি জুটবে কোত্থেকে,

যেখানে ইংরেজি লেখাপড়া জানা লোক সস্তায় টিউশনি করার জন্যে এক পায়ে খাড়া। বাপ ধার-কর্জ করে কোনোরকমে মেয়েদের বিয়ে দিয়েছেন, সে-সব করতেও কয়েক বছর লেগেছে তাঁর। ছোট ছেলেরও বিয়ে দিয়েছেন। বাপ-মা আর ছেলে-বউ মিলিয়ে পরিবারে এখন ছ'জন। শহরে আসার পর মাস্টারমশাইয়ের প্রথম ছেলে হয়, তিন বছর পর দ্বিতীয়টি, তার পরের বছর আর একটি, তারপর তার পরের বছরই একটি মেয়ে—এখন মোটমাট চারটি ছেলে মেয়ে তাঁর। এই সময় মা-বাপ চলে গেলেন, এখন মাস্টারমশাই নিজেই বাড়ির কর্তা, তার মানে তিনি কেবল তাঁর পরিবারেরই কর্তা। অর্থসঙ্কট চলতে থাকলে একান্নবর্তী পরিবার বেশিদিন টিকতে পারে না। ছোটভাই পৃথক হয়ে গেছে। এই শহরের স্কুলে মাস্টারমশাইয়ের পদোন্নতির বিশেষ আশা নেই। কেউ কেউ তাঁকে বলল, মধুপুরীতে শিক্ষকের বেতন বেশি, সেখানে পাহাড়ী-ভাতা (হিল্ অ্যালাউন্স)-ও পাওয়া যায়। কিন্তু মধুপুরীর ঠাণ্ডাকে ভয় পান মাস্টারমশাই, তাছাড়া সেখানে যে খুব খরচপত্র, সেটাও জানেন তিনি। বারো-চোদ্দ মাইলের মধ্যেই মধুপুরী, সকালে রওনা হলে সন্ধ্যেয় পৌঁছে যাওয়া যায়। মাস্টারমশাই অনেকবার মধুপুরী দেখেছেন। খরচের ভয় আছে ঠিকই, কিন্তু সেখানে নগদ টাকায় দেড়গুণ মাইনে। ঘর-গেরস্থালি দেখাশোনার ব্যাপারে স্ত্রীর ওপর তাঁর পুরোপুরি আস্থা আছে—এ ব্যাপারে মাস্টারমশাই অসাধারণ সৌভাগ্যবান। এত কম উপার্জনে তাঁর পক্ষে কখনওই সংসার সামলানো সম্ভব হতো না যদি এমন স্ত্রী না জুটত তাঁর। স্ত্রী যখন তাঁকে ভরসা দিলো যে সেখানে তাঁরা এর থেকেও ভালো থাকবেন, তখন তিনি চেষ্টা শুরু করলেন। শিক্ষকের চাহিদা সেখানে আগে থেকেই ছিল, তাছাড়া বর্তমানে সেখানে শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। মাস্টারমশায়ের চাকরি পেতে অসুবিধে হলো না।

মধুপুরীর এক প্রান্তে অবস্থিত একটি স্কুলে যখন তিনি সর্বপ্রথম গেলেন, তখন তাঁর মনে খানিকটা অসন্তোষ দেখা দিলো। তিনটি বাজারের কোনো একটাতে স্কুল হলে সেখানে হয়ত দু-একটা টিউশনিও মিলত। তবু এখানে কিছু সুবিধেও আছে—কাছের জঙ্গল থেকে তাঁরা বিনা পয়সায় জ্বালানী কাঠ যোগাড় করে নিতে পারেন। বহু আউট হাউস খালি পড়ে আছে, সেগুলোর দু-একটা ঘর বিনা ভাড়ায় নিয়ে নিতে পারেন। যা পেয়েছেন তাতেই সন্তুষ্ট হলেন তিনি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে জিনিসপত্র দুর্মূল্য হয়ে উঠেছে। মহার্ঘ ভাতা পান, অথচ মাইনের সমস্ত টাকাতেও ঘরের খাওয়া-খরচই কুলোয় না। ঘরে শুধু একবেলা রুটি হয়। তার থেকে দু-চারখানা রেখে দেওয়া হয় ছেলেদের সকালবেলার জলখাবারের জন্যে। এভাবে শুধু নিজেদের কেন, ছেলেদেরও আধপেটা খাইয়ে রেখে কিভাবে চলে? ওদিকে যুদ্ধের ফলে সেনাবাহিনীতে নানারকম চাকরি-বাকরি পাওয়া যাচ্ছে, মাইনেও ভালো, রেশন এবং পোশাক-পরিচ্ছদের দাম বেতন থেকে কাটা

হয় না। মাস্টারমশাইয়ের বয়স বত্রিশ হয়ে গেছে। কিন্তু যুদ্ধে লোকের এমন চাহিদা যে বয়সটা তখন কোনো বাধাই নয়। তিনি চেষ্টা করলে হয়ত সৈন্যও হতে পারতেন, কিন্তু শখ করে যুদ্ধে গিয়ে মরতে কে আর চায়! পাহাড়ী সৈন্যদের পড়ানোর জন্যে হিন্দী শিক্ষকও দরকার। মাস্টারমশাই যদি মধুপুরীতে না থাকতেন, তাহলে এ রকম চাকরির হদিসই পেতেন না তিনি। হিন্দী মিড্‌ল পাসই হোন আর নর্মাল পাসই হোন, শিক্ষকেরা সাধারণত কূপমণ্ডূকই হয়ে থাকেন, স্কুল আর ঘর-সংসারের বাইরে জগতের আর কোনো খবরই রাখেন না তাঁরা। খবরের কাগজ পড়ার আগ্রহ থাকে না, আর আগ্রহ থাকলেও এত কম বেতনে তা কিনে পড়বেন কি করে? তাঁদের কূপমণ্ডূকতা কোথায় গিয়ে পৌঁছেছে, একটা উদাহরণ দিলে সেটা সহজেই বোঝা যাবে। সম্প্রতিকালে একজন নিজের অসামান্য কৃতিত্বে শুধু ভারতে নয়, ভারতের বাইরেও বিখ্যাত হয়ে উঠেছেন। কিন্তু যে মিড্‌ল স্কুল থেকে তিনি মিড্‌ল পাশ করেছিলেন, তার প্রধান শিক্ষক মহাশয় সেই বিখ্যাত ব্যক্তিটির নাম কখনও শোনেননি।

মাস্টারমশাই একদিন সেনাবাহিনীর স্কুল-শিক্ষক হয়ে মধুপুরী থেকে চলে গেলেন। স্ত্রী যখন শুনলেন যে লাম্‌-এ (যুদ্ধক্ষেত্রে) যেতে হবে না, তখন তিনিও যাওয়ার অনুমতি দিলেন।

তিন

মাস্টারমশাই এখন তাঁর জেলা থেকে দূরে একটি ছাউনিতে থাকেন। যুদ্ধের রঙরুটরাই তাঁর ছাত্র। তরুণ সেপাই খুব কমই আসে, কারণ তাদের প্রয়োজন যুদ্ধক্ষেত্রে। চেষ্টা করলে মাস্টারমশাই ভারতের বাইরেও যেতে পারতেন, তাহলে বেতন ভাতা ইত্যাদি আরও বাড়ত, কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রের কাছাকাছি যাওয়া তাঁর মোটেই পছন্দ নয়। কিছুদিন পরে তাঁকে আসামের একটি ছাউনিতে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। এই নতুন জীবন তাঁর মনঃপূত হলো না। সব সময় তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রী এবং চার ছেলেমেয়ের কথা মনে পড়ে। স্ত্রী চিঠিপত্র লিখতে পারেন, স্বামী-সংসর্গেরই ফলশ্রুতি সেটা। কিন্তু তাঁর ভাষা বিশুদ্ধ হিন্দী নয়, গুরুচণ্ডালী। ছাত্রদের প্রতি মাস্টারমশাই খুব সন্তুষ্ট। তিন মাসের বেশি খুব কম ছাত্রই তাঁর কাছে থাকে। যদি কেউ অক্ষরগুলো চিনে ফেলে কিংবা হোঁচট খেয়ে খেয়ে এক আধটু পড়তে শুরু করে, তাহলেই আহা-মরি ব্যাপার, নইলে এখানে স্কুলের ডেপুটি ইনস্পেক্টরের ভয় নেই যে অযোগ্য বলে মাস্টারমশাইয়ের পদোন্নতি বন্ধ করে দেবেন। রঙরুট ছাত্রদের ওপর তাঁর ছড়ি তোলারও দরকার হয় না। স্কুলের সময় চার ঘণ্টার বেশি নয়। সেপাইদের জন্যে যে মেস আছে, সেখান থেকেই মাঝে মাঝে রান্না করা খাবার জুটে যায়, ঘরের খাবারের চেয়ে তা কোনো অংশেই

খারাপ নয়। ছোঁয়াছুঁয়ির ব্যাপারে মাস্টারমশাই তাঁর পূর্বপুরুষদের মেনে চলেন, কিন্তু এখানে এই মেসে যে লোকটা রান্নাবান্না করে, সে তাঁর নিজেরই সগোত্র পাহাড়ী ব্রাহ্মণ, সেজন্য মনে কোনো দ্বিধা-সংকোচ থাকার কথা নয়। দরকার পড়লে আপৎকালীন ব্যবস্থা হিসেবে নিজের জন্মভূমি থেকে দূরে ছোঁয়াছুঁয়ির নিয়ম খানিকটা শিথিলও করতে পারেন।

এখানে এসে মাস্টারমশাই কয়েক মাসই নিশ্চিন্তে কাটাতে পেরেছেন। তারপরই জাপান আক্রমণ করে বসল। সিঙ্গাপুরের নৌবাহিনীর ঘাঁটিকে অজেয় বলে মনে করা হতো। আসলে সেখানে ইংরেজরা নিজেদের দুটি অজেয় রণপোত পাঠিয়ে দিয়েছিল, কিন্তু সেই অজেয় নৌবাহিনী চোখের পলক পড়তে না-পড়তে ফানুসের মতো ছাই হয়ে গেলো। জাপানী বাহিনী দ্রুত ব্রহ্মদেশে এসে উপস্থিত হলো। ইংরেজ বীরপুঙ্গবেরা সেখান থেকে পালানোরও ফুরসৎ পেলো না। ইংরেজরা প্রাণপণ চেষ্টা করতে থাকে যাতে ছাউনির সেপাইরা এই নিদারুণ পরাজয়ের কথা কিছু জানতে না পারে। মাস্টারমশাই যে ছাউনিতে থাকেন, সেখানে যদিও এসব খবর সংবাদপত্র ইত্যাদির মাধ্যমে ফাঁস হতে দেওয়া হয় না, তথাপি, এই ধরনের খবরের তো ডানা-পাখনা থাকে, এবং তা উড়ো জাহাজের চেয়েও তীব্র গতিতে সব জায়গায় গিয়ে পৌঁছে যায়। ছাউনিতে পরাজয়ের কথা নিয়ে আলোচনা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ, কিন্তু যেখানে চোখের সামনে প্রাণ-সঙ্কট, অথচ মানুষের মনে কোনো উচ্চ চিন্তা-ভাবনা বা কর্তব্য-বোধ কাজ করে না, সেখানে আলোচনা বন্ধ করা যাবে কি করে? অন্যান্য সেপাইয়ের মতো মাস্টার-মশাইও দুশ্চিন্তায় ভুগতে লাগলেন।

ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী চার্চিল, সেই সঙ্গে মিত্রশক্তির অন্যান্য প্রধান মন্ত্রী ও আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ধোঁয়া ধোঁয়া বিবৃতি দিচ্ছেন—'আমরা ফ্যাসিস্ট স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে। আমরা গণতন্ত্র চাই। মানুষকে ক্রীতদাস রূপে নয়, তাদের মুক্ত স্বাধীন হিসেবে দেখতে চাই। আমাদের লড়াই মানুষের স্বাধীনতার লড়াই। হিটলার, মুসোলিনি এবং তোজো পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে ক্রীতদাসে পরিণত করতে চান।' ভারতবাসীদের কানে এইসব লম্বা-চওড়া কথা বিদ্রূপের মতো শোনায়। চার্চিলের ইংরেজ-শাসন মানুষকে ক্রীতদাসত্ব থেকে কতটা স্বাধীন করেছে, তা ভারতের এইটুকু এইটুকু শিশুরাও জানে। মাস্টারমশাই বিশ্ব-সংসারের কোনো খবর রাখেন না। তাঁর জেলায় গান্ধীজীর আন্দোলনও কখনও এমন জোরদার হয়ে ওঠেনি যে রাজনীতি বিষয়ে কিছু জানার সুযোগ হবে তাঁর। কিন্তু ইংরেজরা আমাদের ক্রীতদাস করে রেখেছে, আমাদের সঙ্গে পশুর মতো ব্যবহার করছে, সেজন্য তারা সকলেরই ঘৃণার পাত্র—এই মনোভাব সমস্ত ভারত-বাসীর মতো মাস্টারমশাইয়েরও রক্তে মিশে গেছে। ইংরেজরা তাদের সেপাইদের কাছে এসব কথা তোলেই না। 'সাময়িক সংবাদপত্রে' কখনো চার্চিল কিংবা

রুজভেল্টের কোনো ভাষণের কিছু কিছু অংশ ছাপানো হয় ঠিকই, তবে সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয় যাতে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার মতো শব্দগুলি সেপাইদের কানে না যায়। ছাউনিতে যে রেজিমেণ্টটা রয়েছে, তার কর্নেল কয়েকবার তার শ্বেতাঙ্গ হিন্দীতে সেপাইদের সামনে ভাষণ দিয়েছে, তাতে সেই একই কথার পুনরাবৃত্তি—'আমরা রাজার কাছে ঋণী। তাঁর নুন খেয়েছি আমরা। রাজা ঈশ্বরের সমান। ঈশ্বরের সেবা করলে যে পুণ্যলাভ হয়, সেই পুণ্যলাভ হয় রাজার সেবায়। আমাদের রাজা সন্তানের মতো আমাদের ভালোবাসেন। যাতে অফিসার এবং সেপাই কারোর কোনো অসুবিধে না হয়, সেদিকে তিনি সব সময় লক্ষ্য রাখেন। মহারাণী স্বয়ং গিয়ে ভারতীয় বীরদের সঙ্গে দেখা করেন, বীরত্বের নিদর্শন হিসেবে তিনি নিজের হাতে তাঁদের বুকে মেডেল পরিয়ে দেন, হাসপাতালে গিয়ে নিজের হাতে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিতেও ইতস্তত করেন না। আমাদের রাজা ও মহারাণীর মঙ্গল কামনা করা উচিত। আমাদের কাছে এ-যুদ্ধ কিছুই না। আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে আমরা এর চেয়েও বড় যুদ্ধে জয়লাভ করেছি।'

শ্বেতাঙ্গ কর্নেলের বক্তৃতায় সেপাইদের ওপর কি আর প্রতিক্রিয়া হবে? তারা কার নুন খাচ্ছে, সেটা তারা খুঁজেই পাচ্ছে না। তবে হ্যাঁ, এইটুকু তারা জানে যে খিদের হাত থেকে বাঁচতে নিতান্তই উদরান্নের তাগিদে সেনাবাহিনীতে ভর্তি হতে হয়েছে তাদের। যদি সেনাবাহিনীতে যোগ দিলে সমস্ত সৈন্যেরই মৃত্যু অবধারিত হতো, তাহলে তারা যে কখনও এ-কাজে আসত না, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। ওরা জানে, যুদ্ধে যারা যায় তারা সবাই মরে না, আমরাও মরব না, এবং আমাদের গাঁয়ের চন্দ্রসিং-এর মতো যুদ্ধ শেষে পেন্সন নিয়ে বাড়ি ফিরব। প্রথম মহাযুদ্ধের সঙ্গে এখনকার মহাযুদ্ধের যথেষ্ট তফাৎ। এই স্বাধীনতা আন্দোলনের তরঙ্গ ছিল না, গান্ধীজীর নেতৃত্বে দেশের আনাচে-কানাচে যে অসহযোগ ও সত্যাগ্রহ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছে, প্রথম মহাযুদ্ধের আগে দেশে এই স্বাধীনতা আন্দোলনের তরঙ্গ ছিল না। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় সেনাবাহিনীতে ভারতীয় সেপাইরা সুবেদার-মেজর পর্যন্ত হওয়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করতে পারত, অথচ এখন কেবল প্রচুর লেফটেন্যাণ্ট রয়েছে, তাই নয়, বহু ক্যাপ্টেন ও মেজরও রয়েছে। কিছুকিছু কর্নেলও আছে, কিন্তু ইংরেজরা তাদের ওপর আস্থা রাখতে পারে না, সেজন্য তাদের হাতে রেজিমেণ্টের কম্যাণ্ড দেওয়াটা কর্তৃপক্ষের পছন্দ নয়। বহু ভারতীয় অফিসারকে তারা ভারতীয় সেপাইদের মধ্যে রাজভক্তি প্রসারের কাজে লাগিয়েছে। অফিসাররা, তা তারা শ্বেতাঙ্গ কিংবা কৃষ্ণাঙ্গ যাই হোক না কেন, সেপাইদের চেয়ে নিজেদের অনেক বড় বলে ভাবে, কিন্তু পশ্চিমে হিটলার এবং পূর্বে জাপানের জয়লাভ দেখে ভারতীয় অফিসাররা চোখে সর্ষে ফুল দেখছে। ওদিকে দেশের বড় বড় নেতাদের হাজারে হাজারে কারারুদ্ধ করা হয়েছে, আগস্ট আন্দোলনে বিপর্যস্ত ইংরেজ বালিয়ার মতো কত জায়গায় পাঞ্জাব

ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটাতে শুরু করেছে। এসব কথা ভারতীয় অফিসারদের কাছে গোপন নেই। ইংরেজদের জঘন্য ব্যবহার এখনও তারা আগের মতোই লক্ষ্য করছে। রাজভক্তির প্রসার ঘটাবার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে যেসব অফিসারদের ওপর, সেইসব অফিসারও বক্তৃতার সময় যাই বলুক না কেন, নিরিবিলিতে আসল কথাটি বলে ফেলে।

মাস্টারমশাই তার বহু সহকর্মী শিক্ষক এবং ছাত্রের মতো দিনের পর দিন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে উঠছেন। তারপর যখন হাজার হাজার ভারতীয় ব্রহ্মদেশ থেকে পালিয়ে অত্যন্ত বেহাল অবস্থায় ক্ষুধাতৃষ্ণায় অস্থিচর্মসার হয়ে মণিপুরের পথে তাদের ছাউনির পাশ দিয়ে যেতে লাগল, তখন তাদের চোখ থেকে ঘুম ছুটে গেলো। যে-লাম্‌কে তাদের এত ভয়, সেই লাম্‌ যেন এখন হাঁ করে গিলতে আসছে তাদের। কলকাতায় জাপানী বোমা পড়ার খবর শুনে তাদের তো পুরোপুরি বিশ্বাস হয়ে গেলো যে তাদের ওপরেও যে-কোনোদিন বোমা ফাটবে।

চার

মণিপুর রণাঙ্গনের রূপ নিলো। রণাঙ্গনের কাছাকাছি জায়গায় মাস্টারমশাইয়ের স্কুলের এখন আর কোনো প্রয়োজন নেই। তাতে খুব খুশি হয়ে উঠলেন তিনি। তাঁকে তাঁর জেলারই এক ছাউনিতে বদলি করে দেওয়া হলো। এখন তিনি বাড়িতেই থাকেন, পড়ানোর জন্যে ছাউনিতে যান। আগের চেয়ে তাঁর আর্থিক অবস্থা বর্তমানে ভালোই। তাঁকে কেউ যুদ্ধের কথা জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, যুদ্ধ এইরকম এইরকম, আর সেটা চলছে তো চলছেই। অথচ, যুদ্ধ এক সময় না এক সময় বন্ধ হয়েই থাকে। যুদ্ধ বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দু-তিনটি সার্টিফিকেট সহ মাস্টারমশাইয়ের ছুটি হয়ে গেলো। তিনি ভাবলেন, ইংরেজদের এই সেবার ফলে তিনি খুব লাভবান হবেন। প্রথম মহাযুদ্ধের পর অনেকেই লাভবান হয়েছিল। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হতে-না-হতেই ইংরেজ ভারত থেকে তল্পি-তল্পা গোটাতে শুরু করল। এখন তাদের নিজেদেরই যখন ঠাঁই-ঠিকানা নেই, তখন তারা তাদের গুণগ্রাহীদের জন্যে আর কি করবে? বড় বড় গুণগ্রাহীদের জন্যেও তারা কিছু করতে অক্ষম। অনেক মাস ধরে মাস্টারমশাইকে বাড়িতে বেকার হয়ে বসে থাকতে হলো। তারপর যখন তিনি মধুপুরীতে আগেকার চাকরিটাই আবার পেয়ে গেলেন, তখন তাঁর ধড়ে প্রাণ এলো। তিনি ভেবেছিলেন, সেনাবাহিনীতে কাজ করার ফলে এবার তিনি সহ-শিক্ষক থেকে প্রমোশন পেয়ে প্রাইমারী স্কুলের প্রধান শিক্ষক হওয়ার সুযোগ অবশ্যই পাবেন। সেনাবাহিনীতে যাওয়ার সময়েও মনে মনে এই প্রত্যাশাটাই ছিল। কিন্তু চার বছর ধরে তাঁর সমস্ত সেবাকর্মের পর ফিরে এসে আবার সেই সহ-শিক্ষকতাই জুটল।

মাস্টারমশাই সেনাবাহিনীতে চাকরি নিয়ে যখন যান, তখন তাঁর চারটি সন্তান। এখন একদিকে তাঁর উপার্জন কমে গেছে, অন্যদিকে ঘরে প্রতি বছর নতুন নতুন মুখ দেখা দিতে শুরু করেছে। মধুপুরীতে এসে প্রথম বছরেই তাঁর পঞ্চম সন্তান ভূমিষ্ঠ হলো, পরের বছর ষষ্ঠ সন্তান। এভাবে সংসারে লোকজন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দুরবস্থাও বাড়তে লাগল। এ-যাবৎ মাস্টারমশাইয়ের ন'টি সন্তান, সংখ্যাটি যে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে বলা যায় না। সকলের মুখে প্রয়োজন মতো অন্নটুকুও যোগানো সম্ভব হয় না। টাকায় সওয়া সের দেড় সের করে আটা চাল। সকালে দেড় সের চাল দেড় সের আটা এবং সন্ধ্যের আড়াই সের আটার খরচ। তাতে মাস্টারমশাই এবং তাঁর স্ত্রীর গায়ের রক্ত যদি শুকিয়ে যায়, তাতে আশ্চর্য কি? তার ওপর ছেলেপিলের লেখাপড়াও রয়েছে। স্কুলের ফী যদি অর্ধেক মকুব হয়, তাহলেও বইপত্র এবং কাপড়-চোপড় তো রয়েছে। এ-বছর নবম শ্রেণী ও অষ্টম শ্রেণীর দুটি ছেলে ফেল করেছে। এখন আর তাদের ফী মকুব করানো সম্ভব নয়। বড় ছেলেটি কোনোরকমে ম্যাট্রিক পাস করেছে, রোজ-ছ'সের আটা-চালের বোঝা কিছুটা লাঘব করার দায় তাকে নিতে হবে। অনেক চেষ্টাচরিত্রের ফলে ডাকঘরে পোষ্টম্যানের কাজ জুটল তার, তা-ও কেবল সীজনের সময়টুকুর জন্যে।

মহার্ঘ ভাতা সহ মাস্টারমশাইয়ের বেতন আজকাল পঁয়ষট্টি টাকা, যা প্রথম মহাযুদ্ধের আগেকার ষোলো টাকা এবং মাস্টারমশাইয়ের জন্মের সময়ের চার টাকার সমান। এই সামান্য টাকায় এগারোটি প্রাণীর কি করে ভরণ-পোষণ চলে, এই স্তরের পাঠক-পাঠিকা যাঁরা কেবল তাঁরাই হয়ত, সেটা বলতে পারেন। মাস্টার মশাইয়ের বয়স এখন চুয়াল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ, কিন্তু তাঁকে দেখে ষাট বছরের বৃদ্ধ বলে মনে হয়। কার দিকে যে চেয়ে থাকেন, চোখ দেখে সেটা বোঝা যায় না, চেহারাটা এমন, যেন সব সময় ম্যালেরিয়ায় ভুগছেন। কারোর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতের সময় হাত জোড় করে মুখে হাসি টেনে আনার চেষ্টা করেন। সবচেয়ে বেশি ঝক্কি সামলাতে হয় তাঁর স্ত্রীকে। ন'টি সন্তানের মা হলেও এবং এত দুঃখ-কষ্টের মধ্যে কাটানো সত্ত্বেও তার মুখে সব সময় স্বাভাবিক হাসিটুকু লেগেই থাকে, তার কারণ; তাঁর দেহের রূপ-লাবণ্যে এখনও ভাটা পড়েনি। কিন্তু দারিদ্র্য এবং দুশ্চিন্তার আগুন জ্বলছে তাঁর মনের মধ্যে, তা সত্ত্বেও তাঁর ঠোঁটের ডগায় সেই মৃদু হাসিটুকু আসে কোত্থেকে?

কাঠের সাহেব

মধুপুরী সাহেবদের শহর। আগে এই পাহাড়ে গভীর জঙ্গল ছিল। দু-তিন হাজার ফুট নীচে ছিল দু-চারখানা পাহাড়ী গ্রাম। সেখানকার লোকেরা বর্ষাকালে পশু-চারণের জন্যে আঁকা-বাঁকা এবং উঁচু হয়ে যাওয়া এই পর্বতশ্রেণীর ওপর চলে আসত। কোনো পরিকল্পনা মতো শহরের পত্তন হয়নি। নেপালের হাত থেকে মধ্য ও পশ্চিম হিমালয়কে হস্তগত করার পর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এ অঞ্চলটির কোনো গুরুত্ব আছে বলে মনে করত না। অথচ কোম্পানীর স্থানীয় অফিসাররা জানত যে এখানে খুব কাছেই ইংলণ্ডের মতো ঠাণ্ডা জায়গা রয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে দু-একজন সাহেব প্রথমে নিজেদের থাকার জন্যে এখানে কাঠের ঘর তৈরি করেছিল, লু থেকে বাঁচার জন্যে গ্রীষ্মকালে তারা এখানে চলে আসত। সেটা ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের কথা। দেখাদেখি অন্য সাহেবরাও এর গুরুত্ব উপলব্ধি করল, উপযুক্ত জায়গা দেখে তারাও এখানে-ওখানে থাকার ব্যবস্থা করে নিতে লাগল। দশ বছর কাটতে না-কাটতেই নিজেদের কর্তব্য সম্বন্ধে কোম্পানীর কর্তৃপক্ষদের টনক নড়ল, তারা সুপরিকল্পিতভাবে শৈলাবাসটির উন্নয়নের কথা ভাবতে শুরু করল। কোম্পানীর পক্ষ থেকে একজন অফিসার নিযুক্ত করা হলো এখানে। শহর বেড়ে চলার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কর্তৃত্বও বেড়ে চলল। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহে দাক্ষিণাত্য এবং দেশীয় রাজ্যগুলো বাদ দিলে হিমালয়ই ছিল ইংরেজদের কাছে একমাত্র নিরাপদ স্থান। এরপর কোম্পানীর বদলে ইংলণ্ডের রাণীর নামে শাসনব্যবস্থা শুরু হয়। কিন্তু ব্যবস্থাপনা আগের মতোই রইল। তবে হ্যাঁ, অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংরেজরা নিজেদের দেবপুত্র বলে ভাবত না; ধনী তথা সামন্ত ভারতীয়দের সঙ্গে আচার-ব্যবহার করত নিজেদের সমকক্ষ মনে করেই। কিন্তু এখন তারা নিজেদের সাক্ষাৎ স্বর্গ থেকে অবতীর্ণ বলে মনে করতে লাগল। সেজন্যে কালা আদমীদের দেখলেই তাদের ভুরু কোঁচকাত, হোমরা-চোমরা ভারতীয়কেও এমন চোখে দেখত যেন তারা তুচ্ছাতিতুচ্ছ, তাদের দিকে সোজাসুজি চোখ তুলে তাকালে গাঁট্টা না খেয়ে কারোর নিস্তার ছিল না।

কোম্পানীর কর্মচারী ইংরেজ আমলারা স্ব-স্ব ক্ষেত্রে রাজা-বাদশার চেয়ে নিজেদের কম মনে করত না। দেশী লোকদের তারা গাঁট্টা মেরে মেরে শেখালো সাহেবদের সঙ্গে কিরকম ব্যবহার করা উচিত। ভারতে থেকেও তারা জলে

পদ্মফুলের মতো নির্লিপ্ত থাকত। দেশী লোকদের সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক ছিল না। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতীয় খাবারে তাদের আগ্রহ ছিল যথেষ্ট, অথচ এখন তাদের সব সময় চেষ্টা বিলিতি জিনিসপত্র ব্যবহার করার দিকেই। তারপর আরও কিছুদিন কাটল। এবার ভারত-শাসনের জন্যে সর্বত্র আই. সি. এস.-এর লৌহ-কাঠামো ছড়িয়ে দেওয়া হলো। এই কাঠামোরই কয়েকটি তরুণ এলো মধুপুরীতে শাসনকর্তা হয়ে। উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদ কাটতে না কাটতেই মধুপুরী কম-বেশি বর্তমান মধুপুরীর চেহারা নিলো। সীজনের সময় প্রচুর লোক হতো, অন্য সময়েও কিছু লোক থাকত এখানে। পাহাড়ের বহু গ্রামও মধুপুরীর সাহেবদের শাসনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মামলা-মোকদ্দমা দেখার জন্যে এবং অন্যান্য কাজেও এইসব তরুণদের নিযুক্ত করা হলো। প্রতিদিন কাজ না থাকায় তারা সপ্তাহে একদিন কোর্ট-কাছারি করতে আসত।

প্রথম দিকে যেমন-তেমন ইংরেজকেও অফিসার করে পাঠিয়ে দেওয়া হতো। তারপর, ভারতীয়দের মধ্যেও যখন এক-আধটু নবচেতনার সঞ্চার হতে লাগল, কেউ কেউ ইংরেজি সাহিত্য পড়তে শুরু করল, তখন তারা বুঝল যে ইংরেজরাও আমাদেরই মতো মানুষ। এই অবস্থায় অযোগ্য ইংরেজ শাসককে দেখে শাসকদের প্রতি অসম্মানসূচক মনোভাব গড়ে ওঠাই স্বাভাবিক। সেজন্যে বেছে বেছে বহু মেধাবী তরুণকে ইংলণ্ড থেকে ভারতে পাঠানো শুরু হলো —আই. সি. এস. হয়ে আসা-তরুণরা ইংলণ্ডের সাধারণ তরুণ ছিলেন না। ভারতে পাঠানোর আগেই তাঁদের শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনার সমস্ত কায়দা-কানুন শেখানো হতো। সাতান্ন সালটাকে ভালোভাবে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্যে সত্যি-মিথ্যে এমন অনেক জায়গার কথা বলে দেওয়া হতো, যেখানে ইংরেজ নরনারীকে না-কি অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়েছে। অন্যান্যদের মতো ইংরেজদের মনেও ভালো মন্দ বোধ আছে। তাঁরা যাতে আবার মানবতার পাঠ গ্রহণ করে না বসেন, সেজন্যে বড় সাহেব ছোট সাহেবদের দেশীয় লোকজনের সংস্রব থেকে পৃথক হয়ে থাকার শিক্ষায় সুশিক্ষিত করে তুলতেন। সে যাই হোক, এই সাহেবদের দুটি বড় গুণ ছিল : কাজ করার এবং কাজ আদায় করে নেওয়ার ক্ষমতা ; আর সময়ানুবর্তিতা— সেটা তো তাঁদের রক্তের সঙ্গেই মিশ্রিত। দশটায় কাছারি শুরু এবং চারটেয় বন্ধ হওয়া উচিত, মাঝখানে একটার সময় সাহেব বাহাদুরের লাঞ্চের জন্যে আধ ঘণ্টা ছুটি। কাজের জন্যে তাঁরা প্রতিদিন সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা কোর্ট-কাছারিতে কাটাতেন।

মধুপুরীর বড় সাহেব হওয়া অত্যন্ত সৌভাগ্যের ব্যাপার ছিল। ভারতে থেকেও তিনি ইংলণ্ডের পরিবেশ লাভ করতেন, যাদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে থাকতেন, তাদের অধিকাংশই নিজের দেশের লোকজন। জেলাগুলিতে কোথাও দুটি কোথাও বা তিনটি ইংরেজ থাকত, তাতে কি আর আসর জমানো সম্ভব ছিল? অথচ হাজার হাজার শ্বেতাঙ্গ নরনারীতে বছরে তিন মাস মধুপুরী গমগম করত।

লণ্ডনের মতো এখানেও তাদের ক্লাব নাচ-গানে মুখরিত হতো। অত্যাবশ্যকীয় এবং বিলাস-দ্রব্যের সমস্ত কিছুই এখানে মজুত। তখনও মধুপুরী পর্যন্ত মোটর গাড়ি আসত না, বড় সাহেব নীচের শহর থেকে ঘোড়ায় চড়ে সকাল আটটার আগেই এখানে এসে উপস্থিত হতেন। শুভাকাঙ্ক্ষীদের কারোর কারোর সঙ্গে দেখা করতেন, নতুন নতুন বন্ধু তৈরি করতেন। যদি তিনি অবিবাহিত যুবক হতেন, তাহলে ভারতে বসবাসকারী তাঁর স্তরের সাহেবদের তরুণী মেয়েরা জয়মাল্য হাতে নিয়ে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করত। নীচের শহরগুলিতে সাহেবরা তাঁদের চারপাশে কঠোর বিধি-নিষেধের বেড়া তৈরি করে নিতেন, চলা-ফেরা খাওয়া-পরা মেলা-মেশা সবকিছুই স্বল্পপরিসরের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত, কিন্তু মধুপুরীতে এলেই সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করতেন। তাঁদের এই বন্ধন-মুক্ত আসল চেহারা কালা আদমীরা যাতে দেখতে না পায়, সেজন্যে তাদের ডেরাগুলোতে বেয়ারা-খানসামা ছাড়া অন্য ভারতীয়দের আনাগোনা নিষিদ্ধ ছিল। অপমান সবচেয়ে ঘৃণ্য বস্তু, কিন্তু বংশানুক্রমে মানুষ যখন তাতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে, তখন তাদের কাছে সেটা স্বাভাবিক বলেই মনে হয় —অপমান যে করে এবং অপমান যে সহ্য করে, উভয়ের কাছেই।

ইংরেজরা গুরুত্বপূর্ণ পদগুলিতে তাদের মধ্যবিত্তশ্রেণীর সুশিক্ষিত তরুণদেরই কেবল নিয়োগ করত। সাতান্ন সালের মতো দেশী পল্টন যাতে বিদ্রোহী হয়ে না ওঠে, সেজন্যে তাদের অধিক মাত্রায় শ্বেতাঙ্গ সৈনিক রাখতে হতো। স্বভাবের দিক দিয়ে খুব উচ্ছৃঙ্খল ছিল তারা। নীচের ছাউনিতে তাদের আটকে রাখতে হতো। মধুপুরীতে এলে তারা খানিকটা স্বাধীনতা পেত, ভারতবাসীদের সঙ্গে তারা সেই স্বাধীনতার কিরকম অপব্যবহার করত, সেটা এই গতকালকের ঘটনা বলে অনেকেরই তা স্মরণ আছে। তাদের ডেরাগুলোর আশপাশে যারা থাকত, তারা বাড়ির মেয়েদের খুব সাবধানে রাখা সত্ত্বেও সব সময় ভয়ে ভয়ে থাকতে হতো তাদের, কারণ আইন-প্রণয়নকারীদের ওপর ইংরেজদের আইন প্রযুক্ত হতো না। মধুপুরীর এই রকমই অবস্থা ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত, ইংরেজদের কাছে এটা ছিল স্বর্গপুরী আর ভারতবাসীদের কাছে অপমানপুরী। তবে হ্যাঁ, অনেক ব্যবসায়ী আর ঠিকেদার এই অপমান বরদাস্ত করতেও রাজী ছিল, স্বর্ণবৃষ্টিতে আঁজলা ভরে নিতে পিছিয়ে রইল না তারা। তাছাড়া হাজার হাজার কুলি-মজুর চাকর-বাকরের কাছে মধুপুরী তো কল্পবৃক্ষ হয়ে উঠল।

দুই

বড় বড় যুদ্ধ-বিগ্রহ পৃথিবীতে প্রায়ই বড় বড় রদ-বদল ঘটায়। অবশ্য পূর্বকালে বিশ্বযুদ্ধ হয়নি। প্রথম আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুধু একটি দেশে নয়, সারা

পৃথিবীতে নতুন যুগের সূচনা করল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর মোটর-পরিবহণ ব্যবস্থার দ্রুত প্রসার হলো। ইংরেজদের কাছে ইংলণ্ড আর পৃথিবীর প্রত্যন্ত দেশ রইল না। সমস্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা সহ সুসজ্জিত বড় বড় জাহাজ এক এক মাসের মধ্যে তাদের যথেষ্ট আরামে ইংলণ্ড পৌঁছে দিত। যখন ইংলণ্ড ছ' মাসের পথ ছিল, আর সে-পথও ছিল খুব বিপদসঙ্কুল, তখন ইংরেজরা তাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা-দীক্ষার জন্যে হিমালয়ের শৈলাবাসগুলিতে বিশেষ বিশেষ স্কুল খুলেছিল। এবার থেকে এখানেই ছেলেমেয়েদের রাখার ক্ষেত্রে বাধ্য-বাধকতা রইল না। বড় ছুটি কাটাবার জন্যে তারা বেতন ও ভ্রমণ-ভাতা সহ ইংলণ্ড যাওয়ার ছুটি পেত, শৈলাবাসগুলিতে অবশ্যই তার প্রভাব পড়ত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যেমন শস্যাদি টাকায় চার সের থেকে কমিয়ে একেবারে হঠাৎ দু'সের করে দিলো, তেমনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধও জিনিসপত্রের দাম দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিয়ে সবকিছু দুর্লভ করে তুলেছিল। যুদ্ধের দরুণ জিনিসপত্রের দাম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই অনুপাতে ভারতে কর্মরত ইংরেজ কর্মচারীদের বেতনও বাড়ানো হয়েছিল, তথাপি চেঁচামেচি শুরু করে দিলো তারা। তাতে ইংলণ্ডের শাসক-মহলেও আশঙ্কা দেখা দিলো যে হয়ত তাদের পক্ষে পর্যাপ্ত কর্মচারী পাওয়াই কঠিন হয়ে উঠবে। মেধাবী ইংরেজ তরুণরা আর আগের মতো বেশি সংখ্যায় আই. সি. এস. পরীক্ষায় বসছিল না, এতেও তাদের ভাবনা দেখা দিলো। সেজন্যে ভারত-মন্ত্রী লী সাহেবের নেতৃত্বে একটি কমিশন বসালেন। অন্ধের মিষ্টান্ন বিতরণের মতো ব্যাপার দাঁড়ালো। লী-কমিশনের কাজ লী-লুণ্ঠনে পরিণত হলো। পূর্বেই পৃথিবীর সমস্ত দেশের চেয়ে বেশি মাইনে পেতেন যেসব আই. সি. এস. আমলা এবং সামরিক অফিসাররা তাঁদের বেতন আরও অনেক বাড়িয়ে দেওয়া হলো। লী-লুণ্ঠনে কেবল ইংরেজ কর্মচারীদেরই উপকার হলো না, তৎকালে ভারতীয়রাও যথেষ্ট পরিমাণে আই. সি. এস. এবং সামরিক অফিসার হচ্ছিলেন, লী-লুণ্ঠনে উপকৃত হওয়ার সুযোগ পেলেন তাঁরাও।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এসে মধুপুরীকে শেষবারের মতো সুখ-সমৃদ্ধ করে তুলল। অথচ যুদ্ধ শেষ হতে না হতেই ইংরেজদের করুণ দৃষ্টিতে ভারত ও তাদের প্রতিষ্ঠিত শৈলাবাসগুলিকে চেয়ে দেখতে দেখতে এ-দেশ ছেড়ে চলে যেতে হলো। লৌহ-কাঠামোগুলিকে সরিয়ে ফেললে শাসন-ব্যবস্থার ইমারতটি ভেঙে পড়ার আশঙ্কা ছিল। অন্তত শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের স্থান দখল করেছিলেন যেসব কৃষ্ণাঙ্গ প্রভুরা, তাঁদের তাই ধারণা। সাতচল্লিশ সালের আগস্টের আগে পর্যন্ত বড় বড় কাজের দায়িত্ব ইংরেজরা নিজেদের হাতে রেখেছিল, ভারতীয় আই. সি. এস.-এর সংখ্যা যদিও যথেষ্ট, তবু বহু ক্ষেত্রেই তাঁদের 'প্রবেশ নিষেধ' ছিল। অকস্মাৎ হাজারে হাজারে শূন্য হয়ে যাওয়া এই পদগুলি পূর্ণ করা দরকার হয়ে পড়ল। যখন ইংরেজদের শাসন ছিল, তখন আমাদের দেশভক্তরা তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করতে করতে বলতেন,

'ভারত পৃথিবীর সবচেয়ে গরিব দেশ, এখানকার প্রজাদের কষ্টার্জিত উপার্জনে এত দামী দামী কর্মচারী পোষা সরাসরি অন্যায় এবং অত্যাচার।' এবার তাঁরা সেই সুযোগ পেলেন তাঁদের বক্তব্যকে কাজে রূপায়িত করার। ইচ্ছে করলে করতেও পারতেন। কিন্তু আগস্ট (১৯৪৭ খ্রীঃ)-লুণ্ঠন লী-লুণ্ঠনকেও হার মানিয়ে দিলো। তিন-তিন শো টাকা করে মাইনে পাওয়া লোক একেবারে দেড় হাজার দু'হাজার টাকার পদে উঠে গেলেন। সন্ধ্যেবেলাকার ডেপুটি সাহেব সকালে কালেক্টর সাহেব হয়ে গেলেন। অবশ্য এই লুণ্ঠনে কেউ কেউ হতভাগ্য হয়েও পড়ে রইলেন, যাঁরা নতুন প্রভুদের কোনো ভাই-ভাইপো-ভাগ্নে নন, বন্ধু নন, কিংবা দেখতে-শুনতে পুরনো সাহেব-সুবোদের মতো নন। এখানে কাজ নয়, স্রেফ চামচেবাজি। যোগ্যতা অযোগ্যতাকে কিছুদিনের জন্যে শিকেয় তুলে রাখা হলো। আগস্টে যে লুণ্ঠন শুরু হলো, তা শুধু ইংরেজদের শূন্য স্থান পূর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয়ে গেলো না। এখনও কতজন ছোটাছুটি করছেন। যোগ্যতা ছাড়াও, দিল্লীর মহাপ্রভুদের কথায়, 'আরও কিছু গুণ' রয়েছে তাঁদের মধ্যে। গুণগ্রাহী হবেন না, তা কি হতে পারে! আমাদের মহাপ্রভুরা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয়েরই দোষ-ত্রুটিগুলির কদর করতে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। ইংরেজ জাত-লাটসাহেবরাও তাঁদের মতো দরবার বসাতে পারতেন না। এখন জেলার অফিসার ও নেতা থেকে শুরু করে দেশের দূর দূর প্রান্ত, এমনকি দিল্লী পর্যন্ত, সব জায়গার দেবতাদেরই পঞ্চোপচারে পূজো শুরু হয়েছে, আরতি চলছে। যোগ্যতার অতিরিক্ত আরও যে-গুণটি অত্যাবশ্যক, লোকে সেটাও শিখতে লাগল। কেবল আগস্ট-লুণ্ঠনের সাহেবরাই নন, আগেকার আমলের আই. সি. এস.-রাও দেখলেন, যদি উন্নতি করতে হয়, তাহলে ঐ 'কিছু গুণ' শিখে নেওয়াটা খুবই দরকার। এখন তাঁরা টুপি খুলে সেলাম জানানোর বদলে খাটে শুয়ে থাকা কিংবা আরাম-কেদারায় বসে থাকা মন্ত্রী-মহামন্ত্রীদের পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে লেগে গেলেন। ভারতীয় শিষ্টাচার তাঁরা ভুলে গিয়েছিলেন, কিন্তু সকালের ভুলে যাওয়া জিনিস সন্ধ্যেয় যদি ঘরে আসে, তাহলে সেটাকে আর ভুলে যাওয়া বলা উচিত নয়। অফিসারদের এখন সরকারী কাজকর্মের চেয়েও দেবতাদের পুজো-অর্চনা তোষামোদ ইত্যাদি বেশি জরুরী হয়ে পড়ল। নিজেদের কাজ ফেলে পরম কর্তব্য পালন করার জন্যে যদি তাঁরা দেশের দূর দূর প্রান্তে কিংবা রাজধানীতে ছুটে বেড়ান, তাহলে তার খোঁজ-খবর করার কেউ নেই। সব রকম শাস্তিকে ব্যর্থ করে দেওয়ার হাতিয়ার তৈরি হয়ে গেছে, সরকারী কায়দা-কানুনে যথেষ্ট ফাঁক-ফোকর রয়েছে। আগস্ট-লুণ্ঠনকে যথেষ্ট না ভেবে তার পরিসর আরও বৃদ্ধি করা হয়েছে। যে-জেলায় আগে মোটা মাইনের চার পাঁচজন গেজেটেড অফিসারে কাজ চলে যেত, সেখানে এখন তাঁদের সংখ্যা তিন গুণ। যদি সেই অনুপাতে নীচের কর্মচারীর সংখ্যা বাড়ানো না হয়, তাহলে নতুন সাহেবদের সই করার জন্যে কাগজপত্র আসবে কোত্থেকে? সেজন্য ক্লার্কের সংখ্যা

পাঁচ গুণ করে দেওয়া হলো। এ-কাজ অন্ধকারে হয়নি, স্বয়ং দিল্লীর মহাদেবই সেখান থেকেই তা শুরু করে দিলেন। সবচেয়ে মোটা মাইনে পাওয়া ন' জন সেক্রেটারী দিয়েই অখণ্ড ভারতে ব্রিটিশ-শাসন বেশ ভালোভাবেই চলত, নতুন মহাপ্রভু তাঁদের সংখ্যা বাইশ করে দিলেন। আগেকার নেতাদের হাতে দেশের শাসন-ভার আসতে না আসতেই পৃথিবীর সবচেয়ে গরিব দেশ চোখের পলকে সবচেয়ে ধনী দেশ হয়ে গেলো, লোকের ঘরে ঘরে চঞ্চলা লক্ষ্মীকে লুটপাট করানো হতে লাগল দু'হাতে, আর সেটাও এমনভাবে, যাতে তা শেষ পর্যন্ত নিজেদের হাতেই এসে পড়ে।

তিন

মধুপুরীতেও এই রদ-বদলের প্রভাব পড়ল। পুরনো বড় সাহেবের জায়গায় নতুন বড় সাহেব এলেন, গায়ের রঙে অবশ্য যথেষ্ট তফাৎ, কিন্তু মাইনেতে কোনো তফাৎ নেই, যোগ্যতায় ঘাটতি রয়েছে ঠিকই; কিন্তু দাপটে নেই। তিনিও পুরনো সাহেবদের মতোই লোকজন থেকে দূরে থাকাটা পছন্দ করেন। গায়ের চামড়া দেখে ভুলবশত যদি কেউ তাঁর কাছে যাওয়ার চেষ্টা করে, তাহলে তাঁর চোখ থেকে এমন প্রচণ্ড বিদ্যুতের কারেন্ট বেরিয়ে আসে যে কাছে পৌছনোর আগেই চোখ ধাঁধিয়ে গিয়ে তার আছাড় খাওয়ার দশা হয়। যদি চোখের দিকে সে না তাকায়, তাহলে কর্কশ মুখের দু-চারটি কথা তাকে শুনতেই হবে। নিজেদের দাপট অক্ষুণ্ণ রাখতে আজকালকার সাহেবরা তাঁদের আগেকার সাহেবদের চেয়ে অনেক বেশি কর্মঠ। ইংরেজ চলে গেছে, কিন্তু আমাদের সাহেবদের জানা আছে যে ইংরেজদের শাসন-পদ্ধতিই সবচেয়ে সেরা শাসন-পদ্ধতি। দিল্লীর দেবতারা গলা টিপে ধরতেই ইংরেজির বদলে হিন্দীকে মেনে নিলেন তাঁরা, কিন্তু পনেরো বছর পরে ওসব কথা ভাবা যাবে। ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দের আগে তাঁদের সামনে হিন্দীর নাম উচ্চারণ করাটা অমার্জনীয় অপরাধ। যখন হিন্দী চালু হবে, তখনও ইংরেজি সংখ্যা ভারতবর্ষে চলতেই থাকবে যতদিন না মহাপ্রলয় এসে এই পৃথিবীটাকে ধ্বংস করে দেয়। তাঁদের জনগণ ও হিন্দীর প্রতি ভালোবাসার উদাহরণ হচ্ছে, আগে যেসব দেশীয় রাজ্যে সরকারী ভাষা ছিল হিন্দী, সে-সব রাজ্য থেকেও হিন্দীকে হটিয়ে দেওয়া হয়েছে, প্রদেশ ও জেলার অফিসগুলো ইংরেজি টাইপিস্ট ও স্টেনোগ্রাফারে ভরতি করে দেওয়া হয়েছে। কে বলে যে শাসন জনগণের জন্যে নয়? আমলারা নিজেদের সুবিধের জন্যে হিন্দীর জায়গায় ইংরেজিকে প্রতিষ্ঠিত করছেন না; বরং তাঁরা চান, পৃথিবীর সবচেয়ে উন্নত এবং একমাত্র আন্তর্জাতিক ভাষাটিকে সমস্ত জনসাধারণকে একদিনে গুলে খাইয়ে দেওয়া হোক। মধুপুরীর নতুন সাহেবও হিন্দীর ব্যাপারে তাঁর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কথা

মানতে রাজী নন। তিনি জানেন, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী ওপর-ওপর হিন্দীর প্রতি অনুরাগ দেখান, আর কিছু না হোক, ভোটারদের হাতে রাখাটা তো খুবই দরকার। তিনি ভালো করেই জানেন, মুখ্যমন্ত্রী যদি হিন্দী চালু করতে চাইতেন, তাহলে তিনি প্রথমেই ইংরেজি টাইপরাইটারগুলোকে হটাতেন, ইংরেজি স্টেনো-গ্রাফারদের হিন্দী দ্রুতলিপি শিখতে বাধ্য করতেন, কর্মচারীদের হিন্দী শেখার মেয়াদ ক্রমাগত বাড়িয়ে যেতেন না।

মধুপুরীর সাহেব কিছু কিছু ব্যাপারে প্রকৃতপক্ষে রাজা। তাঁর ঠাট-বাটে এবং ফিটফাট থাকাতে আগেকার অফিসারদের খুব প্রভাব। তাঁর পরনে দামী ইংলিশ স্যুট, মাথায় সবচেয়ে ভালো ফেল্ট-হ্যাট। স্থূলদেহ নন বলে তাঁকে ছিপছিপে চেহারার যুবক বলে মনে হয়, অবশ্য রোজকার দাড়ি কামানোও তাতে কম সাহায্য করে না। হিন্দীতে কথা বলতে অসুবিধে হয়, আর ইংরেজি এমন গড়গড় করে বলেন যে মনে হয়, এ-দেশেই তাঁর জন্ম নয়। ঘরের কথা ফাঁস করার লোক চারদিকে, নইলে এটাও বলা যেতে পারত যে সাহেব বাহাদুর অক্সফোর্ডে তাঁর পড়াশোনা শেষ করেছেন, তাই সেখানকার অ্যাকসেন্টে অভ্যস্ত তিনি। এমন একজন পুরুষের কাছে কি করে আশা করা যেতে পারে যে তিনি তাঁর দপ্তরে হিন্দীকে আধ-বোজা চোখেও দেখতে পারবেন! যেমন হিন্দীর সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্ক নেই, তেমনি এ-দেশের সাধারণ মানুষের সঙ্গেও কোনো সম্পর্ক নেই। পূর্ববর্তী যেসব সাহেব এই পদ অলঙ্কৃত করেছেন, তিনি কেবল তাঁদেরই পুরোপুরি অনুসরণ করতে চান।

চার

মধুপুরী এখন আর সেই পুরনো শহর নয়, তবু এখানে শুধু ইংলণ্ডেরই নয়, অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশের দূতাবাসের স্ত্রী-পুরুষেরাও শ'য়ে শ'য়ে এখানে আসে। তাদের আসাতে মধুপুরী যে লাভবান হয়, সে-কথা উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। পর্যটকদের বেশি সংখ্যায় নিজেদের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্যে অন্যান্য দেশ বিজ্ঞাপনে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে ফেলে। এটা তো সাধারণ বুদ্ধিতেই বলে যে মধুপুরীর জন্যে অন্য ধরনের বড় সাহেব দরকার। এখানে আগে যে সাহেবটি ছিলেন, তিনি পুরনো বেশভূষার সেকেলে ধরনের লোক। মানুষের সঙ্গে দেখা করার সময় তাঁর খেয়ালই থাকত না যে কোন চেয়ারে বসে আছেন তিনি। এখানকার কোনো লোক তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট ছিল না। বিদেশী শ্বেতাঙ্গরাও তাঁর প্রশংসা করত। কিন্তু এমন লোককে মধুপুরীর শাসনকর্তা করে রাখা যায় কি করে? সেজন্য ওপরতলার মহাপ্রভুরা এখনকার মধুপুরীর একেবারে উপযুক্ত লোক পাঠিয়ে দিলেন। গায়ের রঙ বাদ দিলে সমস্ত ব্যাপারে তিনি আগেকার শ্বেতাঙ্গ সাহেবদের

ছাঁচে ঢালা। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারে বলতে এই নয় যে সমস্ত গুণেও। পূর্ববর্তী সাহেবরা সময় মেনে না চলাটাকে মহাপাপ বলে ভাবতেন। তাঁরা এই সময়ানুবর্তিতা এমন মেনে চলতেন যে, নিজেদের আরাম-আয়েশের সময় থেকেও ছেঁটে বাদ দিতে কুণ্ঠিত হতেন না। বর্তমান সাহেব বাহাদুর পূর্ববর্তী সাহেবদের মতোই সপ্তাহে একদিন মধুপুরী আসেন। অফিস শুরু হয় দশটা থেকে, লোকের কাছে যে সমন যায়, তাতে লেখা থাকে যে যথাসময়ে হাজির না হলে মোকদ্দমা একতরফাভাবে ফয়সালা করে দেওয়া হবে। কিন্তু তিনি স্বয়ং বারোটার আগে কদাচিৎ মধুপুরীতে এসে পৌঁছন। গাড়িতে চড়ে মধুপুরীতে আসার পরও সাহেব বাহাদুরের একটু সময় চাই নিজস্ব বিশ্রামাগারে একটু আরাম করে নেওয়ার জন্য। চাকরের মতো লালায়িত হয়ে থাকা লোকজন প্রায়ই তাঁর চাঁদ মুখ দেখা থেকে বঞ্চিত হয়। একটায় যদি তিনি এজলাসের চেয়ারে গিয়ে বসেন, তাহলে সেটা নিতান্তই ভাগ্যের ব্যাপার বলে ধরে নিন। লাঞ্চের সময় আবার কিছুক্ষণের জন্যে কাছারি বন্ধ রাখা হয়। দশটার আগেই যদি লোকেরা খাওয়া দাওয়া না সেরে নিয়ে থাকে, তাহলে তিন ঘণ্টা ধরে অপেক্ষা করতে করতে তাদের সেদিনকার খাওয়া-দাওয়াটাই ঘুচে যায়, কিন্তু তাই বলে সাহেব তাঁর পুরনো অভ্যেস ছাড়তে পারেন কি? লাঞ্চের পর বিকেল চারটে পর্যন্ত যে তাঁর চেয়ারে বসে থাকবেনই, সেটা এমন কিছু জরুরী নয়। তার আগেও তিনি উঠে যেতে পারেন। যে আইন-কানুন অন্যদের জন্যে তৈরি করা হয়েছে, মধুপুরীর সর্বশক্তিমান সাহেব বাহাদুর তা মানতে বাধ্য নন।

শুধু সময়ানুবর্তিতাতেই আমাদের সাহেব যে তাঁর পূর্ববর্তী শ্বেতাঙ্গ সাহেবদের সম্পূর্ণ বিপরীত, তা নয়, এমনকি কর্মক্ষমতাতেও পূর্ববর্তী সাহেবদের সঙ্গে তাঁর মিল নেই। এখনও পুরনো ক্লার্ক রয়েছে কিছু কিছু, সেজন্যে গাড়িটা কোনোরকমে চলছে, নইলে যে-কোনো সময় তা জলাভূমিতে আটকে যেতে পারত। আমাদের সাহেব কিন্তু একটি ব্যাপারে তিনি তাঁর জাতীয় মনোভাবের চরম নিদর্শন দেখান। কেউ কোনো কাজে তাঁর বাংলোয় এসে হাজির হলে, তা সে এ-দেশীয় কিংবা ইউরোপীয় যাই হোক না কেন, তিনি আগেকার সাহেবদের মতো আলাদা আলাদা চোখে দেখেন না, আর তাকে এটা বুঝতে বাধ্য করেন যে সে একজন শাসনকর্তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। কোনো শ্বেতাঙ্গ সাহেবের এজলাসে অন্য একজন শ্বেতাঙ্গ এলে তাকে বসার জন্যে চেয়ার দেওয়া হয়নি, এমন ঘটনা কখনও ঘটতে পারত না। অথচ আমাদের সাহেব তাদেরও সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য করেন, দিল্লীর দেবতারা যাদের আরতি করে, আর মনে মনে আশা পোষণ করে যে, যদি তারা প্রসন্ন হয়, তাহলে আমাদের দেশের ওপরেও ডলারের বৃষ্টি শুরু হবে।

তিনি কাঠের সাহেব নন কি?

কোনো আধুনিক কিংবা প্রাচীন শহরে সবচেয়ে নোংরা কাজকর্ম করার জন্যেও কিছু লোকের দরকার হয়। মা-ও নিজের শিশুদের পেচ্ছাব-পায়খানা সাফ করে, কিন্তু সেজন্য সে অস্পৃশ্য হয়ে যায় না। সব দেশেই শহর আছে, সেখানে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষ একত্রে বসবাস করে। যেসব দেশের মানুষ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ভালোবাসে, তারা তাদের গ্রামগুলিতেও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকে যথেষ্ট লক্ষ্য রাখে। কিন্তু ভারতের লোক —যারা শুদ্ধ-অশুদ্ধের বাছবিচারে পৃথিবীতে নিজেদের অদ্বিতীয় মনে করে —তারা তাদের গ্রামগুলিকে যতটা নোংরা করে রাখে, পৃথিবীর পশ্চাৎপদ অপেক্ষাও পশ্চাৎপদ দেশ এবং তার মানুষেরা অতোটা রাখে না। ভারতবাসীদের একটা ভালো সংজ্ঞা দেওয়া যেতে পারে— ভারতবাসী হলেন তাঁরাই, যাঁরা ব্যক্তিগত শুচিতার প্রতি অত্যন্ত মনোযোগী, কিন্তু সামাজিক স্বাস্থ্য ও শুচিতার নিয়ম-নীতির প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন। এখানে গ্রামের কাছাকাছি উন্মুক্ত মাঠ-ঘাটকে মলমূত্র ত্যাগের জন্যে সংরক্ষিত স্থান বলে মনে করা হয়। শহরে এ রকম আচরণ করলে মহামারী ডেকে নিয়ে আসা হবে, তাই সেখানে অনেক আগে থেকেই পায়খানা বা শৌচাগারের ব্যবস্থা রয়েছে। দু' হাজার বছর আগে আমাদের গ্রাম-শহরগুলি সম্ভবত এতটা নোংরা ছিল না, তখন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বহু নিয়মই পালন করা হতো। অন্যান্য দেশে লোকে সাফাই-কারীদের ঘৃণার চোখে দেখে না, যদিও সেখানেও তাদের মজুরি খুব একটা বেশি নয়। মানুষ মল-মূত্রাদি ত্যাগ করে নিজের হাতেই শৌচাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করে, দরকার হলে কাপড়-চোপড়ও বদলে নেয়, তখন তার সঙ্গে ওঠা-বসা খাওয়া দাওয়াতে কারোর আর দ্বিধা-সঙ্কোচ থাকতে পারে না। আমাদের এখানে যারা সাফাইয়ের সর্বাপেক্ষা নোংরা কাজটি করে তাদের সর্বাপেক্ষা নীচ বলে ভাবা হয়।

আজ থেকে সওয়া শ' বছর আগে জঙ্গলে মঙ্গল করার উদ্দেশ্যে মধুপুরীর পত্তন শুরু হয়, সে-সময় এখানে মলমূত্র সাফ করার জন্যে ঝাড়ুদারেরও দরকার পড়ে। আশপাশে প্রচুর জঙ্গল, আর জঙ্গল, মাঝে দূরে দূরে পাঁচ-দশখানা বাংলো। যদি বসবাসকারীরা ভারতীয় রীতিনীতি মেনে চলত, তাহলে ঐ জঙ্গলকেই মলমূত্র ত্যাগের স্থান হিসেবে ব্যবহার করতে পারত। তবে, ইংরেজরা

এতে অভ্যস্ত নয়। তাদের বাড়িতে শৌচাগারের দরকার, বাংলো থেকে দূরে নয়, ঐ বাথরুমেই (স্নানাগারেই), যেখানে মানুষ নাওয়া হাত-মুখ ধোওয়া ইত্যাদি সারে। যদি শৌচাগার ভালোভাবে পরিষ্কার না রাখা হয়, তাহলে শয়নকক্ষে থেকে দুর্গন্ধ সওয়া যায় না। বাড়িই হোক কিংবা শহরই হোক, শৌচাগার যত সন্নিকটে থাকে ততোই সুবিধেজনক, শুধু তাই নয়, অস্বস্তিকর অবস্থায় যথেষ্ট উপকারও পাওয়া যায়। ঠাণ্ডা জায়গায় লেপের তলা থেকে বেরিয়ে যদি বাইরে দূরবর্তী কোনো পায়খানায় যেতে হয়, তাহলে নিউমোনিয়া না হয়ে যায় না। মধুপুরীর বাংলোগুলোর জন্যে যেমন অন্যান্য ভৃত্য-পরিচারক এসেছে, তেমনি পায়খানা সাফ করার জন্যে ঝাড়ুদারেরাও এসেছে। নীচের শহরে তারা পাঁচ টাকা করে মাইনে পেত, এখানে বারো টাকা থেকে পনেরো টাকা পায়। যেখানেই রোজগার বেশি, সেখানেই মানুষ ছুটে গিয়ে হাজির হয়। এখানকার রিক্সাওয়ালা, মোট-বওয়া কুলি, দারোয়ান ইত্যাদি সমাজসেবীদের কাজকর্ম যেরকম বিশেষ বিশেষ জেলার একচেটিয়া, সেই রকম পায়খানা সাফ করার লোকজনও অধিকাংশই আসে বিজনৌর জেলা থেকে। মধুপুরীতে গোড়ার দিকে পায়খানা সাফ করার লোকজনকে কি বলা হতো? ভঙ্গী, হালালখোর, তাই নয় কি? কিন্তু আজকাল সবাই তাদের জমাদার বলে। যারা এই নামের সঙ্গে পরিচিত নয়, তাদের প্রথম প্রথম খটকা লাগে। বিজনৌর জেলার জমাদারেরা শুধু এখানকার এই শৈলাবাসগুলিতেই নয়, এমনকি কেদারনাথ ও বদ্রীনাথেও এই কাজটাকে নিজেদের হস্তগত করে নিয়েছে।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে শৈলাবাসগুলিতে এত সুযোগ-সুবিধে গড়ে ওঠেনি, আজকাল যেমন চোখে পড়ে। বাড়িতে বাড়িতে জলের কল ছিল না, ভিস্তিওয়ালারা নাওয়া-ধোওয়া ও খাওয়ার জল দিয়ে যেত। রাস্তায় রাস্তায় বিজলি বাতিও ছিল না। যখন প্রথম রাস্তা আলোকিত করার ব্যবস্থা চালু হলো, তখন তা কোথাও কোথাও কেরোসিন তেলের প্রদীপের সাহায্যে। জল থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয় অনেক পরে। সেই জলবিদ্যুতের সাহায্যে শুধু রাস্তাঘাট আর বাংলোগুলোই আলোকোজ্জ্বল হয়ে উঠল না, বিদ্যুতের সাহায্যে অনেক উঁচুতে রাখা জলাধারে জল তুলে নলের সাহায্যে তা সারা শহরে পৌঁছে দেওয়া হলো। কালিম্পঙের মতো পার্বত্য শহরগুলির বিশেষ বিশেষ অংশে তখনও পর্যন্ত কেউ বিনা ফ্লাশের বাংলো তৈরি করতে পারত না, অথচ মধুপুরীতে তার কোনো ব্যবস্থাই নেই। ফ্লাশের ব্যবস্থা জমাদারের মনঃপূত হবে না, সেটা স্বাভাবিক।

ভারতে বসবাসকারী ইংরেজরা জানত যে হিন্দু মুসলমান সকলেই জমাদারদের সব চেয়ে ছোট জাত বলে মনে করে, তারা তাদের সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকে। প্রথম প্রথম ভারতে আসা কিছু কিছু ইংরেজ তাদের দেশের লোকজনকে বোঝাত —উচ্চবর্ণের হিন্দুদের চাল-চলন আমাদের রপ্ত করা উচিত, যদি আমরা তাদের

মান্যগণ্য হতে চাই। দু-একজন ইংরেজ রান্নাবান্নার জন্য বামুন-ঠাকুর রাখত, পিঁড়িতে বসে খেতেও শুরু করেছিল। কিন্তু সেটা চলল না। ওদের সংস্কৃতির মান অনেক উঁচু, কারণ নতুন যুগের আবিষ্কার, অস্ত্রশস্ত্র, জ্ঞান-বিজ্ঞানে ওরা অনেক এগিয়ে। ওরা শীগ্‌গিরই বুঝতে পারল —ভারতীয়দের অনুকরণ করার দরকার নেই আমাদের, ভারতীয়রা নিজেরাই আমাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে। 'দেরী হয়েছে কিন্তু ঠিক হয়েছে'— কথা অনুসারে দেরী হয়েছে ঠিকই, কিন্তু পশ্চিমের বহু ব্যাপার-স্যাপারই আমাদের দেশের লোকেরা এখন মেনে নিয়েছে। যা এখনও তাদের কাছে অচ্ছুত হয়ে আছে, তা কেবল শিক্ষা এবং হাতে অঢেল টাকা-পয়সার অভাবের জন্যেই দেরী। ইংরেজরা শুধু অফিসার আর বণিকের বেশেই এখানে আসেনি, তাদের আসার অনেক আগেই ইউরোপ থেকে পাদরীরা খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করার উদ্দেশ্যে ভারতে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। ইংরেজ-শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর খ্রীষ্টধর্ম শাসক সম্প্রদায়ের ধর্ম হওয়ার ফলে পাদরীরা আর্থিক এবং আরও নানারকম সুযোগ-সুবিধে পেলেন। হিন্দু ধর্মের দুর্গ ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়ার জন্যে কামান বসানো হলো, কিন্তু ওদের রাজনৈতিক দুর্গের মতো সেটা ততো দুর্বল নয়। যদি কেউ নিজের ধর্ম ত্যাগ করে খ্রীষ্টান হতো ; তাহলে তাকে তার সবচেয়ে প্রিয় আপনজন —মা-বাপ, ভাই-বোন, মামা-ঠাকুর্দা —সকলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হতো চিরকালের মতো। এদের কাছ থেকেই তো অকৃত্রিম স্নেহ-ভালোবাসা পাওয়া যায়, আর্থিক লাভালাভের সম্পর্কও এদের সঙ্গে জড়িত। যদি কোনো জাত-গোষ্ঠীর সকলেই ধর্মান্তরিত হওয়ার জন্যে প্রস্তুত থাকে, তবেই এই বাধা-নিষেধ দূর হওয়া সম্ভব। মুসলিম শাসনের গোড়াতে এ রকম হয়েছিল, যেমন সে-সময় বস্ত্র-বয়নকারী বহু শিল্পী-সম্প্রদায় জোটবদ্ধভাবে হিন্দুধর্ম ত্যাগ করেছিল। পাদরীরা সেরকম সফলতা লাভ করতে পারেননি। বহু অস্পৃশ্য জাতির লোকজনকে তাঁরা নিজেদের দিকে টানতে শুরু করলেন এই বলে যে আমাদের কাছে সমস্ত মানুষ সমান, কারোর সঙ্গে ছুত-অচ্ছুতের প্রশ্ন নেই। তাঁরা নিজেদের বাড়িতে যে জমাদারদের রেখেছিলেন, তাদের হাতের রান্না-বান্না করা খাবার পর্যন্ত তাঁরা খেতে পারতেন। অন্যান্য ইংরেজরাও, যদিও পাদরীদের মতো অতোটা নয়, তবু অস্পৃশ্যের সঙ্গে মেলামেশাতে দ্বিধা-সংকোচ করে না। আজকাল যেহেতু বেশি চাকর-বাকর রাখা দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে, সেজন্যে বহু ইংরেজ অথবা অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান পরিবারে জমাদার-জমাদারনীরা পাচক-খানসামার কাজ করে। পৌনে এক শতাব্দী ধরে হিন্দুদের বড় নেতা বলে আসছেন যে অস্পৃশ্যতা আমাদের সমাজের কুষ্ঠব্যাধি, কিন্তু যে-গতিতে অস্পৃশ্যতা দূর করা হচ্ছে, তা দেখে তো মনে হয় ওটা দূর হতে কয়েক পুরুষ লেগে যাবে। অস্পৃশ্যতা দ্রুত দূরীভূত হতে পারে তখনই, যখন অস্পৃশ্য বলে পরিগণিত যারা, তারা নিজেদের উদ্ধার করার দায়িত্ব নিজেরাই গ্রহণ করবে।

দুই

চম্পো জমাদারের মেয়ে, ভারতের স্বাধীনতার পর তার জন্ম। তার মা-বাপ মধুপুরীর প্রধান বাজারের পাড়ায় থাকে। মালিকের সঙ্গে নয়, বরং বাড়ির সঙ্গেই জমাদারের বেশি সম্পর্ক। নতুন বাংলো তৈরি হতেই জমাদার রেখে দেওয়া হয়। এক শতাব্দীর মধ্যে বাংলোর মালিকানার যতই হাত বদল হোক না কেন, জমাদারেরা চার পুরুষ ধরে বাংলোর সঙ্গে সমানে আটকে থাকে। চম্পোর প্রপিতামহ-প্রপিতামহী সর্বপ্রথম যে বাংলোটায় এসেছিল, তার প্রথম মালিক ছিল কোনো এক ইংরেজ, কিন্তু সেটা প্রথম মহাযুদ্ধের আগেকার কথা। প্রত্যেক বাংলোর সঙ্গে কিছু ছোট ছোট কুঠরি বা আউট-হাউস থাকে। বাংলো যদি বাজার থেকে দূরে জঙ্গলের মধ্যে হয়, যেখানে জমি-জায়গা যথেষ্ট, তাহলে আউট-হাউস বাংলো থেকে দূরে, আর নয় তো কাছাকাছিই তৈরি করা হয়। বছরের পর বছর ধরে বাংলোগুলো ভাড়া না বসার ফলে আউট-হাউসের ছোট-বড় কুঠরিগুলি অধিকাংশই ফাঁকা রয়েছে, মেরামত না করার ফলে অনেকগুলি তো ভেঙেই পড়েছে। কিন্তু চম্পোর পরিবার যে বাংলোটায় থাকে, সেটার সে-দুর্ভাগ্য হয়নি, কারণ বাংলোটি বাজারের লাগোয়া। আগেকার কালে এই ঘরগুলো বাংলোর চাকর-বাকরদের থাকার জন্যে তৈরি করা হয়েছিল, এখন সেগুলোর কোনোটায় বিদ্যুৎ-চালিত আটার চাকি বসেছে, কোনোটায় চাল-ডালের দোকান কিংবা হোটেল খোলা হয়েছে, কোনোটায় আবার দোকানদার বাবুরা বাস করার জন্যে ভাড়ায় নিয়েছে। তেমন তেমন হলে উঁচু জাতের লোকেরা পাশের ঘরে জমাদার থাকার জন্যে আপত্তি করত, কিন্তু ওটা যে চম্পোর পরিবারের পৈতৃক ঘর। বরাবর ওখানেই থেকে আসছে ওরা।

ছেলেপিলেরা অনেক দেরীতে এবং অনেক কষ্টে বুঝতে পারে যে অস্পৃশ্যতা কি বালাই। শিশুরা জাত-অজাত ছুত-অচ্ছুত যাই হোক না কেন, পরিবার যদি খুব বড়লোক না হয়, তাহলে তাদের মধ্যে ছুতমার্গতা সহজে স্পর্শ করে না। শিশুর মনোভাব এবং তার জিদের দিকে লক্ষ্য রেখে ছেলেপিলেদের একসঙ্গে খেলাধুলো করতে দেওয়া হয়। যতক্ষণ না তারা নিজেরাই ছোঁয়াছুঁয়ির ব্যাপারটা বুঝতে পারে, ততোক্ষণ তাদের বুঝিয়ে কিংবা ধমক দিয়ে ঐ রকম খেলাধুলো থেকে আটকানো মুশকিল। চম্পোর পরিবার যে-বাংলোয় জমাদারের কাজ করে, তার মালিকের মেয়েটিও চম্পোরই বয়সী। দু'জনে ছোটবেলা থেকেই খেলাধুলো করে আসছে। চম্পোর বন্ধুটি তার মা-র কাছ থেকে কোনো খাবার জিনিস পেলে সেটা চম্পোকে না দিয়ে খাবে, এটা কখনও হতে পারে না। একদিন চম্পোর বন্ধুর মা দু'জনকে পরস্পরের এঁটো রুটি খেতে দেখেছিলেন।

খুব খারাপ লেগেছিল তাঁর। তিনি আধুনিক মতবাদে শিক্ষিতা মহিলা। ছুত অচ্ছুত তিনি ঐটুকুই মানেন, যেটুকু বংশানুক্রমে তাঁর রক্তে এখনও মিশে আছে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে জমাদার যদি রান্না করে দেয়, তা খেতেও আপত্তি নেই তাঁর। উঁচু জাতের লোকেরা গায়ে অচ্ছুতের ছোঁয়া লাগাটাও পছন্দ করে না, বরং তাদের কোনো জিনিসে অচ্ছুতের হাতের স্পর্শ লাগলে সেটাকে তারা ভ্রষ্ট হয়েছে বলেই মনে করে। চম্পোর বন্ধুর সুশিক্ষিতা মা জমাদারনীকে দিয়েই তাঁর সমস্ত কাজকর্ম করান। অবশ্য তাকে দিয়ে রান্না করাননি কখনও। তাতেও আপত্তি নেই তাঁর, তবে একটাই শর্ত, চম্পোদের বাড়ির লোকজনকে তাদের বংশানুক্রমিক পেশা ছাড়তে হবে, অর্থাৎ না খেয়ে মরতে হবে তাদের।

চম্পোর পাঁচ বছরের বন্ধুটির মনে তাদের বংশের বহু সংস্কারেরই ছায়া পড়েনি। দু'জনে বাইরে বসে বসে পুতুল খেলে, গান গায়, লাফায়-ঝাঁপায়। বন্ধুটি চম্পোকে নিয়ে তাদের সোফায় বসেও কত খেলে। সে-সময় বাড়ির বড়রা ভুরু কোঁচকায়, কিন্তু যেহেতু দুই বন্ধুই নিতান্ত সরলমনা তাই সেদিকে তারা ভ্রূক্ষেপও করে না। দু'জনেই শিশু, নিজেদের মধ্যে যখন বেশ ভাব থাকে, তখন তারা দুটি দেহ একপ্রাণ হয়ে যায়। আবার কোনো কারণে ঝগড়া হয়ে গেলে বন্ধুটি বলে বসে, 'যা যা, চম্পো, তোর সঙ্গে আর কক্ষণো খেলব না।' উপার্জনের নতুন পথ সবাই চায়, আর যার রোজগার কম, সে তো বাধ্য হয়ে নতুন পথ খুঁজে বেড়ায়। চম্পোর মা দু-তিনটি মুরগি পুষেছে। চম্পো দেখাশোনা করার উপযুক্ত হয়ে উঠেছে দেখে ওর বাপ একটা ছাগলও কিনে নিয়ে এলো। কিছুদিন পরে দুটো বাচ্চা হলো তার। ছাগলটা মোটেই ভালো জাতের নয়, কিন্তু পাঁঠা ভালো ছিলো বলে বাচ্চা দুটো বেশ বড়-সড়, কান দুটোও ঢলঢলে। এখানকার বাংলোয় ফাঁকা জায়গা খুবই কম। একদিকে প্রায় খাড়া পাহাড়, তার ফলে সেখানে কোনো ঘরবাড়ি তৈরি করাও সম্ভব হয়নি, শাক-সব্জীর চাষও করা যায়নি। খাড়া চড়াই জায়গা ছাগল-ভেড়ার খুব প্রিয়, ছাগলছানাগুলো তো সেখানে লাফালাফি করে বেড়াতে দারুণ মজা পায়। চম্পো বাংলোর কাছাকাছি ঐ ফাঁকা জায়গাটুকুতে ছাগলগুলো চরাতে নিয়ে যায়। চম্পোর বন্ধুটি অর্থাৎ মনিবানীর মেয়ে তার বিরক্তিটা খুব বেশি দিন মনে রাখতে পারে না। দু-একদিন পরেই যখন সে দেখে, ছাগলগুলো পাশে চরে বেড়াচ্ছে আর চম্পো রাস্তায় বসে বসে তা লক্ষ্য করছে, তখন সে 'চম্পো —চম্পো' বলে ডাকতে ডাকতে তার কাছে গিয়ে হাজির হয়। চম্পো ছাগলছানাগুলোকে কাছে ডেকে নেয়, তারপর দু'জনে তাদের কোলে নিয়ে খেলতে শুরু করে। বর্ষায় ঘাস আর সবুজ পাতা গজায় খুব। তখন দু'জনে তা ছিঁড়ে-ছিঁড়ে ওদের খাওয়ায়। চম্পো কি আর জানে যে ছাগলটি আর তার ছানাগুলোর আসল মালিক কে! সে তার বন্ধুকে বলে, 'একটা আমার আর আর একটা তোমার।' তখন বন্ধুটি বলে, 'তোরটার দুটো বাচ্চা হবে, আমারটারও

দুটো বাচ্চা হবে। আমরা এমনি করে চরাব।' ওদের পাড়ার কোনো বড় ছেলে যদি বলে বসে, 'চম্পোর বাপ তিরিশ টাকা দিয়ে ছাগল কিনেছে। সে এমনি এমনি বাচ্চাগুলো দিয়ে দেবে না-কি!' তাহলে বন্ধুটি জবাব দেয়, 'আমার মা-রও অনেক টাকা আছে।' চম্পোও বলে ওঠে, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, মনিবানীর অনেক টাকা আছে।' দু'জনে হাত তুলে দেখায়, 'এত্তো এত্তো টাকা!'

দুটি মেয়েই যখন একদিকে, তখন চুপ করে যাওয়া ছাড়া ছেলেটির আর কোনো গত্যন্তর থাকে না। নিজেরা জিতে যাওয়াতে খুশি হয়ে দু'জনেই খিলখিল করে হেসে ওঠে। পাহাড়ী জায়গা এমনিতেই অসমান, এই বাংলোটার কাছে তো পাথর আর পাহাড় একেবারে খাড়া। সেখানে ছেলেপিলের আছাড় খেয়ে চোট লাগাটা আশ্চর্য কিছু নয়। দুই বন্ধুর কতবার হাঁটু ছড়ে গেছে, হাড়-গোড় যে ভাঙেনি, সেটা নিতান্তই দৈবক্রমে। একবার একটা ছাগলছানা খাড়া পাথরের ওপর উঠে পড়েছিল। অমনি দুই বন্ধু একটা খেলা পেয়ে গেলো। যেদিকে রাস্তা, সেদিকটা ঘরে ওরা এগিয়ে যেতে যেতে ছাগলছানাটাকে ভয় দেখাতে লাগল। ওরা দেখতে চায়, ছাগলছানাটা কি করে। তাতে ছাগলছানাটা ভয় পেয়ে আর একদিকে লাফ দিতে বাধ্য হলো, অমনি পনেরো হাত নিচে পড়ে গিয়ে একটা ঠ্যাঙ ভাঙলো তার। চম্পোর এ রকম খেলা তার মা-বাপের আদৌ পছন্দ নয়। ওরা আশা করছে, ছ' মাসে ছাগলছানা দুটোকে বড় করে এক-একটাকে চল্লিশ টাকায় বিক্রী করে দেবে তাতে ছাগলটার দাম উঠে আসবে, আর সেই সঙ্গে পঞ্চাশ টাকা লাভও হবে। চম্পোর ওপর সেদিন খুব মারধোর হলো। ছ' বছরের একটি শিশুর জন্যে অন্তত এই আশঙ্কা হওয়াটাই স্বাভাবিক ছিল যে ছাগলছানাটার মতো তার না আবার কবে হাত-পা ভাঙে! মা ছুটে এসে তাকে দু-হাতে আড়াল করে দাঁড়াল, আর তার ফলে রাগের চোটে পাগল হয়ে গিয়ে বাপ তাকেও দু-একটি চড়-চাপড় মারল, যাচ্ছেতাই গালাগালি দিলো, আর বলল, 'তুই মেয়ের মাথা খাচ্ছিস।'

জমাদারের মেজাজ ঠাণ্ডা হতে কয়েক ঘণ্টা লাগল। তখন মা বলল, 'বড়-লোকের ছেলেপিলের সঙ্গে মিশলে আমাদের ছেলেপিলেরা তো খারাপ হবেই।' ঠিক এই কথাই অন্যভাবে চম্পোর বন্ধুর মা-ও বলে থাকেন, যখন তাঁর মেয়ে ভালো ভালো সন্দেশ বিস্কুট খেতে না চেয়ে চম্পো যা খায়, তাই খাওয়ার জন্যে জিদ ধরে।

তিন

চম্পো তার মা-বাপের প্রথম মেয়ে। সমস্ত মা-বাপই, বিশেষ করে এই পরিবারটির মতো যেসব পরিবার, তারা শিশুর আপদ-বালাইয়ের ভয়ে তটস্থ থাকে। কোমল শিশু তখনও সংসারের ঠাণ্ডা-গরম বোঝে না, ভূত-পিশাচ দৈত্য-দানব শিশুকে চারদিকে ঘিরে থাকে। একবার চম্পোর গলায় কয়েক জায়গায় শোথ দেখা

দিলো। মা কাকুতি-মিনতি করে গুণিনদের দিয়ে পুজো করালো। একবার চম্পোর একটু জ্বরের মতো হলো। গুণিন বলল, 'বেমাতা মা অসন্তুষ্ট হয়েছেন, ওঁর পুজা দাও।' মুরুব্বির কথায় চম্পোর মা বেমাতার উদ্দেশে একটা পাঁঠা মানত করল। কিন্তু এখন কি আগেকার সেই দিন-কাল আছে, যে দু-চার টাকায় একটা ছাগলছানা পাওয়া যাবে! আজকাল তো মধুপুরীতে মাংস আড়াই টাকা সের। বাচ্চা পাঁঠার মাংসের দর আরও চড়া। বস্তুত চম্পোর বাপ যখন ছাগলটা কিনেছিল, তখন সে মনে মনে ভেবেই রেখেছিল যে ওর বাচ্চা দিয়েই সে বেমাতার ঋণ থেকে মুক্ত হবে। চম্পোর মা সেদিন স্বামীকে বোঝালো, 'তুমি ছাগলগুলোর ওপর লোভ করছিলে, মনে মনে জপছিল, ছ'মাসে বাচ্চাগুলো একটু বড় হলে বিক্রী করে দেবে। কিন্তু বেমাতা আর অপেক্ষা করতে চায় না, সেজন্যেই ওর ঠ্যাঙ ভেঙেছে।'

ওরা বেমাতার উদ্দেশ্যে সেই বাচ্চাটাকে বলি দিলো। আশপাশে বেমাতার না আছে কোনো দেবস্থান, না আছে কোনো বেদী, মূর্তি-পাথর-গাছ কিছুই নেই। বেমাতা তো সর্বত্র ঘুরে বেড়ান, ছোট ছোট শিশুদের কাছে দিনে দু'বার ঘুরে না গেলে তাঁর পেটের ভাত হজম হয় না। সন্তুষ্ট থাকলে তিনি শিশুদের রক্ষা করেন, ভূত-পিশাচকে কাছে ঘেঁষতে দেন না, আর অসন্তুষ্ট হলে শিশুকে এক মুহূর্তে উঠিয়ে নিয়ে যেতেও দেরী লাগে না তাঁর। বেমাতার উদ্দেশ্যে ছাগলছানাটাকে বলি দেওয়া হলো বাড়ির পেছনেই। মধুপুরীর মিউনিসিপ্যালিটি জন্তু-জানোয়ার বধ করার জন্যে অন্যত্র ঘর তৈরি করে রেখেছে। বেমাতার উদ্দেশে নিজেদের ঘরের কাছে বলি দেওয়াটা আইনবিরুদ্ধ, কিন্তু চম্পোর মা-বাপ বোঝে যে-কোনো আইন-কানুন তাদের পুজোয় বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না। বলা বাহুল্য, মধুপুরীর অধিকাংশ জমাদার যেমন হিন্দু, তেমনি চম্পোরাও হিন্দু। ওদের নিজেদের সম্প্রদায়ের মধ্যে ভালো একতা আছে। জাতভাইদের ভেতর থেকে কারোর বেরিয়ে যাওয়াটা ওদের পছন্দ নয়। জমাদারদের মদের দিকে খুব টান, মাংসও খুব প্রিয় ওদের। শুয়োরের মাংস একটু সস্তায় পাওয়া যায় বলেই হয়ত শুয়োরের মাংসের দিকে ওদের ঝোঁকটা বেশি। ওদের সমাজে বিয়ে কিংবা বাড়িতে কোনো অনুষ্ঠান হলে, অথবা কেউ কোনো অন্যায় করলে, জাতভাইদের ভোজ দেওয়া এবং মদ খাওয়ানোটা রেওয়াজ। প্রতি মাসে এ রকম দু-একটা ভোজ এবং মদ্যপান লেগেই আছে। সমাজের লোকজনকে জোটবদ্ধ করে রাখতে সেটা কম সাহায্য করে না।

সেদিন বেমাতার উদ্দেশে বলি দেওয়া পাঁঠার মাংস রান্না হলো। সেই মাংস থেকে একটু মনিবানীকেও দিতে চাইল চম্পোর মা। পুরনো সংস্কার এবং মূল্যবোধ কত দ্রুত যে ভেঙে পড়ছে, তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ এই মনিব-পরিবারটি। তাঁদের পরিবারে না-জানি কত পুরুষ ধরে মাংসের নাম পর্যন্ত কেউ উচ্চারণ

করতে পারত না ; কিন্তু এখন রান্নাঘরে মাংস না হলে তাঁদের মনে হয়, কিছুই রান্না হয়নি। প্রসাদে তাঁদের কি আপত্তি হতে পারে ? চম্পোর মা যদি একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে নিজের হাতে রান্না করে নিয়ে আসত, তাহলে মনিবানী হয়ত তা নিয়েও নিতেন। কিন্তু এই 'পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা'-র শর্তটি খুব কঠিন, জমাদার বংশের একটি স্ত্রীলোকের পক্ষে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে পুরোপুরি আত্মবিশ্বাস লাভ করাটা সহজ নয়। চম্পোদের বাড়ির লোকেরা অন্যান্য জমাদারদের মতোই, 'যেমন আজ রোজগার করেছি তেমনি উড়িয়েছি'—নীতি মেনে চলার লোক। প্রতি মাসের মাইনের ওপর সমানে ধার-কর্জ করে, কাপড়ের দামটাও জমাতে পারে না। মনিবানী নিতান্তই দয়া-পরবশ হয়ে চম্পোর মা-কে তাঁর পুরনো শাড়ী দু-একখানা দিয়ে দেন। তেমনি তাঁর মেয়ের বাতিল কাপড়-চোপড় পায় চম্পো। কিন্তু এই সব কাপড়-চোপড় সাফ-সুতরো রাখার জন্যে সাবানের দাম জুটবে কোত্থেকে ? এমন নোংরা হয়ে থাকে ওরা, যেন 'পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা'র বিরুদ্ধে মূর্তিমান নজির।

চম্পো তাদের সম্প্রদায়ের আর সব শিশুদের চেয়ে বেশি সৌভাগ্যবতী। তাদের মনিব ছোঁয়াছুঁয়ি মানেন না, সেজন্যে ছোটবেলা থেকেই সে তার মনিবের মেয়ের সঙ্গে যেখানে খুশি সেখানেই খেলাধুলো করে বেড়ায়। কোনো ব্যাপারে মনিবানী অসন্তুষ্ট হলেও তাকে বকা-ঝকা করেন না। নিজের মেয়েকে যদি প্লেটে খেতে দেন, তাহলে চম্পোর খাবারটা দেন কোনো পুরনো থালা-বাসনে। মেয়ে যদি চেয়ার-টেবিলে বসে খায়, তাহলে চম্পো খায় ওখানেই পায়ের কাছে মেঝেতে বসে। সে-সময় দু'জনের খাবারেও কোনো পার্থক্য করা হয় না। আর যতক্ষণ চম্পোর বন্ধু যে পরোটা-তরকারি খাচ্ছে, সেই পরোটা-তরকারি তারও জুটে যাচ্ছে, ততোক্ষণ কোথায় বসে খাচ্ছে, কিভাবে খাচ্ছে, এসব ভাববার দরকার নেই তার। জমাদারের মেয়ে হয়ে উঁচু জাতের মনিবের ঘরের ভেতরে বসে খাচ্ছে, সেজন্যও মনিবানীর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার প্রয়োজন বোধ করে না সে। তার তো কখনও চোখে পড়েনি যে জমাদারের ছায়া পড়লে শুধু খাবারই নয়, এমনকি পরনের কাপড়-চোপড়ও শুদ্ধ করে নেওয়া আবশ্যক হয়ে ওঠে। তাদের পাশের ঘরগুলিতেই যে দোকানদার বাবুরা থাকেন, তাঁরা ছোঁয়াছুঁয়ি খুব মেনে চলেন। অথচ বাংলোর মালিকের মান-সম্মান ওঁদের চেয়ে অনেক বেশি, বড়লোকও খুব। তাঁদের সঙ্গেই যখন ছোঁয়াছুঁয়ি বলে কিছু মানামানি নেই, তখন চম্পোর মা ঐ দোকানদার বাবুদের বাড়ির তেলচিটে কাপড় পরা মেয়েদেরই বা গ্রাহ্য করবে কেন ?

মধুপুরীতে এমনিতেই অনেকদিন থেকে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক, অথচ প্রত্যেক মা-বাপকে এ-ব্যাপারে উদ্যোগী করে তোলার চেষ্টা করা হচ্ছে না। আইনের ধারক-বাহকেরা মনে করেন যে বাপ-মা-এর গুরুত্ব উপলব্ধি করবে, তারা

আপনা থেকেই তাদের ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠাবে। চম্পোর স্কুলে যাওয়ার প্রয়োজন ছিল না। তার মতোই কোনো একটা ছোট্ট ছেলের সঙ্গে তার শীগ্‌গিরই বিয়ে হয়ে যাওয়ার কথা, তারপর আর একটু সেয়ানা হয়ে উঠলে অন্য জমাদারের ঘরে সে বউ হয়ে থাকবে। তারপর তাকেও কোনো বাংলোতে ঝাঁট দিতে হবে, কমোডের গামলা সাফ-সুতরো রাখতে হবে, আর পুরুষের মতোই নিজেকে রোজগার করে খেতে হবে। মধুপুরীর রাস্তাঘাট পরিষ্কার করে মিউনিসিপ্যালিটির জমাদার, সেখানে জমাদারনীদের জন্যে কোনো কাজ নেই। চম্পোকে বড় হয়ে যখন এই সবই করতে হবে, তখন স্কুলে গিয়ে লেখাপড়া শিখে লাভ কি? কিন্তু তার বন্ধুটির জন্যে বড় চিন্তা। তার মা-বাপ ভাবছেন, মেয়েটিকে দু'বছর আগেই স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া উচিত, খুব দেরী হয়ে যাচ্ছে। তাঁদের সমাজে পাঁচ-দশ হাজার টাকা যৌতুকাদি দিলেই ঝামেলা চুকে যায় না, ছেলের আত্মীয়-স্বজন দেখে, মেয়েটি কতদূর লেখাপড়া শিখেছে। যদি চম্পোর বন্ধু অশিক্ষিতা হয়ে থেকে যায়, তাহলে তা সে যতই অনিন্দ্যসুন্দরী হোক না কেন, তার ভালো ঘর-বর পাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না। যদিও মা-বাপ তাকে এখনও স্কুলে দিতে পারেননি, কিন্তু ঘরে নিজেরাই পড়াচ্ছেন, গৃহ-শিক্ষকও রেখেছেন। মেয়ের মন-মেজাজ ঠিক থাকলে পড়ে, নইলে খেলতে চলে যায়, আর মাস্টারমশাইকে তাঁর ঠিক সময়টুকু কাটিয়ে ফিরে যেতে হয়। স্কুলে গেলে তো আর এ রকম করা সম্ভব নয়, তাই চম্পোর বন্ধুটি ভীষণ ভাবতে ভাবতে তার মনের দুঃখ প্রকাশ করে, 'তাহলে আমি তোর সঙ্গে খেলব কি করে? সারাদিন তো স্কুলেই কাটবে, সকাল-সন্ধ্যে আর কট্টুকু সময় পাওয়া যাবে?'

চার

বন্ধুটি এখন স্কুল যায়। কিছুদিন তো তার স্কুলে মন বসল না কিছুতেই, মাঝে মধ্যেই স্কুল থেকে পালিয়ে আসে, চম্পোর সঙ্গে খেলতে লাগে। মুশকিলটা হলো, চম্পো বাড়ির কাছাকাছিই থাকে। তাদের খেলার জায়গাটি যদি বন্ধুর মা বাপের চোখের সামনে না হতো, তাহলে দু'জনের বরাবর খেলাধুলো চালিয়ে যাওয়ার অসুবিধে হতো না। এখন চম্পো সব সময় মন-মরা হয়ে থাকে। তার আরও ভাই-বোন আছে প্রতি বছর ঘরে একটি করে শিশুর আগমন তো নিয়মিত ব্যাপার। চম্পো সকলের বড়। নিজের থেকে ছোট ছেলেমেয়ের সঙ্গে খেলে সে আনন্দ পায় না। তার বন্ধু শিক্ষিত পরিবারের মেয়ে, তার কথাবার্তায় সে যত মজা পায়, তা আর কোথায় পাওয়া যাবে? কখনো কখনো ভাবে, আমিও স্কুলে যাই না কেন! কিন্তু তার মা-বাপ রাজী নয়। ছোট ছেলেমেয়েদের সামলানোই কাজ তার। প্রতি বছর দু'বারে ছাগলের চারটে বাচ্চা হয়,

সেগুলোকে চরাতেও হয় তাকেই। বন্ধু যে-পথ দিয়ে স্কুল থেকে ফেরে, চম্পো সেই পথটার দিকে চোখ-কান খাড়া করে সারাদিন অপেক্ষা করে। বন্ধুটি কখনো কখনো আরও দু-তিনটি মেয়ের সঙ্গে হাসতে হাসতে লাফাতে-ঝাঁপাতে খেলতে খেলতে আসে। ওদের দেখে চম্পোর বুকে যেন কাঁটা বেঁধে। সে তাকে একমাত্র নিজের বন্ধু করে রাখতে চায়। বন্ধুটি কাছে এসেই হাসতে হাসতে বলে, 'চম্পো, এই ছাখ, এ হলো আমার বন্ধু কুসুম, আর ও হলো গহুতিরী।' তারপর সে সরল মনে তার বন্ধুদের জানায়, 'এ হলো চম্পো, আমার খুব ভালো বন্ধু। খুব ভালো গান গায় ও, ভালো ভালো কথা বলে। সন্ধ্যে পর্যন্ত আমরা এক সঙ্গে খেলি।' দূর থেকে নয়, চম্পোর কাঁধে হাত রেখেই বন্ধুটি কথা বলে। তার স্কুলের বন্ধুরা বয়সে বড় নয়, কিন্তু তারা অন্য পরিবেশে মানুষ, তাই তাদের জানা আছে, জমাদারের মেয়েকে স্পর্শ করতে নেই।

চম্পোর সামনে তারা কিছু বলে না, কিন্তু পরে বন্ধুটিকে বোঝাতে শুরু করে, 'জমাদারের মেয়েকে ছুঁতে নেই। ওরা নোংরা। পায়খানা সাফ করে। তুমি এ রকম করো শুনলে স্কুলের দিদিমণি রাগ করবেন, আমাদের অন্যান্য বন্ধুরা তোমাকে জমাদারের মেয়ে বলে ডাকতে লাগবে।'

'জমাদারের মেয়ে বলে ডাকবে'—কথাটা শুনেই চম্পোর বন্ধুটির প্রাণ উড়ে যায়। সে চম্পোকে নিজের বন্ধু বলেই ভাবে, কিন্তু তাই বলে এটা সে মানতে রাজী নয় যে সে-ও তার মতো জমাদারের মেয়ে। স্কুলের বন্ধুরা এখন ঘন ঘন তাদের বাংলোয় আসতে শুরু করল। চম্পোর সঙ্গে খেলাধুলোর পথ বন্ধ করে দিলো তারা। দু-একবার ধমক দিলো, 'জমাদারের মেয়ের সঙ্গে তুমি যদি খেলো, তাহলে আমরা আসব না।' এইটুকুই যথেষ্ট। চম্পো দেখল, তার বন্ধু ক্রমশ তার কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। কয়েক মাস পর্যন্ত সে সন্ধ্যের দিকে ঘর থেকে বেরিয়ে তাদের বাংলোয় চলে আসত। তার বন্ধুটি তাকে কোনো কটু কথা বলত না, কিন্তু সে তার নতুন বন্ধুদের সঙ্গে খেলায় এমন মেতে থাকত যে তার চোখেও পড়ত না, দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার চম্পো তাকে একদৃষ্টে চেয়ে চেয়ে দেখছে। কয়েক মাস যখন এরূপ নিষ্করুণ অবস্থায় কাটল, তখন চম্পোও নিরাশ হয়ে পড়ল। সে বুঝে ফেলল, তাদের দু'জনের পথ আর কখনও একসঙ্গে মিশবে না।

মধুপুরীর অধিকাংশ জমাদারই এখানকার বারোমাসের বাসিন্দা। এখানেই মিউনিসিপ্যালিটির তৈরি করা ঘরে কিংবা বাংলোর আউট-হাউসে ওরা থাকে। পাঁচ-ছ' পুরুষ ধরে ওরা ওখানেই কাটিয়েছে বলে এটুকু অন্তত আশা করা যেতে পারে যে ওরা নিশ্চয়ই ওদের শহর-গঞ্জের কথা ভুলেই গেছে, বিশেষ করে বিয়ের জন্যেও যখন ওদের আর মধুপুরীর বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু ওদের পূর্বপুরুষের ভিটের ওদের কুলদেবতা রয়েছেন, সেখানে ওদের কত

জাত-ভাই রয়েছে, তাদের সঙ্গে ওদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়নি। সেখানে গিয়ে তাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করার ইচ্ছেটা ওদের বরাবরই আছে। সেখানে যাওয়ার সবচেয়ে বড় কারণ কুলদেবতার পুজো। যতক্ষণ ওরা হিন্দু, ততোক্ষণ কুলদেবতার ক্রোধ বা করুণাকে উপেক্ষা করা সম্ভব নয় ওদের পক্ষে। চম্পোর জন্ম হওয়ার পর থেকে ওর বাপ-মা বিজনৌর যায়নি। কুলদেবতার কাছে ওদের ঋণ ক্রমশ জমে উঠছে, দেবতার ধৈর্য না আবার টলে যায়। এবার শীতকালে চম্পোর মা-বাপ সব ছেলেমেয়েকে সঙ্গে নিয়ে বিজনৌর গেলো। কুলদেবতার পুজো দিলো। আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধবদের মদ-সহ ভোজ দিলো। লোকে খুব নাচ-গান করল। এক মাস কাটিয়ে যখন তারা মধুপুরী ফিরল, তখন তাঁদের সঙ্গে চম্পো নেই। দেখা হতেই মনিব যখন চম্পোর কথা জিজ্ঞেস করলেন, চম্পোর মা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'আমার চম্পো চলে গেছে। ও ছোট মনিবানীর কথা খুব বলত। যেদিন দুপুরবেলা আমার বাছা একটা হেঁচকি তুলে একেবারে চুপ করে গেলো, সেদিন খুব জিদ ধরেছিল সে —আমাকে আমার বন্ধুর কাছে নিয়ে চলো। আমি এখানে থাকব না।' এমন সময় মনিবানীও এসে পড়লেন, তিনি চোখের জল আর কিছুতেই আটকাতে পারলেন না। বলতে লাগলেন, 'আহা, কি সুন্দর মেয়ে ছিল!'

'হ্যাঁ মনিবানী। সবাই বলত, ঠিক যেন বড় ঘরের মেয়ে। কথাবার্তাও ছিল ঐ রকম।' চম্পোর মা-র কণ্ঠ অশ্রুরুদ্ধ হয়ে এলো। আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছল সে। মনিবানী তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করল। সরল প্রকৃতির মা করুণ কণ্ঠে বলল, 'মনকে তো খুব বোঝাতে চাইছি, কিন্তু কি করব, চম্পোর কথা মনে পড়লেই বুক ফেটে যায়। বাছাকে আর কক্ষণো দেখতে পাবো না; আর কক্ষণো ও ছোট মনিবানীর সঙ্গে খেলবে না।' চম্পোর খেলা তো আগেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। মা-বাপের মাথা থেকে একটা বোঝাও কমেছে, কিন্তু নিজের ছেলেমেয়েকে কে বোঝা বলে ভাবে!

★